অসীম রায়

শব্দের খাঁচায়

শব্দের খাঁচায়

অসীম রায়

মনীষা

প্রকাশক
তরুণ সেনগুপ্ত
মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৪।৩বি বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

প্রচ্ছদ শিল্পী
সুবোধ দাশগুপ্ত

মুদ্রক
শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ মিত্র
বোধি প্রেস
৫ শঙ্কর ঘোষ লেন
কলিকাতা ৬

যাঁরা খাঁচায় থাকতে রাজী ন'ন তাঁদের জন্যে

লেখকের অন্য উপন্যাস :

একালের কথা

গোপাল দেব

দ্বিতীয় জন্ম

রক্তের হাওয়া

দেশদ্রোহী

ফুটপাথে ফুলের গল্প (কবিতা)

কুঠিঘাটা

॥ এক ॥

সারা গায়ে খোঁচা-ভর্তি পাঁচিলটার ছ্যাৎলাপড়া মাথার ওপরেই টিংটিঙে এক শিউলির কয়েকটা ডাল। তার গায়ে সাতজন্ম রঙ না-ফেরানো হলদে কালো সাদায় মেশা দোতলা বাড়িটার পাশে খোলা ড্রেন পার হলেই পাড়ার ক্লাবের মাঠ মানে এক চিলতে ঘাস-চটা জমি যেখানে মাঝেসাঝে ব্যাডমিন্টন খেলার মারফত তারুণ্য টিকিয়ে রাখবার মর্মান্তিক চেষ্টা। তারপর দু-তিনটে শিব-মন্দিরের বুকে প্লাইউডের কারখানা আর সেখানে স্তূপাকার কাঠের পাশে 'গঙ্গাস্নান ফেরত বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের 'জয় বাবা' আর্তধ্বনি পথহারা, সে আওয়াজ প্লাইউড কারখানার ঘর্ঘরে নিমজ্জিত।

বিশ বছর আগেও যাঁরা এদিকে এসেছেন বা দু-এক রাত কাটিয়েছেন তাঁদের কাছে এ স্থানের পরিবর্তন প্রায় পি. সি. সোরকারের ইন্দ্রজাল। অবশ্য বরানগর মানেই গলি। কিঞ্চিৎ সম্পন্ন ভদ্রমহোদয়গণ মিউনিসিপ্যালিটির মামাকাকাদের ধরে বাড়ির সামানা বাড়াতে বাড়াতে রাস্তা আরও সর্পিল সংকুচিত করে তুলেছেন। তবে জামানা রাস্তা কিংবা নতুন বাড়িতে নয়— পাল্টেছে মেজাজে।

কারণ এ গঙ্গা সে গঙ্গা নয়। বরানগরের পা দিয়ে যে গঙ্গা বয়ে গিয়েছে সেদিকে পশ্চিমাস্য হয়ে রামকৃষ্ণ একদা তাঁর জগজ্জননীর ধ্যান করেছেন আর সেই ধ্যান টেনে এনেছে কলকাতার বহু ধনী নির্ধনকে। বাবুদের এই বাগানবিলাসের জায়গাকে এক আধ্যাত্মিক গুরুত্ব দান করেছে এই গঙ্গা। তখন অনেক পাপীতাপী মানুষের কাছে পূতসলিলা ভাগীরথী আক্ষরিক সত্য। কিন্তু এখন অতাধিক লোকের চাপে কলের জলের চাপ কমে যাওয়ায় জলাভাবই প্রধানত গঙ্গাস্নানের কারণ। আশপাশের পুকুর বুঁজিয়ে যেখানে-সেখানে বাড়ি উঠেছে, যে কটা আছে সেগুলো স্থানীয় পৌর কর্তৃপক্ষের কাছে ময়লাস্থান— আকণ্ঠ আবর্জনায় পূর্ণ। টিউবওয়েলের সামনে লম্বা লাইন। কাজেকাজেই গঙ্গাস্নান। মাঝে মাঝে কিছু বয়স্ক লোকজন 'মা তারা' কিংবা

'জয় শম্ভু' বলে চেঁচিয়ে ওঠেন কিন্তু সে আওয়াজের কোন প্রতিধ্বনি নেই। তা অনেক চীৎকারের মাঝখানে তলিয়ে গেছে।

ওপারে বেলুড় মন্দিরের মাথা আশেপাশের কলের চিমনি থেকে উঠে আসা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। জোয়ারে মরা মোষ ভেসে আসে। কাকগুলো উড়ে উড়ে ভাসন্ত শবের ওপর নামে আর ওঠে তবে চামড়া এখনও শক্ত থাকায় সুবিধে করতে পারে না। ভাটার সময় পুরনো জামানার বড় বড় ঘাটের ভাঙা সিঁড়িগুলো কাদার মধ্যে দাঁত বের করে থাকে। কলের তেল ভাসে জলে।

এ গঙ্গা যেন স্টেট্‌সম্যান খবরের কাগজের গঙ্গা: দ্য সিল্টিং অফ দ্য হুগলী বেড হাজ বিকাম এ ম্যাটার অফ্‌ গ্রেট কন্সার্ন ফর দ্য পোর্ট অথরিটিজ। অথবা বাংলা কাগজের মূর্ত সাবধানবাণী: 'একথা ভুলিলে চলিবে না যে গঙ্গার ভবিষ্যতের সঙ্গেই কলিকাতা মহানগরীর ভবিষ্যৎ যুক্ত।' এক চলন্ত সমস্যা, প্রবাহিত এক বেদনাদায়ক জিজ্ঞাসা এই গঙ্গা। মহত্ত্বের যে শক্তিমত্তা, প্রাণদায়িনী যে সঞ্জীবনী তা এই গঙ্গা থেকে বহুদূরে, যেমন অপসৃত আমাদের জীবন থেকে অনেক কিছু।

আর সকালে বরানগরের বাজারে চায়ের দোকানগুলোয় স্থানীয় যুবকবৃন্দ খবরের কাগজগুলোর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। আকুল আগ্রহে কাগজের হেডলাইনে, বিশেষ প্রতিনিধিদের লেখায় বা সম্পাদকীয়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে একটা সস্তা সিগারেট ধরিয়ে। মাঝে মাঝে রাস্তার উল্টোদিকে চেয়ে থাকে যেদিকে মাংসের দোকানে সদ্য ছালছাড়ানো পাঁঠা ঝোলানো হয়েছে আংটায়। গরম ধোঁয়া ওঠে পাঁজরা আর রাং থেকে।

আগে মানুষ যে ভাবে রামায়ণ মহাভারত পড়ত আর মুদিখানায় যে ছবি দেখে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সাদামাটা ওয়াজেদ আলি সাহেব বলেছিলেন 'ইহাই ভারতবর্ষ'— বরানগরের বাজারে অন্তত মোটেই তাহা নহে। ভারতবর্ষ কিনা বলা দুষ্কর তবে গোটা বাংলাদেশই এমনি করুণভাবে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে খবরের কাগজের ওপর।

আর সন্ধ্যের পর তরুণ বাপ পুজোয় কেনা নতুন নীল-ফ্রক-পরা খুদে মেয়েটার হাতে ধরে যেই বেরোয় একটু বেড়াতে অমনি বত্রিশ নম্বর বাসখানা হুড়মুড় করে সারাপথ জুড়ে এসে পড়ে গায়ের ওপর। এক আনার একটা

বেলুন প্রাণপণ আঁকড়ে ফুটপাথশূন্য সংকীর্ণ রাস্তাটা থেকে মেয়েটা বাপের হাত ধরে লাফ মেরে ওষুধের দোকানের বারান্দায় উঠে রক্ষা পায়। এরই নাম সান্ধ্যভ্রমণ।

মাঝে মাঝে অবশ্য টিনের চায়ের দোকানের পাশে নতুন রঙ-করা উঁচু পাঁচিলের ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ে পাকা উঠোনে বোগেনভিলিয়ার মাচার নীচে অপেক্ষমান ঝকঝকে অ্যামবাসাডর, উচ্চকিত অ্যালসেশিয়ান। অদূরে মন্দিরের বুকের ওপর প্লাইউড ফ্যাক্টরি অথবা মার্বেলপাথরের মূর্তিশোভিত বিরাট লনের ওপর প্রকাণ্ড মোটরের গ্যারাজ, রঙচটা বনেটের ঠিক ওপরেই যেন নৃত্যরতা সুন্দরী। মস্ত মোজেইক সিংহদ্বারের ভেতরেই এক পাহাড় কয়লার সামনে দুটো উঁচু বড় বড় শিংওয়ালা বলদ, পাশে একটা হলদে টিনের ওপর লাল কালিতে লেখা— রামসিং কোল ডিপো, অথবা একদা সযত্নে লালিত বট্‌ল পামের সারির গায়ে গায়ে যৌবনমদমত্ত কারখানার নিওঁন সাইন।

খালি গরমের দিনে নদীতে যখন মাঝে মাঝে বাতাস দেয়, জল শব্দ করে, ওপারের চিমনিগুলোয় ধোঁয়া থাকলেও হাওয়া আকাশে নির্ধূমতা আনে, বেলুড় মন্দিরের মাথায় তারা ওঠে, ঘাটের বড় বড় অশথবটগুলো হাওয়ায় দোলে তখন মনে হয়, না, এ গঙ্গা হয়তো শেষ পর্যন্ত বেঁচে যাবে। এর প্রাণশক্তির জোরে আবার আস্থা আসবে। আবার রামকৃষ্ণবর্ণিত জগজ্জননী হোক কিংবা মার্ক্‌সকীর্তিত সাম্যবাদ হোক, কোন এক প্রাণদায়িনী শক্তিতে বিশ্বাস করে' মানুষ আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবে। এরকম মন্দিরের গায়ে প্লাইউড কারখানা উঠবে না আর হুমড়ি খেয়ে কাগজ পড়বে না মানুষ।

॥ দুই ॥

কুঠিঘাটায় যাঁরা স্নান করতে আসেন তাঁদের মধ্যে কেদার মুখুজ্জে সবচেয়ে প্রাচীন। বিরাট একজোড়া গোঁফ যা আজকাল বাঙালী মুখ থেকে উধাও তা এখনও শোভা পায় তাঁর মুখে। মাথার প্রায় সবটাই টাক কিন্তু নীচের দিকে গোলাকার ঘিরে শাদা রেশমী চুলের বাহার। নাতনীকে চান করান ঘাটে বসে আর বলেন, 'ব্যস্, এইবারই শেষ।'

সঙ্গে সঙ্গে উদ্‌বাস্তু তারিণী যে বাজারে মাংসের দোকানের পাশেই সাইকেলের দোকান দিয়েছে সে টপ করে প্রশ্ন করে, 'একেবারে সব শেষ দাদু ?'

'সব শেষ। এবার দেহ যেন গঙ্গা জলে যায়।' নাইয়ে শর্ষের তেল ঘষতে ঘষতে কেদার মুখুজ্জে বলেন।

নলিনী বলে যে ছোকরা বামপন্থী কোন পার্টির স্থানীয় মোড়ল সে এতক্ষণ নিমের দাঁতন করছিল। কাদায় কাঠিটা ছুঁড়ে দিয়ে বললে, 'দূর, বন্ধন কি আর শেষ হয়! অসংখ্য বন্ধন মাঝে···কি যেন বলেছে রবিঠাকুর···?' হাওয়ায় তার কথা ভেসে যায়।

'দূর শালা, একি একটা নদী। এর চেয়ে আমাদের কলের জল শতগুণে ভাল'—দীপক বলে যে ছোকরা গতবছর বাড়িশুদ্ধ ভবানীপুর থেকে উঠে এসেছে সে বললে।

'তা যাও না কেন দাদা তোমাদের ভবানীপুরে। তোমাকে তো কেউ বেঁধে রাখে নি এখানে,' নলিনী বললে।

'কাকা বেলেঘাটায় সি. আই. টি. রোডে বাড়ি কিনছে।'

'অনেক কাল শুনছি।'

দীপক রুখে উঠল নলিনীর কথায়, 'আমি কি গুল মারছি না কি ?' তারপর হেজলিনের শিশি থেকে শর্ষের তেল চেটোয় ঢালতে ঢালতে বললে, 'কি দাম শালা! শুনলে চোখ ট্যারা! সাড়ে আট হাজার করে কাঠা।'

অনেককাল আগে বরানগরে যে গানখানা খুব চলত সেই গান কেদার মুখুজ্জে ধরলেন :

শ্যামাপদ আকাশেতে মন-ঘুড়িখান উড়তেছিল,
কলুষের কুবাতাস পেয়ে গোপ্তা খেয়ে পড়ে গেল।
মায়াকান্না হোল ভারি, আর আমি উঠাতে নারি ;
দারাসুতকলের দড়ি, ফাঁস লেগে সে ফেঁসে গেল।

সঙ্গে একটা কমণ্ডলুও তাঁর আছে। তাতে জল ভরে গামছাপরণে নাতনির হাত ধরে তিনি যখন 'ফাঁস লেগে সে ফেঁসে গেল' ভাঁজতে ভাঁজতে সূর্যের দিকে মুখ করে ঘাটে উঠছিলেন তখন নলিনী চেঁচিয়ে উঠল, 'বোগাস্-

বোগাস্! আজীবন পাটের অফিসের বড়বাবু হয়ে টুপাইস করলেন, এখন শ্যামাসংগীত। দূর, দূর!' নলিনী ঝাঁপ খেল গঙ্গায়।

তাবিণীর দাঁতন করা হল। 'দাদু যা বলে তা বিশ্বেস করে আর অন্যেরা ··' বলে দাঁতনের কাঠি ফেলে সে শূন্যে নলিনীকে অনুসরণ করলে।

বাকি থাকে দীপক। ঘাটের একদিকে চোখের পাতা অবধি কয়লার গুঁড়ো মেখে যে দুটো হিন্দুস্থানী মুটে কাপড়কাচার সাবানে সর্বাঙ্গ মর্দনে ব্যস্ত, তাদের দিকে সে প্রবল বিদ্বেষে তাকায়। ভবানীপুরে দেবেন ঘোষ রোডে তিরিশ বছরের বাসা তুলে তাদের বরানগরে উঠে আসা দীপক মেনে নিতে এখনও পারে নি। যে যুক্তিতে এ প্রদেশের বাইরের বাসিন্দারা চড়াভাড়ার থাপ্পড়ে কলকাতার আদি বাসিন্দাদের ক্রমাগত বরানগর কিংবা অন্য কোন নগরের দিকে ঠেলে দিচ্ছে সেই 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা'র যুক্তি তার অন্তরের গুমরানি আরও বাড়িয়েছে। সে এখনও ভাবে তাল ক'রে বাড়ি-ওয়ালাকে জব্দ করতে পারলে বা পুলিশকে ঠিকমত হাত করতে পারলে ভবানীপুরেই তাদের একটা হিল্লে হত। ভবানীপুরে তাদের পাড়ার ক্যাবিনে এতক্ষণে চায়ের আসর ভাঙছে আর সে ছন্নছাড়া হয়ে নোংরা শহরতলীর নোংরা জলে নামছে. এ চিন্তায় তার মুখখানা দেখায় জলেভরা থমথমে মেঘ। তার দিব্যচক্ষুতে তখন ভবানীপুরের সেই চটা ওঠা গাড়াগর্ত-শোভিত দেবেন ঘোষ রোড সিনেমার মসৃণ নির্জন রাস্তায় রূপান্তরিত আর সামনে গঙ্গার ঘোলা জল এক অপরিচিত অবাঞ্ছিত অস্তিত্বের মতো প্রসারিত হয়ে থাকে।

এবার জোয়ার আসে। জোয়ারে চানে আরাম। তাঁতীবাবু তাই সবার শেষে আসেন। লম্বা একহারা লোকটার আদিবাস চন্দননগর। কিছুকাল যাবৎ এখানে উঠে এসেছেন তাঁর মেয়ের বাড়ি। হঠাৎ কলেরায় জামাইয়ের মৃত্যু তাঁতীবাবুকে বরানগরে টেনে এনেছে। তাঁতও বসিয়েছেন বাড়িতে।

দীপকের প্রায় চোখ ফেটে জল আসে তাঁতীবাবুকে দেখে। এই তো এখানকার 'কম্পানি', এই তো এখানকার 'কালচার'—সে বিষণ্ণভাবে চিন্তাটা মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করে। 'কম্পানি' কিংবা 'কালচার' বলতে নির্দিষ্ট কি বোঝায় সে সম্পর্কে তার দৃঢ় ধারণা না থাকলেও এ অবস্থায় লোকে যেরকম আক্ষেপ করে সেও তেমনি আক্ষেপে চিত্ত বিক্ষিপ্ত করে।

'এখনও জলে নামা হয় নি?' তাঁতীবাবুর এ প্রশ্নে দীপক ভুরু কুঁচকায়। তার এখন ইচ্ছে সিনেমার প্রসঙ্গে আলোচনা, কিন্তু তা কি সম্ভব? সিনেমার প্রসঙ্গে মানে সাম্প্রতিককালে তারকাদের নানা ভঙ্গীমাময় চিত্রসম্বলিত যে-সব কাগজ বেরিয়েছে যেখানে শ্রীমতী অমুক কি বেশে রাত্তিরে শুতে যান বা শ্রীমতী তমুক শুধু ভেট্‌কি ফ্রাই খেয়ে শরীর কেমন চাঙ্গা রেখেছেন, এই ধরনের ভেতরকার খবর দেয় সেই সব খবরের ওপর এতক্ষণ আলোচনা জমাট বাঁধত। আর শুধু ফিল্ম কেন সবরকম আলোচনা জমত—সুচিত্রা সেন বা রাশিয়ান্ স্পুটনিক। দীপক আধখাওয়া সিগারেট ছুঁড়ে দেয় জলে।

'এবার কেমন কাপড় বেচলেন পুজোয়?' কর্কশ লাগে দীপকের আচম্‌কা প্রশ্ন।

'আর কাপড়!' পাশছাঁটা ধবধবে গোঁফের নীচে তাঁতীবাবুর ফোকলা মুখখানা হাসিতে ভরপুর। 'সে কাপড় আর নেই! এই আঙুলে একশো চল্লিশ কাউন্ট কাপড় বুনেছি। রেশমের মতো নরম। ঐ যে কিরু মিত্তির হাই-কোর্টের জজ, নেংটাপোঁদে খেলেছি, কিরুর বাড়ি সারা বছর আমার হাতের কাপড় বরাদ্দ। এখন আর সূতো কোথায়? চোখে দেখি না। এখন সব গামছা, ষাট কাউন্ট।' তাঁতীবাবুর চোখ পর্যন্ত হাসি উঠে আসে।

দীপকের এ ধরনের কথাবার্তা ভাল লাগে না। এ ধরনের কথাবার্তা তার জীবনের ছকের সঙ্গে মেলে না। একসঙ্গে তাঁতী আর জজের বাল্যক্রীড়া সে সন্দেহের চোখে দেখে। তাকে নতুন পেয়ে বুড়ো বোধহয় গুলপট্টি চালাচ্ছে।

'আপনার ছেলেরা কি করে?' এমনভাবে সে জিজ্ঞেস করে যেন সে যাচাই করছে যেমনভাবে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করে থাকেন। যেন বেফাঁস কথা বলবে না— এরকম সাবধানবাণী প্রচ্ছন্ন সে প্রশ্নে।

'ছেলেরা আর কি করবে! তারা সব লেখাপড়া শিখেছে। বাপদাদার ব্যবসা তারা পারেও না, পোষায়ও না। ম্যাকফিল্ড সাহেবের মেম, সেই তো বড় ছেলেটাকে কারখানায় লাগালে। খুব ভালোবাসত। একবার অসুখ করেছিল, কি সেবা করলে! বলেছিল বিলেত নিয়ে যাবে, ট্রেনিং দেবে, তা আর পাঠালাম না। এখন জব্বলপুরে।'

তাঁতীবাবু কয়েকটা ডুব দিয়েই উঠে পড়েন। তারপর অন্যান্য স্নানার্থীদের

সঙ্গেই প্রায় ঘাটে ওঠেন। তারিণীর সাইকেলের দোকান এখনই খুলবে। নলিনী বেলুড়ে পাটের অফিসে কাজ করে, বাড়ি ফিরেই দুটি খেয়ে তাকে খেয়া পার হতে হবে। ঘাট প্রায় খালি। দুটো মুটে শুধু এককোণে তাদের পরনের কাপড় আছড়ে কেচে তুলছে।

বিষণ্ণ দীপক ঘাটে বসে থাকে। বটগাছের শুকনো পাতা ওড়ে।

ইতিমধ্যে পায়জামা পরনে একটি যুবক ঘাটে নামে। পিঠে টার্কিশ তোয়ালে, হাতে সাবানের বাক্স। পিছলের ভয়ে অনভ্যস্ত লোকটি নামে বেশি সন্তর্পণে। কদিন হলই আসছে, দীপক লক্ষ করেছে। ঘাট প্রায় খালি হলে আসে। চান করার ব্যাপারে একটু আত্মসচেতন, আগন্তুকের ভাবখানা খুব চেষ্টা করে' মুছে ফেলবার চেষ্টা তার মুখে।

দীপক আত্মীয়তাবোধ করে। বলে, 'নতুন এসেছেন নাকি এদিকে?'

'নতুন, হ্যাঁ!' অস্পষ্ট উত্তর আসে।

হাঁল্কা লম্বা খুব সাধারণ চেহারা, মুখের মধ্যে বড বড় দুটো চোখ আর সযত্নে ছাঁটা গোঁফ আকর্ষণীয়। তবে কপাল চওডা হতে শুরু করেছে। বুকে লোমের আধিক্য থাকায় বোগা গা কিঞ্চিৎ বেশি লোমশ লাগে। দীপকের বোধ হচ্ছিল ভালো কাপডচোপড পরে মাঞ্জা দিলে চেহারাটা ভালই লাগবে।

'কোথায় যেন স্যর আপনাকে দেখেছি মনে হচ্ছে। বালিগঞ্জে থাকেন না?'

'না বোসপাডা লেনে— বাগবাজার।'

'তাহলে মার্টিন বার্নে বোধহয়। আমার এক দাদা ঐ অফিসে…'

'মাস্টারী করি কলেজে।'

'ও!' দীপক চুপসে যায়।

'জ্যাঠার বাডি এসেছি বেডাতে।'

'কোন বাডিটা? দীপকের জিজ্ঞাসা খুব মোলায়েম পাছে গেঁয়োমি প্রকাশ পায়।

'প্রবোধ সেনের বাডি।'

'প্রবোধ সেনের!' অস্ফুট আওয়াজ বেরোয় দীপকের মুখ দিয়ে। এই লোকটাও কি গুল চালাচ্ছে তাঁতীবাবুর মতো? সম্ভব। নইলে কুঠিঘাটার কাদায় মিনিস্টারের ভাইপো চান করতে নামবে কেন? দীপক বিমর্ষভাবে জলে নামল।

জোয়ারে নির্মল গা ভাসায়। যে শীতশীত ভাব লাগছিল জলে নামবার আগে তা কেটে যায় মুহূর্তে। একটা স্টীমার দুদিকে দুটো গাধাবোট বেঁধে পারের বেশ কাছ দিয়ে ধোঁয়া ছাডতে ছাড়তে বেরিয়ে যায়। প্রথম শীতের মিঠে রোদ্দুরে জল কাটতে কাটতে এবার সে এগোয়। উল্টোদিকে সারি-সারি মন্দির, কারখানার চিমনি, ঘাটের সিঁড়ি, কোথাও এখনও-টিকে-থাকা সবুজের আভাস। সেদিকে চেয়ে চেয়ে আবছাভাবে নির্মলের মনে হতে থাকে এ গঙ্গা হয়তো সেই গঙ্গাই— সেই শ্রীম-বর্ণিত কথামৃতের গঙ্গা যখন স্টীমারে করে কেশব সেন রামকৃষ্ণকে নিয়ে বেড়াচ্ছেন নদীতে আর ভক্তরা চারপাশ ঘিরে মন্ত্রমুগ্ধ, যখন ঘোড়ার গাড়ি চেপে কলকাতার সম্পন্ন ব্রাহ্ম-হিন্দু ভদ্রলোক সব দক্ষিণেশ্বর আসতেন, স্টার থিয়েটারে গিরীশ ঘোষ বিনোদিনীকে নিয়ে নিতাইয়ের পালা করছেন, বিদ্যাসাগর একা হয়ে আছেন বেঁচে, ব্রাহ্মরা নতুনভাবে উৎসাহিত হচ্ছেন ধর্মব্যাখ্যায়, বঙ্কিম ঘোড়ায় চেপে ডেপুটিগিরি করছেন আর উপন্যাস লিখছেন—এককথায় জীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে যখন কিছু লোক কাঁদাকাঁদি করত। স্বল্পবিস্তৃত হলেও সেই প্রাণের জোয়ারের সঙ্গে কি এই ঘোলাজলের উচ্ছ্বাস তুলনীয় নয়?

আসলে নির্মলের চরিত্রের ত্রুটি এইখানে। তার জ্যাঠা বলেন, এই জন্যে তার কিছু হোল না। ঘটনাকে ঘটনা ভেবে স্বচ্ছ হাল্কা মনে গ্রহণ করে পথচলবার যে দর্শন তার জ্যাঠা সম্পূর্ণ গ্রহণ করেছে, তা তাঁর ভাইপোর আয়ত্তের বাইরে। নির্মলের চরিত্রে এই তাত্ত্বিক ঝোঁক সম্পর্কে তার জ্যাঠা কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে বলেছিলেন, 'আই ওয়াণ্ডার হোয়াই হি ইজ সো-সীরিয়াস্! হোয়াই শুড হি টেক লাইফ সো সীরিয়াসলি? এই বুড়ো ইয়াং-মেনদের দিয়ে কি হবে দেশের?'

'আপনার কি আপন জ্যাঠা?' গামছা দিয়ে লম্বা চুল ঝাড়তে ঝাড়তে দীপক বলেই ফেলে।

'নকল নয়।'

দীপক তবু সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে লোকটাকে। একবার বিড়বিড় করে, 'ওটা গবা-দের বাড়ি। ও তল্লাটে আরও তিন-চারখানা বাড়ি ছিল গবাদের। এখন সবই গেছে।'

গবার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হলেও দীপক সেই ছেলেটির সঙ্গে পরিচয়ের

সংবাদ মারফত তার নিজের অস্তিত্বের গুরুত্ব জানাতে চায়। বোধহয় এভাবে মিনিস্টার-ভাইপোর পাশে দাঁড়ানো তার পক্ষে সোজা হয়ে যায়।

'কদিন আছেন?'

'আর কয়েকদিন। ছুটিটা ভাবছি এখানেই কাটিয়ে যাব।'

'এইখানে? কোন অ্যাসোসিয়েশন নেই, কিচ্ছু নেই!'

'কলকাতায় যে পরিমাণ ধুলো আর ধোঁয়া তাতে বেশির ভাগ লোকেরই ফেনিন্‌জাইটিস্‌। আমারও টন্‌সিলের দোষ আছে।'

'কাটিয়ে ফেলুন,' দীপক আবার অন্তরঙ্গতা বোধ করে। 'আজকালকার সায়েন্সের যুগে ওসব পুরনো কুসংস্কার পচিয়ে রাখা ঠিক না।'

'আমি সবটা সায়ান্স মানি না আপনার মতো,' নির্মল ঝাঁপ খায় জলে। মাথা থেকে কতগুলো অবাঞ্ছিত ভাবনা হটাবার জন্যে সে জোয়ারে অনেকদূর উজিয়ে যায়। চিৎ হয়ে ভেসে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। দূরে বালি ব্রিজের ওপর একখণ্ড মেঘ, একদিকে কলের চিমনি, মন্দিরের চূড়ো। চিৎ হয়ে ভাসলে জল দেখা যায় না যে জল চারপাশে তাকে বেষ্টন করে আছে। বাস্তব ঘটনা তো একই, যে যেমনভাবে দেখে— কেউ উপুড় হয়ে, কেউ চিৎ হয়ে। তার জ্যাঠা আর সেও দেখছে এই রিয়ালিটি দুভাবে। কোনটা ঠিক দেখা ভগবান জানে।

নির্মল ঘাটে ওঠে।

॥ তিন ॥

পরদিন সকালে কুঠিঘাটায় স্নানার্থীদের মধ্যে প্রায় একটা আলোড়ন। দীপক কথাটা পাড়বার আগে ভেবেছিল সে এই আলোড়নের নায়ক হবে, প্রবোধ সেনের ভাইপোর কুঠিঘাটায় আবির্ভাবের মতো ঘটনাটা বলে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেবে। কিন্তু মাটি করল কেদার মুখুজ্জে, 'প্রবোধ সেনের কোন্‌ ভাইপো?' এমন নির্বিকারভাবে বুকে পিঠে তেল চাপড়াতে চাপড়াতে বললেন যে নলিনী-তারিনী আরও দু-তিনজনের দৃষ্টি তাঁর দিকেই পড়ল।

'ওরা দুভাই দুরকম। ছোট সুবোধচন্দ্র ওয়ারে গেল। আই.এম.এস. হোল। এ বলছি সেই প্রথম যুদ্ধ। নাইনটিন ফোর্টিন। তারপর ফিরে এসে

এক সাহেবের নাকে ঘুষি চালালে। ভীষণ স্বদেশী বনলে। চাকরি গেল। লোকটা তারপর বিনি ফিয়ে ডাক্তারি করে ডুবল। অবশ্য ছেলেটা দাঁড়িয়েছে শুনছি। বোধহয় ইঞ্জিনিয়ার টিঞ্জিনিয়ার—'

'কলেজের মাস্টার'— দীপক চট করে বললে।

'ঐরকম একটা কি হবে। শুনেছি সুবোধচন্দ্রের বিশেষ কিছু হয় নি। …হলেই বা কি, না হলেই বা কি। সবই তো ফক্কা। সংসার মানেই দাদা ফক্কাবাজি!'

'বড্ড ঠাণ্ডা!' মুখুজ্জের পাঁচ বছরের নাতনীটা চেঁচাল।

'তোর আর চানে কাজ নেই। একটু চাঁদিতে জল দিয়ে দেব।'

কেদার মুখুজ্জের সংসার প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণবাণীর ঘন ঘন পুনরাবৃত্তি আর সঙ্গে সঙ্গে এই বৈষয়িক জগৎ সম্পর্কে কৌতূহল তাঁকে অন্যান্য স্নানার্থী থেকে স্বতন্ত্র করেছে। জিজ্ঞেস করলে রামকৃষ্ণ পুনরাবৃত্তি করেন, 'রাজা জনক— ইদিক উদিক দুদিক রেখে খেয়েছিলেন দুধের বাটি।' তিনি যেমন রোজ ভোর থাকতে পুজোয় বসেন, গঙ্গাস্নান করেন তেমনি বিখ্যাত লোকদের লেটেস্ট কেচ্ছা তাঁর নখদর্পণে। বিধান রায় নলিনী সরকারের ব্যক্তিগত জীবন কেন, মন্ত্রীমহল, বিরোধীদলের নেতৃবর্গ, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী, সওদাগরী অফিসের বড় সাহেব সবাইকেই তিনি যেন বুকে টেনে নিয়েছেন। কে কত ঘুষ খায়, কে কটা রক্ষিতা রাখে এ ব্যাপারে তাঁর অভিনিবেশ খুব সামান্য নয়।

'আপনার দাদু খবরের কাগজের চীপ্ রিপোর্টার হলে ভালো মানাত,' তারিণী বাংলা 'চ'তে ইংরেজী 'এস্'-এর উচ্চারণ আনে।

'সুবোধচন্দ্রের দাদা প্রবোধচন্দ্র ওকালতিতে খুব পসার করলে। ওদের বাড়ি কেষ্টনগর, আমার মামার বাড়ির গায়ে। 'মুসলমান চাষীরা বলত, 'ওপরে আল্লা, নীচে প্রবোধ সেন।' খুন করেই দৌড়ত তার কাছে। প্রবোধচন্দ্র ওকালতি জোর চালালে, সাহেবসুবোদের সঙ্গে বিস্তর দহরম-মহরম ছিল, আবার গান্ধিজী কলকাতা এলেই দৌড়তেন দেখা করতে।'

'জনক রাজা, ইদিক উদিক দুদিক রেখে খেয়েছিলেন দুধের বাটি!' দীপক চেঁচিয়ে উঠল।

'সেই জন্যেই উঠেছেন। নইলে কে পুঁছত? আরও ঢের এলেমদার

লোক ছিল জেলায়। ভূরিভূরি জেল খেটেছে লোকে। কিন্তু সবাই প্রায় একবগ্‌গা। প্রবোধ সেন সে জাতের নয়। সে দুদিক সামলায়।'

'দু নৌকোয় পা দিয়ে চলে,' নলিনী গম্ভীরভাবে বলে।

'হ্যাঁ বাবা, সেইভাবেই চলতে হয় এ সংসারে।'

'আমি মানি না,' নলিনী ঘাড় নাড়ালে। 'বাঁচতে গেলে প্রবোধ সেন হতে যাব কেন? যা নিজে বিশ্বেস করি তা বিসর্জন দেব? তার জন্যে মরতে হয় সেওভি আচ্ছা।'

তারিণী উত্তেজিত হয়ে বললে, 'যার সম্মান নেই তার বাইচ্যা থেকে কি লাভ?'

'কে বললে প্রবোধ সেনের সম্মান নেই? তোমার আমার চেয়ে তার ঢের সম্মান।'

'অমন সম্মানের ওপর···' অশ্রাব্য ভাষা বের হয় তারিণীর মুখে।

কেদার মুখুজ্জে হাত তুলে বললেন, 'খামাকা মাথা গরম করো কেন? আমি তো আবও দেখেছি তোমাদের চেয়ে। ছেলেবেলা থেকে ইংরেজের আমল দেখলাম, কংগ্রেসেব আমল দেখলাম, যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ দেখলাম, পার্টিশান দেখলাম, রিফিউজি-মিছিল—'চলবে না চলবে না', সবই তো দেখলাম। একটা কথাই ভাই দাঁড়াচ্ছে। যারা দুদিক রেখেছে তারাই দাঁড়িয়েছে। আর সব তলিয়ে গেছে।'

নলিনী তাদের কারখানার ইউনিয়নের সহ-সম্পাদক। ট্রাইবুনালে মালিকের সঙ্গে লড়ে মজুরদের দাবি আদায় কবেছে। বোধহয় সেইজন্যেই তার আত্মবিশ্বাস বেশি। সে মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, 'আমরা আপনাদের চেয়ে অনেক বেশি দেখছি অনেক কম সময়ে। আপনার জনক রাজার থিওরি এখানে দেবেন না। কারখানায় অনেক জনক রাজা দেখা আছে। স্ট্রাইক হলেই দালাল বনে যায়।'

কেদার মুখুজ্জে নাতনীর মাথা ধোয়ান। সে চেঁচায়, 'বড্ড শীত করছে।' তার মাথা মুছিয়ে তিনি ঘাটে ওঠেন। তারপর আস্তে আস্তে বলেন, 'যার যা বিশ্বেস বাবা। আমার কথা মানতে হবে এমন দিব্যি দিয়েছি কাউকে?'

তিনি চলে যাবার পর ঘাটের হাওয়া থমথমে লাগে। নতুন শীতের

রোদ্দুর ঘোলা জলে চিকচিক করছে। গল গল করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে দুটো ফ্ল্যাট দুই বগলে নিয়ে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে একটা স্টীমার। সহসা ফট্ ফট্ করতে করতে একখানা নীল চালিয়াৎ মোটর বোট বেরিয়ে গেল। তার ঢেউয়ে মাঝ গঙ্গায় দু-তিনখানা নিশ্চল মেছো নৌকো দুলতে থাকে। কিন্তু কেমন তাল কেটে যায়। এই মিঠে রোদ্দুরে সামনের অতিপরিচিত অথচ চিরনতুন গঙ্গাদৃশ্যও সেই বেতাল অবস্থা কাটাতে পারে না।

'বেশ জমেছিল কিন্তু আজ,' দীপক উৎসাহ দেখায়।

'দূর! মিছিমিছি দাদুকে চটালাম,' নলিনী গা মুছতে মুছতে বলে।

॥ চার ॥

চান করে গঙ্গার ধারে তার জ্যাঠামশায়ের সম্প্রতি কেনা বাগানবাড়ির গেটে ঢুকতেই বাড়ির দারোয়ান জানালে, 'ভবেনবাবু এসেছেন ওপরে।'

গ্যারেজে তার উনুনে ডাল ফুটে উঠেছে। দালদার সম্বরা দেবার আগে তাদের এই সরল ভালোমানুষ দাদাবাবুর সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছে হয় রঘুর। এইমাত্র ভবেনবাবুর সঙ্গে এ প্রসঙ্গে তার কথা হচ্ছিল। রঘু ভবেনকে বলেছে, 'আমার ছেলেকেভি কলেজের মাস্টার হতে মানা করেছি। ছেলেপেলে মানুষ করিতে হোবে তো। মাস্টার হলে খাবে কি?'

দারোয়ান রঘুর নামকাওয়াস্তে। আসলে সুদের কারবার। বরানগরে আসতে হবে শুনে সে প্রথমে মুহ্যমান হয়ে পড়ে টাকার শোকে। কিন্তু যে সমস্ত গুণ থাকলে মানুষ বড হয় অর্থাৎ অধ্যবসায় কর্মতৎপরতা তা তার চরিত্রে প্রচুর পরিমাণ থাকায় এই অচেনা পরিবেশেও প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছে। বাজারের বাবু, দোকানের কর্মচারী, গঙ্গার ওপারে মিলের কেরানী, মেকানিক তার কাছে বাঁধা চড়া সুদের গেরোয়।

খয়নি ডলতে ডলতে নির্মলের কাছে এসে বলে, 'একটা কাজ আমার করিয়ে দিতে হবে বড়সাবকে ব'লে— একটা পিট্রোল পাম্প। আর আমার লেড়কার লিয়ে একটা টেক্সি পরমিট। মামুলি বাত।'

'তোমার ছেলে তো ভালো লেখাপড়া শিখেছে, তার পারমিট কি দরকার?' নির্মল বিরক্ত হয়ে বললে।

'লেখাপড়া শিখেছে কি সংসার করবে না? চার সাল আগে সাদি দিয়া। দো লেড়কা পয়দা কিয়া। লেখাপড়া শিখনে মে কেয়া ফয়দা!'

তারপর রোদ্দুরে ঘাসের ওপর বেতের একখানা চেয়ার পেতে দিয়ে রঘু ডাল নামায়। 'আপ এক কাম্ করিয়ে। সিনেমা লাইনমে যাইয়ে। বহুৎ পয়সা।'

'সিনেমায় আমায় নেবে না। গান গাইতে হবে। নাচতে হবে।'

'সে সব সিখে লিবেন। আর যদি তা না হয় ফিল্মের স্টোরী লিখুন। আমার মুলুকে ভারী ভারী রাইটার, কেতনা সান্‌দান, সব ফিল্ম লাইনে চলা গিয়া।...আপনার বাবা, ছোটবাবু বহুৎ বড়া আদমী, বহুৎ শুধ্ হ্যায় গ্যায়সে গঙ্গামায়কি পানি। লেকিন গঙ্গাপানি আভি থোড়া কমজোরি হো-গেই। আদমিলোক কলকা পানি পিতে হ্যায়।'

নির্মল লক্ষ করেছে আজকাল-সব ভাষায় খবরের কাগজের সংখ্যাবৃদ্ধিতে মানুষ আগের চেয়ে অনেক চালাক। অনেক কথা সে অনেকভাবে বলতে পারে। আর দারোয়ান থেকে প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত সবাইকেই তো এদেশে কথার ভূতে পেয়েছে। এই কথার ভূতগুলো রোজ সকালে খবরের কাগজের পাতায় নাচে, সভায় সভায় হাত-পা তুলে লাফায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, সরকারি দপ্তরে, স্টক এক্সচেঞ্জ, জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠানে, পাড়ার রেস্তোঁরায় যেটা দাঁড়াচ্ছে তা হল কথা দিয়ে জীবনের প্রত্যেক সমস্যার তৎক্ষণাৎ সমাধান।

আর এই গঙ্গার ধারে নির্জনতায় গ্যারেজে দুবেলা রান্না করে' ফুলগাছ নিড়িয়ে হিন্দি "সন্মার্গ" কাগজখানা আদ্যোপান্ত পড়ে' রঘুর পেটেও অনেক কথা জমে। আবার বড়বাবু আসছেন। পেট্রোল পাম্প নিদেনপক্ষে ট্যাক্সির পারমিট প্রসঙ্গ কিভাবে পাড়বে বড়বাবুর কাছে কাল সারারাত তাই ভেবেছে। কারণ রঘু বিশ্বেস করে যদি তাক্ করে কথাটা পাড়তে পারে কিংবা আর কাউকে দিয়ে বলাতে পারে তাহলেই অর্ধেক কাম হাসিল। তারপর হয়তো অপেক্ষা করতে হবে একবছর দেড় বছর। তা সে করবে।

সেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ চোয়াল-চওড়া কাঁধমোটা মানুষটার কঠোর হাসিতে ভারাক্রান্ত মুখখানার দিকে চেয়ে চেয়ে নির্মল বললে, 'তুমি বরং কথাটা ভবেনবাবুকে দিয়ে বলাও।'

নির্মল ওপরে উঠে যেতেই রঘু মাথা নাড়ায়। একটু মায়াও হয় নির্মলের

জন্যে। বস্তুত সে নিজে অনেক বেশি রোজগার করে এই দাদাবাবুর চেয়ে। দাদাবাবুর অর্ধেক লেখাপড়া যদি সে জানত তাহলে কি বিপ্লবই না ঘটিয়ে দিত সে মাঝে মাঝে ভাবে। বাজার ঘুরে ঘুরে রঘু দেখেছে বোম্বাই থেকে আনা যে-সব ভালো রেডিমেড্ বুশশার্ট শার্ট বাজারে আসছে কিংবা ছোট ছেলেমেয়েদের রকমারি জামা উঠেছে তাদের একটাও ভালো দোকান এখানে নেই। রাস্তার মোড়ে সে বড় দোকান দেবে। বাইরে নিওন আলো জ্বলবে, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেবে, তার রাখা টাই-পরা ইংরেজী-জানা কর্মচারীরা মেয়েদের দিকে হাত বাড়িয়ে জিনিস দেখাবে। কিংবা পাঞ্জাবীরা যেমন সাম্রাজ্য বিস্তারের মতো একটার পর একটা কলকাতায় জম্‌জম্ রেস্তঁরা দিচ্ছে তেমনি একটা লাগাবে এখানে। রঘু গঙ্গার দিকে চেয়ে থাকে। আশ্চর্য কোমল, স্বপ্নেভরা, প্রায় গর্ভবতী নারীর সে দৃষ্টি। সেদিকে চেয়ে চেয়েই রঘু ভাত চাপিয়ে দেয়।

॥ পাঁচ ॥

নির্মল অবাক হয়ে দেখল ওপারেব ঘবের দরজা ভেজানো। ঠেলতেই ভবেন সান্যালের আর্তকণ্ঠ বেজে ওঠে, 'খুলবেন না, খুলবেন না, এক মিনিট।'

ভেজানো দরজার ওদিক দিক থেকে শোনা যায় দেয়ালে পেরেক ঠোকার শব্দ। কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর ভবেন যেন যবনিকা তোলার হুইসিল দিলে, 'আসুন।'

ঢুকতেই নির্মলের চোখে পড়ল, জ্যাঠামশায়ের এক বিরাট আবক্ষ ফটো। গরম গলাবন্ধে যতখানি রাসভারি গম্ভীর ন'ন তার চেয়ে অনেক বেশি দেখাচ্ছে। চোখেমুখে বোধহয় রিটাচিং-এর দরুন অতিমাত্রায় প্রকট 'ভি-আই-পি-লুক্'। নির্মলের মনে হচ্ছিল স্মিত হাসবার চেষ্টা না করলেই পারতেন জ্যাঠামশায়। ওটা বাদ দিলে আরও স্বাভাবিক হত। বোধহয় নেহেরুকে নকল করে বোতামের ফাঁকে গোলাপ আঁটা হয়েছে। জ্যাঠামশাই সম্পর্কে তার নিজের খুব একটা বড় ধারণা নেই কিন্তু এরকম দাম্ভিক অসামাজিক ঢঙে তাঁকে উদিত হতে নির্মল খুব কমই দেখেছে।

ভবেন সেদিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে নির্মলের দিকে মুখ ফেরাল। 'ভাল

হয় নি? আমিই করিয়ে দিয়েছি। কলেজ স্ট্রীটে চ্যাটার্জী ব্রাদার্স।... আপনারা চারদিকে বলছেন বাঙালী ডুবছে। কিন্তু আমি তা মোটেই মানি না। এই দেখুন না। এই ছোট্ট ছবির দোকান। কি নিপুণ কাজ! অশোক মিত্তির সেনশাস্ রিপোর্টে মশাই বাজে কথা বলে নি। ঠিকই, বাঙালীর 'প্রিসিশান ওয়ার্কে'র দিকে নজর বেশি।'

নির্মল ঠিকই জানে ভবেন এ রিপোর্ট পড়ে নি। এমনকি কাগজেও যে সামান্য সারাংশ বেরিয়েছে তাও ভালভাবে পড়েছে কিনা সন্দেহ। তবে বলছে এক্সপার্টের চালে।

'ও ঘরে যান, ও ঘরেও দেখে আসুন,' ভবেন বললে।

শোবার ঘরে খাটখানার ঠিক চালচিত্রের মতো বিরাট ছবিটায় আজানুলম্বিত গড়ে মালায় ভূষিত জ্যেঠামশাই হাসছেন। চারপাশে তাঁকে অভিনন্দন দিতে জড়ো জেলার কর্মীরা। পাশে স্থানীয় একজন বড় কাপড়ের দোকানদার চোখ বন্ধ করে হাসছেন। কোন বাংলা কাগজে বোধহয় ছবিটা বেরিয়েছিল।

আর একটা ছোট খাটের পাশে স্থানীয় স্কুলের তরফ থেকে বাঁধানো মানপত্র। নির্মল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কয়েক লাইন পড়ে ফেলে :

'হে দেব, আপনি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতো আমাদের ক্ষুদ্র পল্লীতে উদিত হয়ে সমস্ত দেশ উদ্ভাসিত করেছেন আপনার প্রতিভার রশ্মিতে, বিকীর্ণ হয়েছে দিক্‌বিদিক আপনার কর্মৈষণার বর্ণাঢ্য বিকাশে।' খানিকটা দম নিয়ে নির্মল আবার পড়ে, 'সমস্ত দেশব্যাপী যে নবীন কর্মযজ্ঞ সুরু হয়েছে আপনি তার হোতা; হে গুণনিধি, আপনার অতুলনীয় ঔদার্যে, অনন্যসাধারণ মনীষায়, অপরিসীম দেশপ্রেমে, অনির্বচনীয় চরিত্রমাধুর্যে আমরা মুগ্ধ। হে জ্ঞানতপস্বি!...'

হঠাৎ হাসির দমকে নির্মল চোখে ঝাপসা দেখে। 'এটা একটু...' হাসি চাপতে চাপতে কোনরকমে বলে।

'এক্‌জ্যাক্টলি! আমিও সেই কথাই ভাবছি। আপনার জ্যাঠামশাইও ঠিক বলবেন, 'এটা কি করেছো, ভবেন?'...আপনি জানবেন, আই হেট্‌ ফ্ল্যাটারি।'

ভবেন চাপা উত্তেজনায় হঠাৎ চুপ করে' আবার ফেটে পড়ে, 'আমিও মশাই দেশের জন্যে সাফার করেছি। আমিও দেশকে ভালবাসি। এই কন্‌শাস্‌নেস্ আমার আছে। আর তা আছে বলেই আমার কোন ইন্‌ফিরিওরিটি কম্‌প্লেক্স নেই।...আপনি বলবেন, এটা ব্যাড টেস্ট। আমিও

ঠিক তাই বলি। আপনার জ্যাঠামশাইও তাই বলেন। তবে কি জানেন, পলিটিক্স ইজ্ এ ডার্টি গেম্। সব পলিটিক্স—গান্ধী পলিটিক্স, কংগ্রেস পলিটিক্স, কম্যুনিস্ট পলিটিক্স। সব মিয়াকে দেখা আছে নির্মলবাবু। সব জায়গায় এক কথা। কে কত শো দিতে পারে। নেহেরু বলতে আজ সবাই পাগল। দেখতাম মতিলালের বেটা না হলে নেহেরু কেমন নেহেরু হোত।'

'তাহলেও একটা সামঞ্জস্য বলে জিনিস আছে। আর শো বেশীদিন টেঁকে না'—নির্মল চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বললে।

ভবেন সান্যালের রোগা মুখ, খদ্দরের পাঞ্জাবী আর উজ্জ্বল চোখ সব মিলে বেশ এক বিপ্লবী ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে। হয়তো চোখের দোষ, কিন্তু উত্তেজিত হলেই তার চোখ জ্বলতে থাকে। তখন সাধারণ কথা বললেও শোনায় অসাধারণ।

'দরকার কি! দরকার কি! পলিটিশিয়ান তো ফিলজফার নয়। একথা আপনার জ্যাঠামশাইকে কতবার বলেছি যে এক ভারতবর্ষ ছাড়া সব দেশেই পলিটিক্স কেরীয়ার। ইংরেজদের বড়োঘরের ছেলেরা মিনিস্টার হবার জন্যে ছেলেবেলাতেই আয়নার সামনে ঘুসি পাকিয়ে বক্তৃতা দেয়। গান্ধিজী নেহেরু এদের অহিংসা ফহিংসা নীতিটিতি খুব ভাল। এগুলো লোকজনদেরও বলা দরকার। কিন্তু এসব কথায় চিঁড়ে ভেজে না।'

'কিসে ভেজে?'

'আপনি তো মশাই চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন। কেষ্টনগরে কি লোকের ঘাটতি ছিল? সব দিক থেকে অ্যাডভান্সড্ ডিস্ট্রিক্ট, কি সব জাঁদরেল লোক— তারিণী মুখুজ্জে, রতন শেঠ, মদন মিত্তির। উকিলকে উকিল, ডাক্তারকে ডাক্তার, ব্যারিস্টারকে ব্যারিস্টার। আর জেল-খাটাওয়ালাদের তো গোনা যায় না। তবু বলুন, প্রবোধ সেনকে কেন সিলেক্ট করা হল?'

তারপর নির্মলকে কিছু বলতে না দিয়ে অত্যুজ্জ্বল চোখ মেলে ভবেন বললে, 'সিলেক্ট করা হল তার কারণ তাঁর মতো সেন্স অফ্ অরগানাইজেশান আর কার আছে? তাঁর সম্পর্কে একটা এডিটোরিয়ালে যা লিখেছে একদম খাঁটি কথা— হি স্ট্রাইক্স এ ব্যালেন্স। সবাই নিজের নিজের মত নিয়ে আছেন কিন্তু তিনি সব মত এক করলেন।'

তার জ্যাঠামশাইয়ের তারিফ শুনে নির্মলকে ম্রিয়মান দেখায় না। জ্যাঠামশাই তার মতে কাজের লোক। এ কথাটা তার সবচেয়ে বড়ো শত্রুও স্বীকার করবে। কিন্তু নির্মলের কাছে ভবেন সান্যালের এই উৎসাহ কিছুটা ভাড়াটে, কিছু পরিমাণ কমিক না হয়ে যায় না। তার মানে মার চেয়ে মাসীর দরদে সে অসন্তুষ্ট হচ্ছে এমন না। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় আত্মীয়ের চেয়ে বন্ধু বড়। কিন্তু তার জ্যাঠামশাইকে নিয়ে এই চারপাশের জগতে, রোজকার খবরের কাগজের পাতায় এই ফাঁদাফাঁদি সে ঠিক বুঝতে পারে না।

এটা বোধহয় চরিত্রের দোষ। তার জ্যাঠামশাইয়ের মতো ঘটনাকে সে কেবল ঘটনা ভেবে পরিচ্ছন্ন অনাসক্ত মনে গ্রহণ করতে পারে না। তবে না করেই বা উপায় কি? এই যে ভবেন সান্যাল তার সামনে চেঁচাচ্ছে, দাপাচ্ছে, তারও বোধহয় একটা মানে আছে। কিন্তু সে নিজে কি করছে? সে কি পৃথিবীর এই জীবননাট্যের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেই? আর তাতে লাভ কি?

উৎসাহে ভবেন যত জ্বলতে থাকে, দেশকাল সম্পর্কে মামুলী উদ্দীপনাপূর্ণ কথাবার্তা বলে যায় ততই নির্মল বিষণ্ণ বোধ করে। তার মনে হয় তার নিজের সিদ্ধান্ত নেবার দিন আসছে। তাকেও হয় ভবেন সান্যালের কোম্পানিতে যোগ দিতে হবে অথবা—

অথবাটা কি? অথবা রাজনীতির শাঠ্যের মুখোস টেনে ছিঁড়তে হবে, দেশকালের নতুন চিত্রকল্প সৃষ্টি করতে হবে, নতুন দল গড়তে হবে কিংবা গড়তে সাহায্য করতে হবে, দরকার হলে নিজের ব্যক্তিত্ব ভুলে·· নাঃ তা আর হয় না।

নির্মল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। তার যৌবনের প্রথম দশ-বারো বছরের দিকে এবার অপলক দৃষ্টিতে তাকানোর সময় এসেছে। ভবেন ভাড়াটে কিন্তু সে নিজে কী? একজন ভালো লোক, বেসরকারি কলেজের অধ্যাপক যে এখনও প্রাইভেট ট্যুইশানি করে পয়সা রোজগার করে নি বা নোট লেখে নি। এখনও দু-চারখানা বই পড়ার চেষ্টা করে এই মাত্র। কিন্তু এভাবে কি সামনে বেশি দূর বেশি দিন চেয়ে থাকা যায়?

তার চেয়ে চার-পাঁচ বছর আগে জ্যাঠামশাই যে 'অফার' দিয়েছিলেন

(নীলু, তুই কেন পচছিস এখানে? ব্যারিস্টারিটা দি আয়। আমি তো আছি। বছর আট দশকের মধ্যে একটা ভালো প্র্যাকটিস্ গড়ে তোলা কঠিন হবে না।) সেটা গ্রহণ করলে কি ভাল ছিল না?

'কি মশাই আপনি যে গুম মেরে গেলেন! এরকম চুপ মেরে যাওয়া আমার পছন্দ না। যদি কেউ খোলাখুলিভাবে আমাকে বলে জোচ্চোর…'

'আপনি কি মনে করেন আপনি তা নন?'

'সত্যি বলছেন?' ভবেন আবার প্রদীপ্ত চোখ মেলে তাকায়।

'ঠাট্টা বোঝেন না?'

'জোচ্চর বলুন আর যাই বলুন ভালমানুষদের নিয়ে সংসার চলে না। পলিটিক্সের কথা বাদ দিন। আপনি যদি নিপট্টি ভালমানুষ হন দেখবেন বাড়ির চাকর থেকে স্ত্রী পর্যন্ত কেউ আপনার আর বশে নেই।'

'কে বললে আমি নিপট্টি ভালমানুষ? আমিও জোচ্চুরী করতে চাই। তবে সাহসে কুলোয় না,' নির্মল হেসে ফেললে।

'কি জানি মশাই, আপনি ঠিক বলছেন, না ঠাট্টা করছেন। তবে ভালমানুষ কিংবা পাগল না হলে এই গঙ্গার ধারে একলা এতগুলো দিন কাটিয়ে দিলেন! কর্তা যখন এই বাগানবাড়িখানা কিনলেন আমার অমত ছিল। আমি বলেছিলাম, এসব পুরনো জামানার ব্যাপার। এখন ছুটিতে কাশ্মীর যাবেন, পাহালগামে কটেজ নেবেন। এই সব পুরনো চিন্তার জট এখনও ছাড়ানো যাচ্ছে না, এই হচ্ছে মুশকিল।'

নির্মল আগেও লক্ষ করেছে এই ব্যাপার। ভবেন প্রায়ই বলে, তার জ্যাঠামশাইকে এটা বলেছে সেটা বলেছে। যা তার বলা উচিত ছিল কিন্তু বলতে পারে নি— তাই পরে গল্পে গল্পে অন্যকে বলে। তার জ্যাঠামশাই নিশ্চয় এত উপদেশ সহ্য করেন না। কতবার নির্মল দেখেছে মাঝপথেই ভবেনের উৎসাহ তিনি ফুৎকারে নিভিয়ে দেন।

'আপনি ভাবছেন তো, আমি এসব বলি নি, বলবার ক্ষমতা নেই,' ভবেন সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে নির্মলকে দেখে।

'দূর মশাই, আপনার সম্পর্কে আমি ভাবছিই না। ইউ আর ওয়াণ্ডার-ফুল! জ্যাঠামণি কখন আসছেন?'

॥ ছয় ॥

ঠিক যা ভাবা গিয়েছিল তাই হল। প্রবোধ সেন ঘরে ঢুকেই ভুরু কুঁচকালেন। 'নিশ্চয় ভবেনের কাণ্ড। ভবেনটা তেমনি গেঁয়ো রয়ে গেল' বলে সস্নেহে নিজের চেহারার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর ঠোঁটের দুপাশে অস্পষ্ট হাসির রেখা ফুটিয়ে বললেন, 'যাই বলো, ওরকম দাম্ভিক চেহারা আমার না।'

'দাম্ভিক কেন হতে যাবেন। ওটাই তো ব্যক্তিত্ব। যা আপনি ঢেকে চলেন ছবিতে তাই বেরিয়েছে,' ভবেন বললে।

প্রবোধ সেনের পেছনে পেছনে তাঁর ছোটো মেয়ে বুলবুলি ঢুকল। গীতা না বেলা একরম একটা সাদামাটা নাম ছিল তার। তারপর কলেজে ঢুকে নাম হয়েছিল নীলাঞ্জনা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার ঠাকুমার দেওয়া ডাক নামটাই টিকে গেল। আর তা ছাড়া তার আঁটসাট ছোটো গড়ন, এক ঝাপড়া কোঁকড়া চুল, ঘুমিয়ে পড়ার মুহূর্ত পর্যন্ত মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে অনর্গল বকা— এসব মিলে বুলবুলি নামটা বেশ জুতসই হয়েছে।

তার বাবার পেছনে ঘরে ঢুকেই সে হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'অপূর্ব, অপূর্ব, ভবেনদা। তোমায় মাইরি সন্দেশ খাওয়াব।' আর নির্মলের দিকে চোখ পড়তেই সামনে প্রায় ছুটে এসে বললে, 'তুমি একটা দেখালে ছোড়দা! লোকে গঙ্গার ধারে হৈ হল্লা করবে, ফুর্তি করবে, আর তুমি একলা বাড়ি আগলাচ্ছ!' তারপর ঠোঁট টিপে হেসে বললে, 'প্রেমে টেমে পড়লে নাকি ছোড়দা?'

'পড়ি নি, পড়ব।'

'তুমি প্রেমে পড়বে? ও বাবা! মেয়েরা ঘেঁষবেই না তোমার কাছে!'

'তা তুই বলতে পারিস না, বুলবুলি। নির্মলের মতো সোবার সীরিয়াস ছেলেকেই মেয়েরা বিয়ে করবে,' প্রবোধ সেন জ্ঞান দিলেন।

'তুমি মেয়েদের ব্যাপারে কি বোঝ বাবা? চাল কোন দেশ থেকে

কেনা হবে, কোন নদীতে ড্যাম্ তৈরি হবে, কোথায় টেস্ট রিলিফ, দণ্ডকারণ্য, রেফিউজি— এসব তুমি বোঝ। কিন্তু মেয়েদের ব্যাপারে তুমি কি বোঝ?'

প্রবোধবাবু মৃদু হাসেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর এই প্রগল্‌ভ মেয়ের সম্পর্কটা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে বর্ণিত সেই সৌম্য ভদ্রলোক এবং তাঁর আদরিণী স্পর্শকাতর কন্যার সম্পর্ক থেকে কিঞ্চিৎ আলাদা। প্রবোধ সেন ঠিক সেই ধরনের সৌম্য বৃদ্ধ নন। বস্তুত সৌম্যতা তিনি বরদাস্ত করেন না। যে মিঠে বার্ধক্যের রূপ দেখে বড়ো মেজাজে সঞ্জীবচন্দ্র একদা লিখেছিলেন, মানুষ বৃদ্ধ না হলে সুন্দর হয় না, সে সৌন্দর্য প্রবোধচন্দ্র ভয় করেন। তিনি চান এক ধরনের জোয়ান বার্ধক্য যা যুবকদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পিছ্‌পা নয়, যা তৎপর, ব্যস্ত, কর্মমুখর। সেখানে পেছনে তাকাবার সময় নেই, স্মৃতিচারণের স্বপ্নালুতা নেই। শুধু বর্তমানের সঙ্গে ক্রমাগত মোকাবিলা করে সামনে চলা। প্রবোধচন্দ্র তাঁর পার্টি কর্মীদের সভায়, অন্তরঙ্গ মুহূর্তে, সর্বদাই বলেন— জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জাতির প্রতি কর্তব্য তাঁর আদর্শ। আর এই কর্তব্য পালন করতে গিয়ে তাঁর উদার মধুর হবার সময় নেই। অবশ্য তার মানে এ নয় তিনি হিউমার করবেন না। প্রবোধচন্দ্র লক্ষ করেছেন হিউমার আসলে সাফল্যের অন্যতম সোপান। বিপজ্জনক অবস্থাতেও যাঁরা কায়দা করে' হাসেন তাঁরাই হচ্ছেন আসল মানুষ। আর প্রবোধচন্দ্র এই-রকম আসল মানুষ হতে চান। একবার নিজের অজান্তে তাঁর চোখদুটো তাঁর ছবির দিকে চলে যায়। ভবেন ঠিকই ধরেছে। ব্যাটার প্র্যাকটিকাল সেন্স খুব। যে ভাব বেরিয়ে পড়েছে ছবিতে সেটাই তাঁর আসল ভাব।

বুলবুলি কিন্তু তার বাপের এই ভাব বোঝে না। গত চার-পাঁচ বছরে তাদের বাড়িতে যে পারিবারিক বিপ্লব ঘটে গেছে তা থেকে শ্বশুরবাড়ি বীডন স্ট্রীটে দূরে ছিল বলে অথবা বুদ্ধির অভাবেই এই পরিবর্তন সে বুঝে উঠতে পারে নি। কিংবা সূর্য যেমন চিরকাল পূর্ব দিকে ওঠে তেমনি বাবা চিরকাল বাবাই থাকে এই ধরনের কোনো যুক্তি সে এখনও ছাড়তে পারে নি।

নির্মল তার বেকায়দা অবস্থা আঁচ করে বলে, 'কি নতুন ছবি দেখলি?'

'ছবি? না, ছবি দেখা আমার বারণ।'

'কেন, তোর বর আবার কবে থেকে বকধার্মিক বনল?'

'সে আমাকে কেন বারণ করবে? তবে আমার তো ইংরেজী থিলার

দেখা অভ্যেস। সবচেয়ে ভাল লাগে ছোড়দা সাসপেন্স। দিশি ছবিতে ওটা ঠিক পারে না। যাকে ভাবা গেল নির্দোষ সেই দেখা গেল খুনী। 'থি ডেথ্‌স্‌ বাই দ্য রিভার'— দেখো নি? অপূর্ব!'

'তা সেগুলোই দেখ না,' নির্মল চেষ্টা করে তার বোনের উত্তেজনা জিইয়ে রাখতে।

'না ছোড়দা, ডাক্তার বারণ করেছে। বলেছে, এসময় দেখা ঠিক হবে না। নার্ভাস্‌ টেনশান— চাইল্ডের শরীর খারাপ হবে।'

প্রবোধবাবু বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, এ সময় ওসব ছবি দেখে উত্তেজিত হওয়া ঠিক হবে না। মেডিক্যাল স্যায়েন্সে বিশ্বেস রাখা ভাল। ডাক্তারদের ম্যাক্সিমাম্‌ কো-অপারেশান দেওয়া দরকার।'

নির্মল আর বুলবুলি একই সঙ্গে আশ্চর্য হয়ে প্রবোধচন্দ্রের দিকে তাকায়। প্রবোধচন্দ্র বুঝি মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।

•ভবেন প্রকারান্তরে তাঁর ভুল শুধরিয়ে দেয়। দেশনেতাদের একদিকে বজ্রাদপি কঠোর আবার কুসুমের চেয়েও কোমল হতে হবে এই ধরনের উপদেশ দেবার ছলে বলে, 'আপনিই তো বলেন স্যর মেডিক্যাল সায়েন্স কত ইম্‌পারফেক্ট।'

'তা যা বলেছ, তবে সিনেমা এখন থাক। তুই একটা শর্ষে বাটা দিয়ে ভাল করে মাছের ঝোল রাঁধ তো বুলবুলি। ডাক্তারদের কথা শুনে কতদিন আর পান্‌সে খাওয়া যায়!'

গত দশ-বারো দিন এক নাগাড়ে রঘুর হাতে রান্না খাবার পর সেদিনের খাওয়াটা জমকালো ভুরিভোজনের মতোই লাগছিল। তারপর গা গড়িয়ে সারা বিকেল বুলবুলির সঙ্গে তার বীডন স্ট্রীটের শ্বশুরবাড়ি, কাঠের ব্যবসায় তার শ্বশুরের ভাগ্যের ওঠাপড়া, তার ছেলে টুবলু যে দার্জিলিংয়ে সেন্ট জোসেফে পড়ে তার পাঠ্যজীবনের সমস্যা (বড্ড রোগা হয়ে যাচ্ছে ছোড়দা, খালি মুসুরির ডালের সুপ খেতে দেয়), তার এক দেওর যে খড়্গপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে পাস করে বিলেত গিয়েছে এবং বিলেত থেকে রং বেরংয়ের কার্ড পাঠায় সে যদি মেম বিয়ে করে আনে সেই ভাবনা, তারপর হাত দেখা, এ নিয়ে হাসি চীৎকার— বিকেলটা এমনি কেটে যাচ্ছিল।

নির্মলের মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল তার নিজের জগৎ বা আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে তার বাপের জগৎ, তার রং-জ্বলা ছেতলাপড়া বেসরকারি কলেজবাড়িটায় মাস্টারী জীবন, চারপাশের জগৎ সম্পর্কে তার ভাবনা— এ সবই অবাস্তব। বুলবুলির কথার বন্যায় ভাসতে ভাসতে তার মনে হতে থাকে বোধহয় জীবনটা খুব সরল, সোজা। আর সেইভাবেই তাকে গ্রহণ করে' নেওয়া ভালো। আর সে নিজে বোধহয় জোর করে' বেঁকাভাবে দেখছে, বোধহয় তার বাবাও দেখেন সেইভাবে। সেই বেঁকা করে জীবন দেখবার উত্তরাধিকার বয়ে নিয়ে চলার কি কোনো মানে আছে ?

বুলবুলির ঝাঁকড়া চুলের দিকে চেয়ে চেয়ে নির্মল ভাবে— সে নিজে দুটো জগতের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে। দরজাটা ভেজানো কিন্তু চাবি দেওয়া নেই। একটু ধাক্কা দিলেই সে আর একটা জগতে চলে আসতে পারে যেখানে বুলবুলি, বুলবুলির বর, জ্যাঠামশাই আর তার বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়ি, ভবেন সান্যাল আরও অনেকে। আর এদিকে ? এদিকে তার বাপ, জীবনযুদ্ধে পরাজিত সুবোধচন্দ্র, বোসপাড়ার পুরনো গলির স্যাঁতসেতে ঘর, একশো ছেলের বিশাল ক্লাসে গলায় রগ ফুলিয়ে জন কীট্‌সের সৌন্দর্য ও সত্যের অভিন্নতা প্রমাণ করবার ব্যর্থ চেষ্টা, ছেলেবেলার স্মৃতি, অবিভক্ত বাংলা দেশ সম্পর্কে একটা মায়া, সব মিলে মন-অবশ-করা এক বিষণ্ণতা। গত দশ-বারো দিন এই গঙ্গার ধারে আসলে সে এই দুই জগতের মধ্যবর্তী দরজায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

'আচ্ছা ছোড়দা, তুমি হাত দেখায় বিশ্বেস করো ?'

'কলেজে থাকতে চেরো-র বইটা পড়েছিলাম। এখন সব ভুলে গেছি।'

'যাক, তুমি অন্তত একটা ব্যাপারে একটু নর্মাল।'

তারপর নির্মলকে চুপ করে থাকতে দেখে বললে, 'উনি আবার খুব বিশ্বেস করেন। অনেক বইপত্তর ঘাঁটেন। বাবাকে তো উনিই খবর দিয়েছেন বরানগরের সাধুর কথা।'

'বরানগরের সাধু!'

'বাঃ, তুমি যে আকাশ থেকে পড়লে। কেন, ভবেনদা তোমায় বলে নি ? ···অবশ্য সাধু ঠিক নন। একেবারে মডার্ন। সিগারেট খায়, বুশশার্ট পরে। তবে আশ্চর্য ক্ষমতা ছোড়দা। যা বললে, সব মিলে গেল।'

'সব মিলে গেল ?' নির্মলের গলায় বিদ্রূপ স্পষ্ট।

'স-অ-ব। আমায় বললে, আপনার মনে একটা কষ্ট আছে। সন্তান সম্পর্কে আপনার অনিশ্চয়তাবোধ আছে।...ঠিক বলে নি? আমি তো টুবলুকে নিয়ে ওঁর সঙ্গে ক্রমাগত ফাইট করছি। ঠিকমত খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে না। শুকোচ্ছে ছেলেটা। কেন, কলকাতায় কোনো ইস্কুল নেই?'

'আর কি কি মিলল ?'

'সব— সব। আবার ইংরেজী জানে লোকটা। বললে, আপনার সঙ্গে যার ভাগ্য যুক্ত হবার কথা ছিল তা ঘটে নি। অবশ্য তাতে ভালই হয়েছে। মঙ্গলের দোষ ছিল।...তুমি জানো না, এক বিলেতফেরত বড়ো ডাক্তারের সঙ্গে আমার বিয়ের সব ঠিকঠাক। এমন সময় জানা গেল লোকটা ড্রাংকার্ড।'

'জ্যাঠামণিও হাত দেখায় ?' নির্মলের সন্দেহ হয় প্রবোধচন্দ্রের আত্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে হাত দেখানো ঠিক খাপ খায় কি না।

'তুমি কি বলছ ছোড়দা? কৃষ্ণমাচারী, দিল্লীর আরও সব মিনিস্টার, পুলিস কমিশনার, হাইকোর্টের জজ— একেবারে গাড়ি গিসগিস করছে সাধুর বাড়ির সামনে। বাবা যাবে না কেন? বাবাকে বলেছে 'লেবার' দেবে। বাবা নেবে কেন ? বাবা 'হোম' চায়।'

ভবেনের পায়ের আওয়াজ এল। 'ব্রাদার, কর্তা ডাকছেন,' ভবেন এসেই বললে।

নীচে লনে রঘু চেয়ার পেতে দিয়েছে। সামনে কার্তিকের গঙ্গায় পড়ন্ত রোদ। ইলিশ মাছের নৌকোগুলো ফিরছে। বিশেষ কিছু আর হয় নি ওদের এ বছর।

'সুবোধের খবর কি ?' নির্মলকে পাশের চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত করে প্রবোধবাবু বললেন।

বাপের প্রসঙ্গ জ্যাঠামশাইয়ের সামনে পাড়তে নির্মলের বাধো বাধো ঠেকে যদিও দুই পরিবারের ভেতর সেই সবচেয়ে বড়ো যোগসূত্র। বছর পনেরো আগে যখন দুভাই একসঙ্গে থাকতেন বোসপাড়া লেনে তখন থেকেই নির্মল ছিল জ্যাঠার পেয়ারের। তারপর ক্রমশঃ ছোটোভাইয়ের পতন ও দাদার উত্তরোত্তর উন্নতি। কিন্তু বালিগঞ্জ প্লেসের যখন বাগানওয়ালা বাড়ি উঠল তখনও স্কুলের ছুটিতে মাসের পর মাস কাটিয়েছে নির্মল জ্যাঠার সঙ্গে।

তারপর অবশ্য কলেজে পড়ার কয়েকটা বছর আবার চাকরির কয়েকটা বছরে সে বাপের জগতেই ফিরে গিয়েছে। তিন-চার বছর আগেও যখন তাকে সোজাসুজি বিলেত পাঠাবার প্রস্তাব পেড়েছিলেন প্রবোধবাবু তখন নির্মল বলেছিল, 'না জ্যাঠামণি, দেশে থেকেই যা করার হয় করব।'

নির্মল চেয়ারে বসতে বসতে বললে, 'এখন তো ভালই আছেন। মাসতিনেক আগে সেই অ্যাটাকটা হয়েছিল তারপর থেকে একটু নরম হয়ে পড়েছেন। সকাল-বিকেল শ্যামপার্কে গিয়ে বসেন। দূরে বেরোন বারণ।'

'তখন একবার যাব ভেবেছিলাম; কিন্তু এমন চাপ কাজের··· পাব্লিকম্যান হতে গেলে নিজের ভাল-মন্দ বলে আর কিছু থাকে না,' প্রবোধবাবু একটু গলা খাঁকরি দিয়ে বললেন।

তাঁর মনে পড়ল তাঁর ভাইয়ের যখন গুরুতর অবস্থা ঠিক সেই সময় প্রধানমন্ত্রী ও তাঁদের পার্টির কর্তাদের সঙ্গে তাঁকে যেতে হয়েছিল দুর্গাপুরে কোন-একটা প্লান্ট উদ্‌বোধন উপলক্ষে। এখন হলে হয়তো যাওয়ার খুব দরকার হত না কিন্তু তখন কর্তাদের মনের অবস্থা ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না। তারিণী মুখুজ্জের মতো ডেন্‌জারাস্ রাইভেল-কে জেলা থেকে পুশ দিচ্ছিল। বাস্তবিক তিনমাস আগে প্রবোধচন্দ্রের হঠাৎ মনে হয় ঘাটে এসে তরী ডুবল। তখন তাঁর আত্মবিশ্বাস আরও জোরাল করবার জন্যে বলতেন তাঁর মিহি চাঁছা প্রায় মেয়েলী গলায়, 'আই ডোণ্ট্ কেয়ার। দ্য ক্যালকটা বার ইজ অলওয়েজ্ রেডি টু ওয়েলকাম্ মি উইথ ওপ্‌ন্ আর্মস্'। কিন্তু ভেতরে ভেতরে যারপরনাই উদ্‌বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। ঠিক সেই সময় বুলবুলির বরের কাছে বরানগরের সাধুর খোঁজ পান। আর সে লোকটা যা যা বললে সব মিলে গেল। টাইম দিয়েছিল তিনমাস থেকে ছ মাস— এর মধ্যেই মোড় ফিরবে ('শনিটা স্যর আপনাকে বড় জ্বালাচ্ছে')। তখন বলতে কি প্রবোধ সেনের মনে স্বজন বলতে কেউ ছিল না। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন প্রবোধচন্দ্র। পাব্লিকম্যান হবার গভীর সচেতনতায় তাঁকে কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ দেখায়।

'আচ্ছা জ্যাঠামণি, তুমি নাকি কোন সাধুর পাল্লায় পড়েছ? তোমার তো এ-সব বাই ছিল না। তুমি আবার কবে থেকে এ-সব ধরেছ?' নির্মল কিছু চিন্তা না করেই বলে বসল।

প্রবোধ সেন ভুরু কুঁচকান। তাঁর ভাইপোর এ ধরনের অন্তরঙ্গতা তিনি আজকাল অপছন্দ করেন। বরং তার স্বাভাবিক চুপচাপ থাকা কিছু পরিমাণ অসামাজিক হলেও সহনীয়। ভুরু কুঁচকানো অবস্থাতেই বললেন, 'আমি কাউকে ধরি নি নির্মল। তোমার জ্যাঠাকে অত গেঁয়ো ভেবো না।' তারপর হঠাৎ কথার মোড় ফিরিয়ে বললেন, 'অ্যাস্ট্রলজাররা আমাদের কেউ বেশি জানে না। দে ট্রেড ইন্ হিউম্যান্ উইক্নেস্। তবে সবাই তো আমরা বাণিজ্য করছি। শুধু ও-বেটাদের দোষ দেওয়া কেন?'

আবার চুপ করে থেকে বললেন, 'আর কিছু গুণী লোক যে একেবারেই নেই তাই বা বলি কি করে। চোখের ওপর লোকটা গড়গড় করে তোমার অতীত বলে দিল। যেন নোট বই দেখে মুখস্থ বলছে। তুমি কি করবে বলো? বিশ্বেস করো বা না করো তার কিছু এসে যায় না।'

তারপর গঙ্গার বুকে পড়ন্ত রোদ্দুরের দিকে চেয়ে বললেন, 'লাইফে চান্স আসে এ কথাটা মানতেই হবে। যখন চান্স আসে না তখন যতই চেষ্টা করো কিচ্ছু হবে না। কিন্তু যখন চান্স আসে তখন অতি সহজেই সব হয়ে যায়। একটু চেষ্টা করলেই অনেকখানি আসে। বাজে মালা জপ্‌টপে আমি বিশ্বেস করি না, কিন্তু চান্সে আমি বিশ্বেস করি। সুবোধ ইন্ ফ্যাক্ট বুঝতেই পারল না কখন তার ভাল সময় এল গেল। সে ঠিক এক ভাবেই জীবনটা কাটিয়ে দিল তার ফলেই শেষ বয়সে এত কষ্ট।'

নির্মলের মুখে একটা চাপা অসহিষ্ণুতা ফুটে উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলেন, 'আমার ভাইকে তো আমার চেয়ে কেউ বোঝে না। একেবারে গিনি সোনা। কাউকে কোনোদিন পরোয়া করে নি। কিন্তু তোমায় পরোয়া করতে হবে। জামানা পাল্টে গেছে। এখন মানুষকে তার···তার এফিশিয়েন্সি প্রমাণ করতে হবে। শুধু দরজা বন্ধ করে আইডিয়ালিস্ট হলে চলবে না। পিপলের কাছে যেতে হবে। তার জন্যে সর্বস্ব পণ করতে হবে। গান্ধিজী বলেছেন···।' প্রবোধ সেন হঠাৎ চুপ করে যান। নিজেরই মনে হয় যেন ইলেকশান মিটিংএ বক্তৃতা দিচ্ছেন। ভাইপো'র সামনে এই আত্মসচেতনায় নিজের ওপর অসন্তুষ্টও হলেন। একটু ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, 'তোমার যদি ইচ্ছে হয় সাধুর কাছে যেও, আমি কিছু বলছি না।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ যাব। আজকেই যাবে?' নির্মল উৎসাহ দেখায়।

প্রবোধ সেন উঠে পড়ে হাঁক দেন, 'রঘু, চেয়ার উঠাও।···আজ রাত্তিব বারোটায় সময় দিয়েছে। খুব স্ট্রেঞ্জ্ সময়। কি কবা যাবে।'

জ্যাঠামশাই উঠে যাবার পরও নির্মল কিছুক্ষণ বসে থাকে। গঙ্গা প্রায় খালি। শুধু এক জায়গায় লাল জলে একটা গাধাবোটকে নিয়ে ছোটো একখানা লঞ্চ ধীরে ধীবে এগোয়। নির্মলেব মনে হচ্ছিল সে প্রায় চৌকাঠ পেবিয়ে অন্য জগতে চলে গিয়েছিল আবাব পা গুটিয়ে নিয়েছে। যে জায়গায় ছিল সেখানেই আছে। ঠাণ্ডা পড়ছে। নির্মল উঠে পড়ল।

॥ সাত ॥

রাত বাবোটায় বরানগবেব সাধুব সঙ্গে 'অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট'। স্থানীয় এক উকিল তাঁব প্রাইভেট সেক্রেটারি। তাঁব মাবফত সময় ঠিক কবা হয় ফোনে। বাত বাবোটাব কথা শুনে প্রথমে প্রবোধ সেন ধমকিয়েছিলেন ভদ্রলোককে, 'সবটাতে বাড়াবাড়ি কববেন না।' কিন্তু দেখা গেল শেষপর্যন্ত তিনিও বাজী হয়ে গেলেন। উকিল ভদ্রলোক ব্যাঙ্কশাল কোর্টে তাঁব সহকর্মীদেব সঙ্গে গল্পে গল্পে বলেন, 'পাঁচ টাকা পোনা মাছেব কাটা, যাব পোষাবে নেবে, যাব পোষাবে না নেবে না।' অর্থাৎ বাত বাবোটায় কেন তিনটেতেও 'অ্যাপয়েটমেণ্ট' কবা যেতে পাবে। যাব গবজ আসবে, যাব নেই আসবে না। আব সাধুকে ঘিবে সর্বদা এক গুরুত্বপূর্ণ পবিবেশ সৃষ্টি কবায় মাছেব দবেব মতো তাঁব পশাবও চড চড কবে বোজ বাড়ছে।

গাড়ি অতিকষ্টে ঢুকতে পাবে এমন অনেকগুলো গলি, হেডলাইটেব আলোয় আলোকিত ইঁট-বেব-কবা কালচে বাড়িব সাবি, খাটা পায়খানা, ভাঙা মন্দিবেব দাওয়ায় কুঁকড়ে শোয়া কুকুব আব ভিখিরী দেখতে দেখতে নির্মলের ঘুম এসে গিয়েছিল। একটা গলিব মুখে ঢুকে গাড়ি আর যাবে না। বুলবুলি ঠিকই বলেছিল, এত বাত্তিবেও এ জায়গায় গাড়ি একেবাবে দে[illegible]য় আছে। তাদেব কোনটার পাশে তকমা আঁটা আর্দালী, কোনটাব 'আচ্ছা [illegible]সি বসে মাবোয়াড়ি বউ। বাড়িব সামনে একটা বোয়াকে তো এ-সব [illegible] জায়গায় লোকেব ক্রমাগত আনাগোনা। বসাব জায়গাব নির্মল কিছু চিন্তা[illegible]উ গাড়িতে, কেউ কেউ বাইবে দাঁড়িয়ে সিগাবেট টানছে।

বুলবুলিকে অনেক কষ্টে নিরস্ত করা গেছে। 'ওরা কি বলতে কি বলে ফেলে! আর এ সময় ওসব এক্সাইট্‌মেন্টে লাভ কি দিদি।' ভবেনই শেষকালে তাকে সামলেছে।

যে ঘরে সাধু বসেছেন সে ঘরের সামনে একটু বড়ো ধরনের ঘরখানা জুড়ে যেখানে সেখানে পাতা লম্বা বেঞ্চ, খান চার-পাঁচেক ভাঁজকরা চেয়ার। বাড়িতে ঢুকবার আগেই ভবেন টপ করে সামনে এগিয়ে অতিথি যেমনভাবে আপ্যায়ন করে তেমনিভাবে প্রবোধবাবুর সামনে মাথা হেলিয়ে হাত দেখিয়ে আসুন আসুন করতে করতে ঢোকে, সঙ্গে সঙ্গে দুটো চেয়ারও খালি হয়ে যায়। তার একটাতে বসে পড়েই নির্মল চমকে ওঠে, 'তুমি এখানে?' নিজের অজ্ঞাতসারেই তাব প্রশ্নটা মুখ দিয়ে বেবিয়ে পড়ে।

'তুমি?' সামনে যে ছোকরাটি বসেছে সে একটু আত্মসচেতনভাবে নির্মলকে বললে।

প্রদীপ্ত মালদার এ ডি এম্। নির্মল তাব জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে আলাপ কবিয়ে দিতে প্রবোধচন্দ্র বোধহয় অপ্রসন্ন হলেন। জ্যোতিষের কাছে তাঁর আনাগোণা বেশি প্রচার হওয়া ঠিক না ভাবলেন। কোথা থেকে কি হয়ে যায় বলা যায় না। হয়তো কাগজে বেরিয়ে গেল। যেরকম বিশ্রী সব কার্টুন বেরোচ্ছে কাগজে। হুজুগ পেলেই তো বাঙালী জাতটা আর কিছুই চায় না— একসঙ্গে অনেকগুলো চিন্তা মাথায় আসে। প্রদীপ্তও আঁচ করে প্রবোধ সেনের মনের অবস্থা। উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে নির্মলকে বললে, 'বড্ড গরম হচ্ছে না? একটু বাইরে যাই।'

'তুমি এখানে কেন ভাই?' বাইরে এসেই নির্মল জিজ্ঞেস করলে।

'আমি তো কলকাতায় এলেই আসি। তোমার মতো আমিও তো মাস্টারী করতাম। ডিড্‌ আই এভার ড্রিম্ আই উড্‌ টেক চার্জ অফ এ ডিস্ট্রিক্ট?' ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে প্রদীপ্ত বললে। তারপর তার পুরু ফ্রেমের চশমাটা নাকের ওপর ঠিক করে বসিয়ে বললে, 'লাইফ্‌ ইজ্‌ এ চান্স আফ্‌টার অল্। আমার-তোমার ইচ্ছে খুব ম্যাটার করে না। আর সেইজন্যেই খানিকটা অ্যালার্ট থাকা দরকার।'

চুপ করে থেকে বললে, 'এই যে আমি মালদায় রট করছি। এও চান্স। দেড় বছর আগে ট্রান্সফারের কথা হয়েছে। তারপর থেকে ফাইল চাপা

পড়েছে।…ও আচ্ছা। তোমার জ্যাঠা মে বি অফ্ সাম্ হেল্প। এও হয়তো একটা চান্স। এই তোমার সঙ্গে আমার দেখা হওয়া।'

তার কথায় ছেদ পড়ে একটি মহিলার আবির্ভাবে। ফোঁস ফোঁস করে চোখের জল ফেলতে ফেলতে মহিলাটি তাদের গা ঘেঁষে বেরিয়ে গিয়ে সামনের গাড়িতে ওঠে। তার এক ছেলে নাকি দমদম্ এয়ারপোর্টে ধরা পড়েছে তিনমাস আগে আন্তর্জাতিক কোন সোনা পাচার কেন্দ্রের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে। সেদিক চেয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে প্রদীপ্ত বললে, 'ওর কিচ্ছু হবে না। সাধু বলেই দিয়েছে। মঙ্গলের দাপট এমন বেশি যে শনি নিউট্রাল থাকলেও কিছু হবার নয়।'

'তুমি এসব সীরিয়াসলি বলছ নাকি প্রদীপ্ত? এই সব শনি মঙ্গল! তাহলে লেখাপড়া শিখে লাভ কি!'

'লেখাপড়া শেখার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। ওভাবে বলাট সিম্প্লিফিকেশান। এত লোক তো রাস্তা দিয়ে হাঁটে, এর মধ্যে কটা লোক গাড়িচাপা পড়ে মরে? এটাকে কেউ বলবে অ্যাক্সিডেন্ট, আর জ্যোতিষে বলবে ফাঁড়া। তুমি ফাঁড়া মানো কি না এটাই হচ্ছে কথা।'

তারপর গলার স্বর নামিয়ে বললে, 'তোমার জ্যাঠামশাই আগেও এসেছেন। সাধুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। সাধু বললে, ওঁর 'হোম'টা হচ্ছে না সেজন্যে আসেন। তবে হবে। কর্মিষ্ঠ পুরুষ। বলেছেন কর্মিষ্ঠ পুরুষের রাশিচক্রে এক ধরনের ডিনামিজ্ম আছে যা তোমার জ্যাঠামশাইয়ের বেলায় আছে।'

ভেতর থেকে ডাক এল। নির্মল প্রবোধচন্দ্রের সঙ্গে সামনের ভেজানো দরজা খুলে ঢুকল। একটা রোগা হ্যাংলা লোক, একমুখ কাঁচা-পাকা খোঁচা খোঁচা দাড়ি। পরনে লালপেড়ে ধুতি, তার ওপর হলদে কাঁধময়লা হাত-কাটা বুশশার্ট। পচর পচর করে লোকটা এমন পান খাচ্ছে যে কষ গড়িয়ে পড়ছে পানের রস। নিচু গলায় সামনের এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ চলেছে। নির্মল আর একটু পরেই জানতে পারল ভদ্রলোক বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক। সাধু একটা আঙুল দেখিয়ে আগন্তুকদের বড়ো ঘরখানার কোণায় পার্টিশন-আড়াল অংশটি দেখিয়ে দিয়ে যেমনভাবে কথা বলছিলেন তেমনি বলতে থাকেন। উকিল ভদ্রলোক ফিসফিস করে বললেন, 'উনি আগেই ডাকতে বললেন।'

বলা যায় এটা এক স্বতন্ত্র রিসেপশান রুম। টেবিলের ওপর দু কাপ ঠাণ্ডা চা আর দুটো করে সিটানো সিঙাড়া। প্রবোধবাবু বললেন, 'তুলে নাও হে। সাধু লোক, না খেলে চটবে।'

উল্টোদিকে ইজিচেয়ারে অর্ধশায়িত এক বুড়ো। নির্মল আন্দাজ করে বোধহয় বুলবুলি-বর্ণিত হাইকোর্টের জজ।'

পার্টিশানের ফাঁক দিয়ে কেবল সাধুর মাথা দেখা যায়। সামনে একটু ঝুঁকে পড়ে সম্ভবত কোন রাশিচক্রের দিকে চেয়ে হঠাৎ প্রায় হৈহৈ করে ওঠেন, 'আঃ হা! একেবারে কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে! কি প্রচণ্ড প্রাণদায়িণী সম্ভাবনা! কি অমলা যশ! কি অহৈতুকী শ্রদ্ধা আপামর মানুষের কাছ থেকে। সব মেরে দিলি মা, সব মেরে দিলি! লোকটাকে একেবারে পথের কাঙাল করে দিলি রে! পথের কাঙাল ছাড়া আর কি। যে হাতে প্রাইম মিনিস্টার হওয়া যায় সে হাতে ভাবতে হচ্ছে ইউনিভার্সিটির চেয়ার পাওয়া যায় কিনা।...তবে এ হল কুটিলা-জটিলার খেলা। কুটিলা-জটিলার খেলা না হলে ঠিক পোষায় না।'

'কথামৃত বলছেন?' কম্পিতকণ্ঠ উল্টোদিক থেকে ভেসে আসে।

'আরে সব শালারই এক অমৃত। সব কেষ্টর মুখে এক কথা। গুড্ আব ইভিল-এর কন্‌ফ্লিক্ট। কি মশাই, ছাত্রদের পড়াতে হয় না আপনাদের?'

'কিন্তু ইভিল যে বাবা বারেবারেই জিতছে। হেড্ অফ্ দ্য ডিপার্টমেন্ট সেটাও পেলে। তারপর চেয়ার— সেটাও নিলে। মুস্কিল হয়েছে বেটার স্বাস্থ্য। আটান্ন বছরে কি স্বাস্থ্য! ডায়বেটিস্ নেই। মনের আনন্দে সবাইকে দেখিয়ে দেখিয়ে রসগোল্লা খায় আর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে, 'আপনাকে স্যাকারিন্ দিয়েছে তো!'—একটা কিছু না করলে তো চলছে না বাবা!'

'তুই শালা পাপী,' হরঠাকুর চেঁচিয়ে উঠলেন।

'পাপী বলেই তো এসেছি ঠাকুর। তোমার মতো সাধু হলে তো গ্যাঁট হয়ে বসে থাকতাম এক জায়গায়।'

হরঠাকুর কুষ্টিটা সামনের গদিতে ফেলে একমনে কি দেখতে থাকেন। সে দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে আবার চেঁচিয়ে ওঠেন, 'আছে, আছে! এখনও ছটি মাস দাঁত কামড়ে থাকতে হবে। সামনের অঘ্রাণ থেকে জ্যৈষ্ঠের মধ্যে তোর যদি হিল্লে না হয় তবে হরঠাকুর এ কাজ ছেড়ে দেবে।'

সামনে বেঁটে গোলগাল চশমাওয়ালা কালো ভদ্রলোকটির মোটা ঘাড়খানা এবার দেখা যায়। বোধহয় উত্তেজনায় সামনের দিকে আরও এগিয়ে এসেছেন। যেন বিমর্ষভাবেই স্বগতোক্তি করলেন, 'তাহলে আর হল না!'

'হল না কিরে, হল না কিরে?' হরঠাকুর খিঁচিয়ে উঠলেন, 'তোর বাপের সম্পত্তি যে হবে না। যে মালিক সে যা ব্যবস্থা করেছে তাই হবে। সামনের আশ্বিন থেকে কর্মক্ষেত্রে যে যশপ্রাপ্তির যোগ দেখা যাচ্ছে তা তোকে কয়েক মাসের মধ্যেই ঠেলে তুলবে। দেখিস, আবার সামলাতে না পেরে ছুটে আসিস না হরঠাকুরের কাছে।'

সচরাচর অধ্যাত্মচর্চায় যাঁরা খ্যাতিমান তাঁরা যেমন সীজারের মতো কথা বলেন ('যখন সীজার স্থির করেছেন এটা হবে···) তেমনি আগাগোড়া হরঠাকুর বলতে থাকেন, 'হরঠাকুর তোমাদের মতো লাফালাফি করতে পারে না। হরঠাকুরের যা কাজ তাই করবে। সে মার কাছে তোদের কথা জানাবে। তারপর মায়ের হাত। সে যদি রাখে রাখবে। এতে হরঠাকুর কি করবে? সে তো আর ফুটপাতে হাত দেখানোর বিজ্ঞাপন এঁটে বসে নি।···তোরা আসিস কেন? তোরা না আসলে তো আমি বেঁচে যাই। একটু মন স্থির করে মায়ের ধ্যান করতে পারি।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকটি পাঞ্জাবীর ওপর গরম শালখানা ঠিক করতে করতে উঠে পড়লেন। বোধহয় ঠিক বুঝতে পারলেন না তাঁর দুঃখিত বা আনন্দিত হওয়া উচিত। আশ্বিন মাস থেকে সুদিন শুরু হবে তার মানে ঠিক আশ্বিনেই হবে তার কোনো মানে নেই। হতে হতে বছর ঘুরে যেতে পারে। তাঁর হাতে ছটা না আটটা মাস। তারপরই রিটায়ারমেন্ট। মানে কয়েকটা মাস হয়তো মেরে কেটে চেয়ারে থাকতে পারেন। তবে হরঠাকুর যা বলছেন তা যদি ঘটে—যদি যশপ্রাপ্তিযোগ ঠেলেই তোলে তাহলে কি গোটা দুয়েক এক্সটেনশান পাওয়া যাবে না? অধ্যাপকমশাই দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। সে নিঃশ্বাস বিষাদের না উল্লাসের বোঝা গেল না।

॥ আট ॥

হরঠাকুরের আদি বাস পাইকপাড়া। তখন প্রতি প্রশ্নে তিনি দশ টাকা করে নিতেন। আর তাঁর প্রচুর খদ্দের ছিল। যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, বাঙালী-অবাঙালী কেউ বাদ যেত না। হরঠাকুর বলতেন প্রশ্নের উত্তর তাঁর কাছে অঙ্কের মতো। যেমন পাঁচ আর পাঁচে দশ ঘটবেই তেমনি গ্রহের অবস্থার ফেরে মানুষের ভাগ্যের ফের হতে বাধ্য। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোয়াড়ে, খয়া কাঁচাপাকা দাড়িভর্তি প্রায় অশোভন ব্যক্তিত্ব তিনি কাজে লাগান। চেহারা ভাঙিয়ে ভক্ত বাড়ান না, এ কথা হরঠাকুর প্রায়ই বলতেন। 'যারা আমার কাছে আসবে দায়ে পড়ে আসবে যেমন লোকে খুন করে উকিলের কাছে দৌড়য়। আমার চেহারা দেখে আসতে যাবে কেন?'

বস্তুত পচ্‌পচ্‌ করে মুখের কষ গড়িয়ে দিবারাত্র পান সেবন, প্যাকেটের পর প্যাকেট সস্তা চারমিনার সিগারেট ওড়ানো, খোঁচাখোঁচা অনাদৃত চুল আর ধুতির ওপর কাঁধময়লা বুশশার্ট — এগুলো কেউ কেউ বলেন স্বেচ্ছাকৃত। হরঠাকুর যেন প্রকারান্তরে ভক্তদের বলছেন, 'চেহারায় নয়, কোনো বাহ্যিক কারণে নয়, কেবল এলেমের জোরে আমি তোমাদের আকর্ষণ করছি।'

তারপর উনি পাইকপাড়া থেকে বরানগর উঠে এসেছেন খ্যাতির শিখরে। এখন আর তিনি কোনো ফি নেন না। কেউ কেউ বলেন, ফি নেবার দরকার নেই সেজন্যে নেন না।

আসলে লোহালক্কড়ের ব্যবসায়ী আড্ডিদের বড়ো ছেলের পেটে আল্‌সার হয়ে যখন মরণাপন্ন হল তখন থেকেই বলা চলে হরঠাকুরের গ্রহেরও অবস্থান্তর ঘটল। ছেলেটিকে অপারেশান করার পরও যখন কিছু হল না, যখন চৌষট্টি টাকা ফি-ওয়ালা ডাক্তারবাবুরাও হাল ছাড়লেন সেই সময় হরঠাকুরের মায়ের ফুলের স্পর্শ এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনল ছেলেটির শরীরে। ছেলেটি সারতে শুরু করল। ছেলেবেলা থেকেই একটু গানবাজনার বাই ছিল তার। হরঠাকুরের প্রবল ভক্ত বনে যাবার পর

অফিসেও সে কাজের ফাঁকে ফাঁকে এক কলি গেয়ে ওঠে। তার সমাজসচেতন কোনো কোনো সহকর্মী তার মধ্যে মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণ লক্ষ করলেও তার ডিপার্টমেন্টের বাঙালী বড়োসাহেব একটু ফাঁপরে পড়েছিলেন। ছেলেটির কাজে ফাঁকি নেই, কামাই করে না। তবে মাঝে মাঝে তাঁর ঘরে ফাইল নিয়ে এসে হঠাৎ তাঁর মুখের সামনে হাসিমুখে হাত নাড়িয়ে হয়তো গেয়ে ওঠে :

মনের কথা কইব কি সই কইতে মানা
দরদি নইলে প্রাণ বাঁচে না।

বাঙালী সাহেব হকচকিয়ে ওঠেন। 'একেবারে মাথাটা গিয়েছে তোমার,' সামান্য প্রতিবাদও করেন। কিন্তু ঘাঁটাতে সাহস পান না। বলা যায় না, হয়তো দিব্যব্যাপার কিছু আছে। জীবনের সব-কিছুই তো যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। এই সব ভেবে চুপ করে থাকেন।

সেই ছেলেটির ভাগে যা ছিল অর্থাৎ বরানগরের সাত বিঘে জমির বাগান, মার্বেল মোজেইকের মেজেওয়ালা পুরনো তিনতলা বসতবাটি, বাজারে দশ বারোখানা দোকানঘর এসবের এখন কার্যত মালিক হরঠাকুর। কিছুটা ভাগ বসায় তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি, সেই ব্যাঙ্কশাল কোর্টের উকিল। এখন হরঠাকুর আর ফি নেন না, মানুষ স্বেচ্ছায় সোনাদানা দিয়ে যায়।

রিসেপশান রুমে বসে বসে নির্মলের ঢুলুনি আসে। আর মাঝে মাঝে চোখ মেলতেই আর-এক দিকে ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে নজরে আসে সারি সারি উদ্‌বিগ্ন মুখ। এক বৃদ্ধ নিতান্ত বেজারভাবে তাদের দিকে চেয়ে আছেন এবং হরঠাকুরের সান্নিধ্যে তাদের মতো ভাগ্যবানদের মনে মনে গাল দিচ্ছেন।

'আমার জ্যাটা স্যার এল.পি খালি বলতেন, ইটার্নাল ভিজিলেন্স ইজ দ্য প্রাইস্ অফ ফ্রিডম। আমিও সেই কথাই বলি। সেদিন ময়দানে কি কাণ্ডটাই ঘটে গেল দেখলেন। কেউ ধারণা করেছিল মশাই কলকাতার বিশ-তিরিশ লাখ লোক কমিউনিস্টদের কাণ্ড দেখবার জন্যে জমায়েত হবে!'

প্রবোধ সেন ভুরু কুঁচকান। এই অবসরপ্রাপ্ত জজসাহেবটিকে বোকা জরদ্গব বলে তাঁর মনে হয়। এই কথামালার গল্পের মতো একেবারে সোজা

নীতিশাস্ত্র যে আজকাল অচল এ কথা পুরনো জামানার লোকগুলোর মাথায় একদম ঢোকে না। চাপা উষ্মায় বললেন, 'কমিউনিস্টদের কাণ্ড কে বলেছে! রাশিয়ার সব বড়ো বড়ো নেতা, বুলগানিন, ক্রুশ্চভ্ এরা কি আমাদের দেশের হেঁজিপেঁজি কমিউনিস্ট নাকি? তা ছাড়া ভারতবর্ষ সকলের বন্ধু। রাশিয়া আমেরিকা সকলকে আমরা ডাকছি, যে সৃষ্টিযজ্ঞ শুরু হয়েছে আমাদের দেশে তার সঙ্গে সহযোগিতা করতে।'

নির্মল আবার ঢুলছে। তার মনে এল বোধহয় গতবছর আক্ষরিকভাবে এই কথাগুলোই বিরোধীদের মুখে ছুঁড়ে দিয়ে তার জ্যাঠামশাই 'হীয়ার' 'হীয়ার' হর্ষধ্বনি অর্জন করেছিলেন অ্যাসেমব্লিতে।

কিন্তু জজসাহেব ছাড়বার পাত্র নন। আগে বার্ধক্যে ছিল ধর্মচর্চা এখন রাজনীতি। জজসাহেব আজকালকার অনেক বৃদ্ধের মতো রাজনীতির অনেক 'ইনসাইড স্টোরি' জেনে ও আলোচনা করে আনন্দ পান। আর তা ছাড়া প্রবোধ সেন সম্প্রতি মিনিস্টার হলেও তাঁকে নেকনজরে দেখবার অধিকার তাঁর আছে, এটা তিনি বোধহয় বিশ্বেস করেন। কারণ যখন সেনমশাই কলকাতার হাইকোর্টে ওকালতি করেন তখন তিনি সেখানে বিরাজ করছেন। তাঁরই আদালতে প্রবোধ সেনের মক্কেল, এক ধনী মারোয়াড়ী হেরে যায়। একটা বিরাট ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দেবার কেস খুব সুদক্ষ-ভাবে ওকালতি করেছিলেন প্রবোধ সেন কিন্তু জজসাহেবের রায় বিপক্ষে গিয়েছিল। তা ছাড়া তাঁর জ্যাঠা স্যার এল-পি। গলাবন্ধ, বিলেতি আলেস্টারের মাঝখান থেকে ছুঁচলো মুখে তিনি যেন খেঁকিয়ে ওঠেন 'আপনার ক্রুশ্চভ্ বুলগানিন কমিউনিস্ট নন? ডোণ্ট থিঙ্ক এঁরা গাঙ্গুরামের দই খেতে এদেশে এসেছে। দে হ্যাভ ইভিল ডিজাইন্স। দুধকলা দিয়ে সাপ পুষলেও ঠিক সময়ে সে ছোবল দেবে।'

তার পর তাঁর কাশি ওঠে। সম্প্রতি তাঁর হাঁপানি বেড়েছে। ডাক্তার বলেছে, উত্তেজনার মধ্যে কখনো যাবেন না। জজসাহেব সেই ভেবে আরো নার্ভাস বোধ করেন। ভাবলেন হরঠাকুরের সঙ্গে আজ নাহয় থাক্। কি হবে? মারা তো যাবেনই আর দুবছরের মধ্যে। যে প্রচণ্ড শনির দশা তাতে হরঠাকুর কিছু করতে পারবে না মনে হচ্ছে। তার চেয়ে ফেস্ লাইফ বোল্ডলি? কিন্তু রাজনৈতিক কথাবার্তার একটা নেশা আছে।

এক আবর্ত থেকে তা আর-এক আবর্তে মানুষকে নিয়ে যায়। প্রবোধ সেনের সামনে ঝুঁকে পড়ে তাঁর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেন, 'দেশের এরকম অবস্থা তার কারণ ইট ইজ রান বাই মেন লাইক ইউ।'

প্রবোধবাবুর নাক লাল হয়। চেঁচিয়ে ওঠেন, 'যান যান, আজীবন ইংরেজের মোসায়েবি করেছেন আবার কথা বলছেন আপনারা! কি করেছেন দেশটাকে? শুধু জঞ্জালে পরিণত করেছেন। রবি ঠাকুর ঠিক বলেছিল।'

কি ঠিক বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ রাগের মুখে প্রবোধবাবু সে কথাটা হারিয়ে ফেলেন। নইলে তিনি তো সম্প্রতি বক্তৃতায় ভালো ভালো বাংলা ব্যবহার করবার জন্যে মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথের বই দেখেন না-যে এমন না।

'ওসব রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে বলতে আসবেন না, ওগুলো আপনাদের অ্যাসেমব্লিতে দাঁড়িয়ে বলবেন।...রবিবাবুর কথা বলছেন? তবে শুনুন। সেই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় খুব স্বদেশী গান লেখা চলছে। তার পর যেই ইংরেজ চোখ রাঙালে অমনি— ধূপ আপনার মিলাইতে চাহে গন্ধে।'

রোগা শরীরখানা বেঁকেচুরে ভাঙা কেশোগলায় গেয়ে ওঠেন জজসাহেব। তার পর খিঁচিয়ে খিঁচিয়ে হাসেন কতক্ষণ। আবার কাশি উঠে পড়ে। কাশির দমক থামলে পরম প্রশান্তিতে 'তুমি'তে নেমে আসেন। 'ত্যাখো, ওসব জেল খেটে চরকা কেটে দেশ চালানো যায় না। ত্যাখো না, চোর-ছ্যাঁচোড়ে দেশ ছেয়েছে আজকাল। আমরা ইংরেজের মোসায়েবি করেছি বলছ। কিন্তু সে যুগে ছিল মেন অফ ইন্টিগ্রিটি। এখন সে-সব কোথায়? আগেকার তুলনায় এখন সব ছেলেখেলা।'

গলা খাঁকার দিয়ে বলেন, 'তুমিই তো দেখেছ হে, ক্যালকাটা বারের কি ইণ্ডিপেণ্ডেন্স্। কি সব স্ট্যাচারের লোক! স্যার রাসবিহারী ঘোষ, স্যার এল.পি, সি.আর.দাস। এখন সব মুড়িমুড়কি।'

এমন সময় সামনের পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখা গেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকটি কাঁধে ফেলা শাল গায়ে জড়াতে জড়াতে বেড়িয়ে গেলেন। হ্যাংলা, উকিলটি মুখ বাড়িয়ে বললেন, 'আপনাকে স্যার ডাকছেন।'

জজসাহেব তড়াক করে উঠে এগিয়ে গেলেন। উকিলমশাই হাতজোড় করে বললেন, 'আপনাকে একটু পরে! মিনিস্টার সাহেবকে ডাকছেন।'

প্রবোধ সেন প্রবল ব্যঙ্গভরে কুঁকড়ে বসে থাকা জজসাহেবের দিকে একবার তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, 'নির্মল, চলো।'

নির্মলের দুচোখ জড়িয়ে এসেছিল। দুজন বয়স্ক লোকের চেঁচামেচিতে সে চট্‌কা কেটে যাওয়ায় সামনের অপ্রিয় অবস্থাটা এড়াবার জন্যে চোখের উপর হাত রেখে তন্দ্রার ভান করে ছিল। চোখ রগড়াতে রগড়াতে বললে, 'আমায় আর কেন? আপনিই যান।'

মেঝেতে হলদে কাপড়ের ফরাস। এককোণে স্তূপাকার ফুল, মালা। প্রবোধ সেন তাঁর ভাইপোকে নিয়ে ঢুকতেই সাধু সম্বোধন করলেন, 'আসুন, আসুন। এটি কে?'

'সুবোধের ছেলে!'

'ভালো, ভালো।...আমি দিনরাত মাকে বলি, কেন আমার কাছে এত লোক আসে? আমার কী আছে? আমি পয়সা জানি না, পলিটিক্স জানি না, আর এখন কতরকম বই বার হচ্ছে। এইসব ছোকরারা কত খবর রাখে। রোজ খবরের কতরকম আলোচনা। আমি তো এর কিছুই জানি না। সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষা হলে আমি তো লাস্ট হব। এত সব লোকজন আসে। তাদের কাছ থেকে শুনে যা শিখি। আর মাকে জিজ্ঞেস করি, কোনটা ঠিক মা? কমিউনিস্ট ঠিক না কংগ্রেস ঠিক? ওয়ার্কার্স ঠিক না ক্যাপিটালিস্ট ঠিক? আমেরিকা ঠিক না রাশিয়া ঠিক? যে দু-ভাই সম্পত্তি নিয়ে আদালতে লড়াই করছে তাদের কোন জন ঠিক? জীবনটা ঠিক না মৃত্যুটা ঠিক? দুঃখ ঠিক না আনন্দ ঠিক? আঁতুড়ঘরটা ঠিক না শ্মশানটা ঠিক? মা সব ঠিক করে দেন।'

'এই দেখুন কি অবস্থা!' হরঠাকুর তাঁর বুশশার্টের বোতামগুলো টপাটপ খুলে ফেলেন। অনুসন্ধিৎসু চোখে নির্মল সেদিকে তাকায়। রোগা নয় হরঠাকুর। কাঁচাপাকা লোমের ভেতর দিয়ে পাঁজরার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেন, 'একেবারে হাড় জিরজিরে হয়ে গেলাম। অথচ আমার শরীর কি রকম ছিল বিশ্বেস করবেন না। রোজ দশ-বারো মাইল হাঁটতাম।'

নির্মল হাই তোলে। সেদিকে চোখ পড়তেই হরঠাকুর বলে উঠলেন,

'আমি এসব কেন বলছি। এসব তো আমার কথা নয়। দেখেছেন আপনাদের কি পার্সোনালিটি! আমাকে বলাচ্ছে।' শূন্যে দৃষ্টি মেলে বললেন, 'আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী। যেমন বলাও তেমনি বলি।'

তার পর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হরঠাকুর নির্মলের দিকে চেয়ে বললেন, 'তুমি বাবা একটু বাইরে অপেক্ষা করো। আমি একজন একজন করে সারি।'

নির্মল আবার বাইরে অপেক্ষমান উদগ্রীব জনতার মধ্যে এসে দাঁড়ায়। এ ঘরখানা বেশ বড়ো। সতরঞ্চিতে লোকগুলো কুঁকড়ে মুকড়ে বসে আছে। একটা সরু বেঞ্চে তিন-চারটে মাঝবয়সী স্ত্রীলোক মাথা নিচু করে বসে আছে। তার মধ্যে একজন হঠাৎ বিলাপ করে ওঠেন, 'অমলারে বাঁচান্ যাইব না।' সামনে চকোলেট র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে এক বৃদ্ধ বিড়ি ফুঁকছিলেন। পোড়া বিড়িটা ঘরের এককোণে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, 'কিছু বলা যায় না। আমার ছেলেটা তো এলিয়ে গিয়েছিল। পেনিসিলিন ফুঁড়ে ফুঁড়ে গায়ে আর ছেঁদা করবার জায়গা ছিল না। তারপর নাড়ী ছেড়ে গেল। হরঠাকুর কোনো আশা দিলে না। খালি গঙ্গাজলের সঙ্গে একটা-দুটো গাঁদাফুলের পাঁপড়ি জিভে ঠেকাতে দিলে। তাতেই হল। কিচ্ছু বলা যায় না।'

নির্মল বিহ্বল বোধ করে হরঠাকুরের মক্কেলদের বৈচিত্র্যে। সতরঞ্চির এককোণে একদল কলেজের মেয়ের মধ্যে একটা অত্যন্ত চেনাচেনা মুখ আবিষ্কার করে' চমকিয়ে ওঠে। কোথায় যেন মুখখানা দেখেছে। তারপর খেয়াল হয় বাংলা কাগজে একখানি এককলাম ছবির নীচে হেডলাইন, 'আমেরিকা-ফেরত তরুণীর সন্ন্যাস গ্রহণ। বছর তিরিশেকের মহিলা। চুলে আধুনিক মেমসাহেবদের মতো পুরুষালী ছাঁট। তার সঙ্গে গরদের চাদর। বোধহয় সিস্টার নিবেদিতার অনুকরণে গলায় রুদ্রাক্ষ। রোগা, ফ্যাকাশে ফর্সা। চোখ দুটো জলজলে। মেয়েদের তদারক করছেন। কয়েকজন কমবয়সী মেয়েকে বলছেন, 'এবারে ঘর থেকে লোক বেরোলেই তোমাদের টার্ন।'

নির্মল লক্ষ করে এতগুলো লোক যারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা এত রাত্তির ধরে সতরঞ্চিতে বেঞ্চে বাইরে বারান্দায় রাস্তায় সময় কাটাচ্ছে তারা বেশির

আগেই উদ্‌বিগ্ন। তাদের মুখে যেন অস্পষ্ট এক ভয়ের ছাপ। কারো মৃত্যুভয়, কারো চাকরির অনিশ্চয়তার ভয়, কারো জেলে যাবার ভয়, কারো পারিবারিক অশান্তির ভয়। বিশেষ করে কমবয়সী বিবাহিত মহিলাদের, কারো ন্যায়ের ভয়, কারো অন্যায়ের ভয়— সকলেই কোনো-না-কোনো ভয়ে তাড়িত। জ্যাঠামশাইয়ের কী ভয়? যদি 'হোম' শেষ পর্যন্ত না পাওয়া যায়? *অথবা ডায়াবেটিস্ চাড়া দিয়ে ওঠে? কিংবা অনর্গল বক্তৃতা দিতে দিতে* তাঁর কি ভয় তাঁর ভাইয়ের মতো তাঁরও হার্ট অ্যাটাক্ হবে? জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে এসব ব্যাপারে সবসময়ই তার একটা দূরত্ব থাকে। গাড়িতে আসবার সময় নির্মলকে বলেছিলেন, 'আমি ওসব অকাল্ট পাওয়ারে বিশ্বেস করি না নির্মল। নিজেদের ওপর যাদের বিশ্বেস নেই তারাই দৌড়য় সাধু-ফকিরদের কাছে। তবে হরঠাকুর শুনেছি ইন্টারেস্টিং ম্যান। বরানগরে যখন এসেছি একবার দেখা করে যাই।' বুলবুলিকেও এর চেয়ে বেশি কিছু বলেন নি।

নির্মল আবার সেই ছোটো ঘরখানায় গিয়ে বসলে। নির্মলকে দেখে তড়াক করে উঠে জজসাহেব বলেন, 'সর্বত্র করাপশান। সমস্ত দেশটা করাপশানে ছেয়ে গেল। করাপশান ঠেকানোর জন্যে কমিটি হল। সেখানেও করাপশান। তখন সে কমিটির কাজ তদারক করবার জন্যে আর-একটা কমিটি হল। দেশটা তো এইভাবে চলেছে। কারা চালাচ্ছে?'

অনিদ্রায় চোখ দুটো লাল। টাকের পাশ থেকে কয়েকটা চুল খাড়া হয়ে আছে! চেঁচিয়ে ওঠেন, 'কারা চালাচ্ছে? অল্ টম ডিক্ হ্যারি। কোথায় সেই আদর্শ, দেশাত্মবোধ। সেই বিদ্যেসাগর বিবেকানন্দের বাংলাদেশ কোথায়? এখন তো শর্ষের মধ্যে ভূত। এই তোমার জ্যাঠা…'

নির্মল বিরক্ত বোধ করে। বিখ্যাত লোকদের আত্মীয় হবার দুর্ভাগ্য গত দু-তিন বছর হল চেপে ধরেছে। যেমন তাকে দেখামাত্র সরকারবিরোধী কথাবার্তা উঠে পড়ে বরানগরে স্নানের ঘাটে। তারপর যখন সে তার বাবার মতো সরকারবিরোধী সমালোচনায় যোগ দেয় তখন তাকে আরো ভুল বোঝা হয়। ভাবা হয় বন্ধুত্বরক্ষার জন্যেই সে এসব বলছে। আর কটু কথায় যখন সরকারকে দাঁড় করানো যায় না কিংবা কাত্ করা যায় না তখন নির্মল সচরাচর এসব ক্ষেত্রে চুপ করে থাকতেই ভালোবাসে। তাতে মাস্টারী জগতে সে 'স্নব' আখ্যা পেয়েছে। তার অধ্যাপনা কোনো কোনো

তরুণ সহকর্মীর কাছে প্রায় প্রহেলিকা। ও শখ ক'বছর পরেই কেটে যাবে, কেউ কেউ বলেন। তাদের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেণ্ট সদানন্দবাবুই মজা করেন। নির্মলকে কিভাবে দেখবেন বুঝতে পারেন না। একদিন সস্নেহে বলেছিলেন, 'এ লাইনে আর ক'দিন থাকবেন ভাবছেন? যদি ছাড়তে হয় আগে ছাড়াই ভালো।'

তাই জ্যাঠার প্রসঙ্গে নির্মল স্বভাবতই সিটিয়ে যায়। বলে, 'জ্যাঠা-মশাইয়ের কথা ওঁর সঙ্গেই বলবেন।'

'আহা চটো কেন!' বিদ্রূপে অনিদ্রায় ও অম্লের আধিক্যে ভদ্রলোকের চোখ জ্বলজ্বল করে। 'আহা রাগো কেন। এসব ইন্‌সাইড খবর কে আর দেবে বলো। আমরা তো দুদিন পরই চল্‌বে। তখন তোমাদের সবকটা কাগজ মিলে তোমার জেটাকে প্যাট্রিয়ট করে তুলবে।'

ভদ্রলোক পেনাল কোডের সাতচল্লিশ না দুশো তেতাল্লিশ না ঐরকম কোন একটা সেকশান উল্লেখ করে কতক্ষণ কি বললেন নির্মলের মাথায় ঢুকল না। শুধু বক্তব্যের সারাংশ তাঁর বোধগম্য হল, 'বুঝেছো, চালাকি দিয়ে জজকে ঠকানো যায় না ইফ হি ইজ আপরাইট। তোমার জেটা ভেবেছিল রঘুবীর সিংয়ের গোটা ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়াটা চাপা দিতে পারবে। এখনো আইন জানে এরকম লোক দেশে আছে। ইউ কাণ্ট ব্লাফ এভরিবডি।'

পর্দা সরিয়ে প্রফুল্লমুখে প্রবোধচন্দ্র ঢুকলেন। নির্মলকে বললেন, 'যাও, দু-চার মিনিটের জন্যে ডাকছেন। বেশি দেরি কোরো না। ড্রাইভার বেচারা খুব টায়ার্ড। সেই সকাল থেকে গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছে।'

'আমার আবার যেয়ে কি দরকার।' নির্মল চারপাশের অপেক্ষমান উদ্‌গ্রীব জনতার কথা ভেবে অপ্রস্তুত বোধ করে।

'না না, যাও!' জ্যাঠামশাই আবার ধমকান।

'শর্ষের মধ্যে ভূত,' জজসাহেব বিড় বিড় করেন।

অত্যন্ত আত্মসচেতনভাবে ক্যাবলার মতো হাসতে হাসতে নির্মল হরঠাকুরের কুঠরীতে ঢুকল।

॥ নয় ॥

নির্মলের কোনো প্রশ্ন নেই। সে হরঠাকুরের খদ্দের নয়। একবার চোদ্দ-পনেরো বছর বয়সে বোসপাড়া লেনে হারুমামা— যিনি দাবি করেন গান্ধীজীর রাশিচক্র দেখে মৃত্যুর একবছর আগে বলে দিয়েছিলেন আততায়ীর হাতে মৃত্যু অবধারিত— তিনি তার হাত দেখে যখন বলেছিলেন মহাপুরুষ হবার লক্ষণ আছে এ হাতে তখনো সে উৎফুল্ল হয় নি। বরং তার বাপের মতো সমস্ত ব্যাপারটা ফুঁকো মনে হয়েছিল। তারপর কলেজে ছাত্রাবস্থায় এবং পরে মাস্টার হয়ে জ্যোতিষের দুর্গ্রহ তাকে বহুবার তাড়িত করেছে। অনেকবার সে হাতও বাড়িয়েছে হাসিমুখে আর শুনেছে 'পঁয়ত্রিশ বছর বয়স থেকে আপনার লাইফটা পাল্টে যাবে,' কিংবা 'আগামী কার্তিক পর্যন্ত মঙ্গলটা বিশেষ সুবিধাজনক নয়' বা বোধহয় তাকে উৎসাহিত করবার জন্যে 'প্রভূত স্ত্রীধন লাভ ঘটতে পারে যদি' কিংবা পিতার স্বাস্থ্যের অবনতি···পিতা নেই?' তাদের কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক শম্ভুবাবু তো বলেই দিয়েছেন কান কেটে ফেলবেন যদি নির্মল দু-বছরের মধ্যে কলেজ ছেড়ে অন্য কোনো বড়ো চাকরিতে চলে না যায়। কিন্তু যে জন্যে নির্মল বিস্মিত বোধ করছিল তা হল এই ঠাণ্ডায় এত রাত্তিরে এতগুলো মানুষের সমাবেশ। এরা কি সবাই মানে হরঠাকুর সত্যিই ভবিষ্যৎবক্তা অথবা যেমন লোকে কঠিন রোগে পড়লে চৌষট্টি টাকার ডাক্তার ডাকে ও একই সঙ্গে মাদুলি নেয়, যদি যে-কোনো ভাবে আশু বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়, কায়দা করে পাশ কাটানো যায়, অন্যকে সার্থকভাবে ল্যাং মারা যায়, যে-কোনো অসহায় অবস্থায় নিজেকে ভোলানো যায়— এই লোকগুলোর এখানে আসার পেছনে হয়তো এরকম কোনো চিন্তা আছে। নিজের লাভক্ষতির তাগিদেই এখানে ভিড়।

নির্মল ঘরে ঢোকামাত্রই হরঠাকুর উদাত্তকণ্ঠে আহ্বান জানান, 'আয় আয়।' নির্মল হলদে ফরাসের ওপর ধুপ করে বসে পড়ে। এতক্ষণ ভাঁজ

করা কাঠের শীর্ণ চেয়ার যেন তার পিঠে ফুটছিল। এখন অতিথিদের জন্য একপাশে রাখা লম্বা তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে নির্মল আরাম পায়।

"কি করিস তুই? মাস্টারী? থুঃ থুঃ!'

হরঠাকুর থুথু ছেটাবার ভঙ্গী করলেন। তারপর নির্মলের চোখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, 'ঈশ্বর তোকে টেনে তুলবে অনেক ওপরে। তুই যতই জড়ের মতো পড়ে থাক তোর মধ্যে আছে দাহিকা শক্তি। ঈশ্বর চান না তুই এরকম গড়াবি, এরকম বছরের পর বছর ধরে জড়ের মতো কাটাবি। এটা কি একটা জীবন? এই মানসিক জাড্য তোর জন্যে নয়। তুই কেন তোর এই সুন্দর জীবনে বৈরাগী হবি? ধনধান্যেভরা এই বসুন্ধরা, এখানে এত মানুষের স্থান হচ্ছে, তোরও হবে। তুই ভাবিস না তুই একটা অদ্ভুত কিছু। এটাই মানুষের দুর্বলতা। সে ভাবে সে একটা অদ্ভুত অসাধারণ। অন্যের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। একটা একেবারে বিচ্ছিন্ন অপূর্ব জগৎ।'

নিস্পন্দ নির্মলের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে হরঠাকুর কি খোঁজেন, যেন এমন কোনো সূত্র আবিষ্কার করতে চান যা শ্রোতার হৃদয়ের বন্ধ দরজা এক দম্‌কায় খুলে দেবে। 'আমার এখানে একটা মেয়ে আসে, লীলা না বীণা ঐ যে কাগজে লিখেছে না আমেরিকা-ফেরত বিদুষী মহিলার ভক্তি? তা দ্যাখো, শিক্ষিত হলে কি হয়, শিক্ষিত হলে আধার আরো পরিষ্কার হল। একটা মাটির ভাঁড় থেকে স্টেনলেস্ স্টীলের কাপ ভালো না?'

নির্মল স্তব্ধভাবে হরঠাকুরের কথামৃত পান করতে থাকে, আর মনের ভেতরটা একটু ছলছল করে। কোনো অলৌকিক সত্য নয়, নেহাত একটা বুঝদার লোকের কথা হিসেবেও কি এই কথাগুলো ফ্যালনা? সেও কি বাস্তবিক গড়াচ্ছে না গত দশটা বছর ধরে? গড়ানো ছাড়া আর কি? একশোটা ছেলের সামনে দাঁড়িয়ে মাসিক আড়াইশো টাকার বদলে কীট্‌স্-সৌন্দর্যতত্ত্ব বা উইলীয়াম্-সেক্সপীয়রের লাইনের পর লাইন আক্ষরিক অনুবাদ যা এখন চোখবন্ধ করে মুখস্থ বলা যায়, এমনকি তার এক মাস্টারমশাই এক-একটা কথার ওপর যেরকম ঝোঁক দিতেন নিজের অজ্ঞাতসারে ঠিক সেই-ভাবে ঝোঁক দেবে, ঠিক তাঁর মতো কতগুলো কথা উচ্চারণ করে যাবে যথা ইন দ্য ফিট্‌নেস অফ থিংস্ কিংবা ইন্টিগ্রেশান অফ দ্য ডিস্‌ইন্টিগ্রেটেড

ইউনিভার্স বা ইমোটিভ রিয়ালিটি— এগুলো তো এখন কথা ছাড়া আর-কিছু নয়, কতগুলো কথার রঙিন ফানুস যেগুলো নিয়ে বাচ্চাদের মতো লোফালুফি করে গত আট-দশটা বছর কাটিয়ে দিল্।

আট-দশটা বছর আগে কিংবা তারও আগে সাহিত্যের ছাত্রাবস্থায় তার সত্যিই মনে হয়েছিল সে এক নতুন কথামৃত পান করছে। কিন্তু কথার পেছনে অর্থ তো শব্দের পেছনে প্রকাশের ইচ্ছে। সে অর্থ, সে ইচ্ছে বছর গড়াতে গড়াতে ঘষে গেছে। এখন মাঝেমাঝে বিস্ময়ে বইয়ের শেল্ফগুলোর দিকে নির্মল তাকিয়ে থাকে। সেই অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স, কোলরীজের বায়োগ্রাফিয়া লীটারেরিয়া, টি. এস. এলিয়টের প্রবন্ধের বই। আই. এ. রীচার্ডস, গীলবার্ট মারে, এফ. আর. লিভিস—সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে দশ বছর আগে কলেজে ঢুকে এ নামগুলো মন্ত্রের মতো জপ করত। কিন্তু এখন আর নামগুলোর কোনো স্বাতন্ত্র্য নেই, এগুলো এখন সব মুখস্থ করা উৎসাহ, মুখস্থ করা উদ্দীপনা যে উৎসাহ উদ্দীপনায় হাত-পা নাড়িয়ে গলা চিরে সে চীৎকার করে যাচ্ছে স্বভাবতই নির্বিকার এক বিরাট ক্লাসের সামনে বছরের পর বছর। এটা যদি গড়ানো না হয় তাহলে কাকে গডানো বলা হবে?

হরঠাকুর আর একটা সিগারেট ধরিয়ে ফোঁ ফোঁ করে কয়েকবার টান দেন। আবার তাঁর তীক্ষ্ণ রাতজাগা লালচে চোখদুটো নির্মলের দিকে চেয়ে কোন হারান মানিক খুঁজতে থাকেন। তার পর প্রায় চেঁচিয়ে ওঠেন, 'নেতি নেতি থেকেই শুরু। এ তো সবাই জানে। এ ব্যাপারে তুমি একটা অনন্যসাধারণ কিছু না। মানুষমাত্রেই তার বিচারশক্তি প্রয়োগ করে, যদি মানুষ হয় তাহলে সে না বলে। না বলতে শেখা খুব একটা বড়ো জিনিস। তুই তা বলতে জানিস তা আমি জানি। সেইজন্যে এমন চারপাশ থেকে জোড়ালাথি খেয়ে মাস্টারীর চৌকাঠ আঁকড়ে পড়ে আছিস। সেটা আমি জানি না?'

নির্মল একটু বোকা বোকা হাসে। সে চেষ্টা করে এই সব 'বাবা'দের কথায় কান না দিয়ে মনের বিশ্লেষণ প্রবৃত্তি সজাগ রাখতে। নেতি নেতি সম্পর্কে হরঠাকুর যা বললেন তা তো রামকৃষ্ণের কথামৃত থেকে একেবারে আক্ষরিক চুরি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এ রাস্তায় নির্মলের চিন্তা অগ্রসর

হয় না। এ কথাটাও একবার তার খেয়াল হয়েছিল যে আসলে জ্যেঠা-মশাইয়ের এখানে আসা তাকে উপলক্ষ করেই। তাঁর 'হোম' পোর্টফোলিওর প্রয়োজনীয়তাটাও তিনি জানিয়ে থাকতে পারেন। কিন্তু সে খেয়ালের বিদ্যুৎ একবার ঝিলিক মেরেই মিলিয়ে যায়। নির্মল যা ভাবে নি তা করে। সে কৌতূহলী হয়ে শুনতে থাকে।

'আমি জানি তোর কোনো প্রশ্ন নেই। প্রশ্ন কাদের থাকে? যারা ক্লীব, নপুংসক, কীট। তারা দিনরাত আমার পাশে ভন ভন করে। আমি তো মাকে অহর্নিশি ডাকছি, পাঠাও পাঠাও, বেছে বেছে এই সব পোকামাকড়-গুলোকে আমার কাছে পাঠাও কেন মা? যাদের নিজেদের কোনো চিন্তাশক্তি নেই, আত্মরতির কাদায় যারা গড়াচ্ছে। যাদের ভগবান নেই, দেশ নেই, সমাজ নেই, আর-পাঁচটা লোক নেই। খালি আমি আর আমার স্ত্রীটি আর আমার সন্তানটি। এ দিয়ে কি মহৎ কিছু গড়া যায়? কোনোদিন গড়া হয়েছে? তুই প্রশ্ন করিস নি তাই আপনা থেকেই আমি তোর প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি। নেতি নেতি করে কাটিয়েছিস। বেশ করেছিস। বিশ্বের লোক তোকে নিন্দে করুক, হরঠাকুর করবে না। হরঠাকুর বলবে তুই ঠিক করেছিস।'

নিজের অজ্ঞান্তে নির্মলের মন বর্ষার পুকুরের মতো টলমল করে। লোকটা অলৌকিক কথা কিছু বলছে না। কিন্তু সে ঠিক তার মনের কথা বলছে—এরকম একটা চিন্তায় এবং বোধহয় নিজের প্রতি মমতায় তাকে ভরপুর লাগে। একবার সে জোর করে চেষ্টা করে এই মন্ত্রমুগ্ধ জগৎ থেকে সরে আসে। পর্দার ওপারে যে উদ্বিগ্ন বিনিদ্র মুখের সারি অপেক্ষমান তাদের প্রতি সহানুভূতি এই ধরনের দীর্ঘ আলাপের ছেদ পড়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করে। কিন্তু আবার সেই একটার পর একটা সিগারেট টেনে-চলা হ্যাংলা কাঁধময়লা বুশশার্টপরা লোকটার কথার দিকে তার মন চলে যায়।

'কদ্দিন নিজের মুখ নিজের আয়নায় দেখবি?' হরঠাকুরের কর্কশ গলায় নির্মল চমকে ওঠে। তারপর গলা নামিয়ে হরঠাকুর বলেন, 'সারা জীবন তো নেতি নেতি করা যায় না, এক জায়গায় এসে—তোরা আজকাল কি বলিস না— সীনথিসিস্?— সেই সীনথিসিস্ হয়। তখন মনে হয় ঈশ্বরের এই আশ্চর্য সৃষ্টি, এই চন্দ্রসূর্যনক্ষত্রখচিত আকাশের নীচে এতরকম উদ্ভিদ, এত প্রাণী, এত ধরনের জীবনযাত্রা, এতরকম মানুষ—পাপী তাপী পুণ্যবান,

মাতাল চোয়াড়ে আবার নির্জন অপাপবিদ্ধ পুরুষ, এত নীচতা হীনতা, আবার এত আনন্দ, এর মাঝখানে আমার স্থান করে নিতে হবে। শুধু বৈরাগী হয়ে ঘুরলে চলবে না। তুই ভগবান মানিস না তো?— সে তোকে এক ঝলকে দেখেই বুঝে নিয়েছি। কিন্তু হরঠাকুর তোকে বলবে না তুই ভগবান মান, তুই এটা কর সেটা কর, মন্তর নে, দশ-হাজার নাম জপ কর। এসব কিছু বলবে না সে। সেরকম মিঞা হলে (এখানে হরঠাকুরের চোখদুটোর ঔজ্জ্বল্য অসম্ভব বেড়ে যায়) হরঠাকুরের কাছে ইউনিভার্সিটির ডি. এস্‌সিরা আসত না। তারা বলে, সায়ান্স অনেক পড়েছি, এখন তোমার কথা শুনি। সেরকম কিছুই বলবে না হরঠাকুর।'

আবার সিগারেট ধরালেন। টং করে দেয়ালঘড়িতে একটা বাজল। পর্দার ওপাশ থেকে একটা চাপা বিলাপ ভেসে আসে। 'আমার মাইয়াটারে আর বাঁচান্ যাইল না।'

'ঐ শোন্ কার মাইয়ারে আমার বাঁচাতে হবে। আমি কেন বাঁচাব? আমি কেন বাঁচাব? আমি বাঁচানোর কে? যিনি বাঁচাবার তিনি বাঁচাবেন। আমি তো মাকে দিনরাত বলছি এইসব অপোগণ্ডদের হাত থেকে আমায় মুক্তি দাও। এরা তো আমাকে ধর্মের পথে থাকতে দেয় না। এরা আমায় ধর্মভ্রষ্ট করে। তুমি আমার সামনে বরং নাস্তিক আনো যার মেরুদণ্ড আছে, যে আমাকে মানে না, আমাকে মনে মনে ব্যঙ্গ করে।'

হরঠাকুর তাঁর জলজলে চোখ মেলে নির্মলের দিকে চেয়ে থাকেন। আর মনে হয় তিনি এতক্ষণ যা খুঁজছিলেন তা পেয়েছেন। সেই যোগসূত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, চাবিকাঠি পাওয়া গেছে যা বন্ধ দরজা দমকায় খুলে দেবে। হরঠাকুর গলা নামিয়ে প্রায় ফিসফিস করে বললেন, 'আমি তোকে ভগবান মানতে বলব না। সবই তো মা জগদম্বার খেলা। আমি খালি বলব, নেতি নেতি করার দিন গিয়েছে তোর। তোর সামনে এখন নতুন পৃথিবী, নতুন জীবন, নতুন ভবিষ্যৎ।...এগিয়ে যা, আরো এগিয়ে যা। নেতির পরে যে নতুন জগৎ সেখানে তুই পা ফেল।'

সিগারেটটা ছুঁড়ে দিয়ে হরঠাকুর চোখ বুঁজলেন। খুব শান্ত চোখে নির্মলের দিকে চেয়ে বললেন, 'এবারে তুই যেতে পারিস।' রাত্তির দেড়টার সময় নির্মল ছাড়া পেল। তার মাথা ঝিমঝিম করছিল অবসাদে কিন্তু সঙ্গে-

সঙ্গে হরঠাকুরের কথাগুলো মিষ্টি হাওয়ার মতো তার মনটা জুড়িয়ে দিচ্ছিল। 'নতুন ভবিষ্যৎ, নতুন জীবন, নতুন পৃথিবী'— কথাগুলো খুব সুন্দর। সকলেরই ভালো লাগে। প্রেমিক বলে, রাজনৈতিক বক্তা বলে, ধর্মপ্রচারক বলে। প্রায় সময়ই এ কথাগুলোর কোনো মানে থাকে না, প্রায় এক মামুলি গতের মতো বলা হয়। কিন্তু হরঠাকুরের সেদিনের কথা (যেরকম ধরনের কথা তিনি নিত্য বহুলোককে হয়তো বলেন) নির্মলের কাছে ঠিক মামুলি লাগছিল না, কিংবা চেষ্টা করেও মামুলি লাগাতে পারছিল না।

বেরিয়ে আসবার মুহূর্তে জজসাহেব নির্মলকে প্রায় ধাক্কিয়েই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। আবার অপেক্ষমান লোকজনের দিক থেকে উসখুস, দীর্ঘশ্বাস, নড়েচড়ে বসার আওয়াজ, গলা খাঁকারি, একসঙ্গে ভেসে আসে। কেউ কেউ রিসেপশান রুমের দরজার সামনে এমনভাবে দাঁড়িয়ে ভিড় করে এবং বাইরের বারান্দায় এবং রাস্তার লোক সেদিক থেকে ভেতরে ঠেলা দেয় যে প্রবোধ সেন পেটে একটা কনুইয়ের গুঁতো খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন। সেই চাদর মুড়ি দেওয়া উকিলবাবুটি বোধ হয় মন্ত্রীকে চিনতে পেরে এগিয়ে এসে বললেন, 'আপনি স্যার পাশের ঘর দিয়ে বেরিয়ে যান। ওদিকে খিড়কির দরজা।'

নির্মল পাশের ঘরে পা দিয়েই চমকে যায়। সামনের দেয়ালের আধখানা জুড়ে একটা ছবি। হরঠাকুর জলচৌকিতে বসে আছেন। মুখে বিমল হাসি। সেই প্রখর রাতজাগা লালচে চোখের বদলে শান্ত স্থির চাহনি। যদিও তাঁর কোনো কোনো ভক্ত মনে করেন যে তাঁর মতো চোখ পৃথিবীতে খুব কম লোকের আছে কিন্তু নির্মলের কাছে তা বেশ ছোটোই লেগেছিল। কিন্তু সে চমকায় আর এক কাণ্ড দেখে। একজন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হরঠাকুরের পায়ের কাছে। তাঁর পায়ে একখানা হাত রেখে বসে আছেন।

প্রবোধ সেন লক্ষ করেন তাঁর ভাইপোর মুখের ভাবান্তর। তাঁর নিজের মুখ প্রশান্ত অবিচলিত। গাড়িতে পাশাপাশি জ্যাঠা-ভাইপো। বরানগরের অন্ধকার অলিগলি অকস্মাৎ আলোকিত ক'রে, কখনও মন্দিরের চুড়ো, খাটা পায়খানা, ছ্যাৎলাপড়া বিরাট বাড়ির পলকাটা বারান্দার থাম, কখনও বটগাছের গুঁড়ি বা হঠাৎ ঘুমভাঙা কুকুরের গায়ে হেডলাইট ফেলতে ফেলতে গাড়ি এগোতে থাকে।

'একেবারে হামবাগ নয়, কি বলিস ?' প্রবোধ সেন বলেন।

এমন নিচু গলায় নির্মল 'না' বলে যে গাড়ির শব্দে প্রায় শোনা যায় না। তারপর একটু সন্দিগ্ধভাব ফুটে ওঠে তার মুখে। একবার ভাবে জিজ্ঞেস করবে কি না তার সম্পর্কে জ্যাঠামশাই কিছু বলেছিলেন কি না আগে হরঠাকুরের কাছে। কিন্তু পর মুহূর্তেই মনে হয় যে ভাবেই বলুক না কেন, হরঠাকুরের কথা নিজের। জ্যাঠামশাইকে সে জানে, অ্যাসেমব্লিতে দাঁড়িয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে বিরোধীদলের সমালোচনা খণ্ডন করতে পারেন কিন্তু এরকম ঘরোয়াভাবে ঠিক মনের কথা ধরতে কিংবা বলতে পারবেন না।

'লোকটা অনেক লোকজনের সঙ্গে মিশেছে, অনেক কথা জানে। একটু মনস্তত্ত্ব চর্চা করলে ওরকম খানিকটা বলা যায়। এমন কিছু এক্সট্রর্ডিনারি পাওয়ার নেই,' প্রবোধ সেন বললেন।

'তুমি গেছিলে কেন জ্যাঠামণি ?'

'আমি ? এমনি ! লোকটাকে দেখলাম। শুনে আসছি অনেক দিন থেকে। আমি তোমার বাবার মতো ডগ্‌ম্যাটিক নই। আমি পাবলিক ম্যান। পিপ্‌লের সঙ্গে থাকতে হয়। পিপ্‌লেব সুখদুঃখ বুঝতে হয়। লোকটাকে কাছ থেকে দেখলে তো। এই শীতের রাতেও এতগুলো লোক দাঁড়িয়ে আছে দেখা করবার জন্যে। হাউ ডু ইউ এক্সপ্লেন্ ? লোকটাকে তুমি আমি হামবাগ বলতে পারি। কিন্তু তাতে কি এসে যাচ্ছে ! ভিড় যেমন হচ্ছিল তেমনি হবে। আর তাছাড়া সব ব্যাপারই যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। তা যদি হত তাহলে আমি মিনিস্টার হতাম না, সুবোধও এমন রট্ করত না।'

হেডলাইটের আলোয় কতগুলো কুকুর ঘুমভেঙে একসঙ্গে ভৌ ভৌ করতে করতে গাড়ির পেছনে তেড়ে আসে। তাদের আওয়াজ মিলিয়ে যাবার পর প্রবোধবাবু বলেন, 'পলিটিক্সের পাঠ তো সুবোধের কাছেই। তখনকার দিনের আই. এম. এস.-এর চাকরিটা ছেড়ে দিলে। সুবোধের চিরকাল এই ডকট্রিনাল্ অ্যাপ্রোচ্…যেমন আমার ছোটো পুত্রের।'

প্রবোধচন্দ্র শেষ কথাটা আস্তে বলেন। আর সমস্ত ব্যাপারেই প্রবোধ-চন্দ্র জয়ী কিন্তু একটা ব্যাপারে হেরে গেছেন। তাঁর ছোটো পুত্র গত দশবছর ভারতবর্ষে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে স্রেফ পাগলামি করছে। এ আজাদী

তার কাছে এখনও ঝুটা। সে সম্প্রতি কোন গাঁয়ে গিয়েছে সংখ্যাতত্ত্ব সংগ্রহের ছুতো করে।

প্রবোধচন্দ্র হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'দেশপ্রেম মানেই আত্মত্যাগ? দেশ-প্রেম মানেই আত্মত্যাগ না। এটা হয়তো ইংরেজ আমলে চলত। এখন দেশপ্রেম মানে কে কত কাজ করতে পারে। দেশপ্রেম মানে এফিশিয়েন্সি। বুড়োকে দেখো (প্রবোধবাবু তাঁর সহকর্মীদের কারোর মতো বাংলাদেশের মুখ্যমন্ত্রীকে বুড়ো কিংবা কর্তা বলেন ঘরোয়া আলাপে)। একেবারে কাছ থেকে দেখেছি। মুসৌরীতে এক বাড়িতে ছিলাম। উনি একদিকে আমি একদিকে। ভোর চারটেতে দেখতাম লোকটা অন্ধকারে ঘুট্ ঘুট্ করে বেড়াচ্ছে। আর একটু ফর্সা হলে কফির পেয়ালায় চামচ নাড়তে নাড়তে হাঁকতেন, কি হে প্রবোধ, ঘুম ভাঙল? একেবারে যন্ত্রের মতো লোকটা। আমরা যদি নিজেদের দেশের কাজে লাগাতে চাই তাহলে আমাদের নিজেদের এরকম এক-একটা যন্ত্র হওয়া দরকার। কি ভবেন ঠিক না?'

ভবেন গাঙ্গুলি এতক্ষণ সামনের সীটে মুহ্যমান হয়ে বসেছিল। জলের চেয়ে রক্তের ঘনত্ব বেশী, ইংরেজী এই প্রবচনে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছিল নিজেকে। নইলে হরঠাকুরের ওখানে যাওয়ার সমস্ত ব্যাপারটা সেই সব ঠিক করলে আর সেখানে যাওয়ার পর থেকে কর্তা তাকে একেবারে ভুলে গেলেন। তাঁর ভাইপো যে যথেষ্ট সন্দেহজনক রাজনৈতিক মনোভাব পোষণ করে তাকে নিয়েই তিনি এতক্ষণ মত্ত। ভবেনের অস্তিত্ব একেবারে ভুলেই গেছেন। তাছাড়া ভবেন লক্ষ করেছে গাড়িতে বেশীর ভাগ সময়ই প্রবোধ-বাবু এত নিচু গলায় আলাপ চালিয়েছেন যে সে চেষ্টা করেও একটা-আধটা ছাড়া কিছু ধরতে পারে নি।

'কি হে, তুমি যে একেবারে গুম মেরে আছো,' প্রবোধবাবু ভবেনের প্রতি সদয় হলেন।

'আমরা আর কি জানি স্যর।'

'তুমি সব জানো ভবেন। তবে তুমি একটু বেশী চাও। তুমি আর নির্মল একেবারে বিপরীত। তুমি চেয়ে গোলমাল বাধাও আর নির্মল না চেয়ে চেয়ে গেঁজে গেল।'

বাড়ির কাছে গাড়ি এসে গেল। ঘুমচোখে রঘু দৌড়ে এসে গেট খুলে

দেয়। লনের সবুজে গাড়ির আলো পড়ে আরো চকচক করে। কিন্তু বারান্দার আলো খারাপ হওয়ায় বাড়ি অন্ধকার। ফুরফুর করে সারা বাগানে মাঝ রাত্তিরের হাওয়া দিচ্ছে। গাড়ি থেকে নেমে নির্মলের দিকে ঘুরে হঠাৎ তীক্ষ্ণ গলায় প্রবোধ সেন বলেন, 'আই হেট্ পভার্টি। নান্টুকে (জ্যাঠা-মশাইয়ের বড়ো ছেলে) বিলেত পাঠালাম সেইজন্যে। অবশ্য হি ইজ ব্রিলিয়েণ্ট। কিন্তু দেশে ব্রিলিয়েন্সের জায়গা কোথায়? আমি এসব ডেমোক্র্যাসিতে বিশ্বেস করি না যেখানে ইউ রিডিউস এভরিবডি টু রামা শ্যামা। শেষ পর্যন্ত আই হ্যাড টু রাইট টু ইন্দিরা (বোধহয় ইন্দিরা গান্ধী, নির্মল আঁচ করে)— ব্যালিওল কলেজে নান্টুর সীট পাওয়ার জন্যে। আই ডিড ইট ইন কম্প্লিট ফেথ ছাট আই শ্যাল্ সী হিম থ্রু। সুবোধ যাই বলুক। একটাই জাত আছে দুনিয়ায়— ইংরেজ। আজীবন সুবোধ ইংরেজের দোষই দেখল। তারা আমাদের দেশে এটা করে নি সেটা করে নি। কিন্তু ডেমোক্র্যাসির এডিফিস্টা ইংরেজরাই তৈরি করে দিলে। সুবোধ বলবে ইংরেজ না হলেও আমরা আজকের অবস্থায় আসতে পারতাম। ঘণ্টা পারতাম, ঘণ্টা! (প্রবোধ সেন তাঁর দুটো মোটা বুড়ো আঙুল তাঁর ভাইপোর মুখের সামনে তুলে ধরেন)। ইংরেজ না এলে আমরা অযোধ্যার নবাবের আণ্ডারে থাকতাম কিংবা বাহাদুর শার রাজত্বে। কোথায় থাকত হে তোমাদের রামমোহন রায়, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ? তোমাদের কালচার, সাহিত্য, তোমাদের কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টি?'

বারান্দায় উঠেও তাঁর কথার তোড় থামে না! 'সুবোধ চিরকাল ভুল করেছে। সে যুগের ঐ চাকরি, এক কথায় ছেড়ে দিলে। শীয়ার ম্যাড্নেস্। আরে সুভাস বোস ছাড়লে বলে তুমি ছাড়বে? তখন আমি অপ্রিয় হয়েছি কথাটা পেড়ে। এখন পস্তাচ্ছে।'

'বাবা ঠিক পস্তাচ্ছেন না। ওঁর যেরকম জীবন ভালো লাগে বেছে নিয়েছেন,' নির্মল মৃদু দৃঢ় গলায় বললে।

'পভার্টি মানেই পস্তানো। তুমি মানো না?' প্রবোধবাবুর গলা একটু কর্কশ শোনায়। তাঁর বদ্ধমূল ধারণা যে সুবোধের অত্যন্ত অবাস্তব আইডিয়ালিজমের ধোঁয়া নির্মল এমনকি তাঁর ছোটো পুত্রকেও প্রভাবিত করেছে। কিন্তু এখন অন্তত নির্মলের সময় এসেছে এ ধোঁয়া থেকে সরে

আসার। নির্মলের কমন সেন্সকে তিনি বিশ্বেস করেন এবং আশা রাখেন শেষ পর্যন্ত হয়তো তাঁর ভাইপোর এ মোহ কেটে যাবে।

নির্মল ধীরভাবে বললে, 'তোমার কথা যদি ঠিক হয় জ্যাঠামণি তাহলে তো সারা দেশটাই পস্তাচ্ছে।'

'এক্স্যাক্টলি, এক্স্যাক্টলি!' প্রবোধবাবু যেন লাফিয়ে উঠলেন। 'সেই-জন্যেই তো দেশের সামনে একমাত্র সমস্যা স্ট্যাণ্ডার্ড অফ লিভিং বাড়ানো, সেইজন্যেই তো স্টীল প্ল্যান্ট—'

'তোমরা ওখানে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেন চেঁচাচ্ছ? ঘরে এসে কথা বললে হয় না?' ঘুমচোখে বুলবুলি উঠে আসে। প্রবোধবাবুর কাছে এসে বললে, 'ওঁর কথাটা বললে?'

প্রবোধবাবু বেজারভাবে বললেন, 'রতনের এখন হবে না। আর কী এমন হয়েছে? দুটো বছর অন্তত ওকে চাকরি করতে দে। তারপর আমিই বলে টলে কলকাতায় ট্রান্সফারের ব্যবস্থা করব।'

'তুমি আমার কোনো ব্যাপার সীরিয়াসলি নাও নি, নেবেও না,' বুলবুলির গলায় রাগ।

প্রবোধবাবু সেদিকে কান না দিয়ে বললেন, 'নির্মল, তুমি কাল যাচ্ছ?'

'আর ছুটির দু-তিনটে দিন এই নিরিবিলিতে কাটিয়ে দিই ভাবছি।'

'হ্যাঁ, তোমাদের দিকটা খাঁ খাঁ ধুঁয়ো।...ভবেন, কাল আটটায় বেরোব। সকাল দশটায় দমদম। বার্মিস্ প্রিমিয়ার আসছে।...বুলবুলি, রতনের জন্যে ভাবিস নে। আমি তোকে কথা দিচ্ছি ওদের কলকাতার হেড কোয়ার্টারে ট্রান্সফার করার ব্যবস্থা করব। ওদের ডাইরেক্টর জৈন, না ভবেন?'

'হ্যাঁ স্যর, সতেরো তারিখে ইউ. এন., অ্যাসোসিয়েশান্ মিটিং। আপনি প্রেসিডেন্ট, জৈন ভাইস্ প্রেসিডেন্ট।'

'সতেরো তারিখে তো স্মল্ স্কেল ইণ্ডাস্ট্রিজ কন্‌ফারেন্স।'

'ওটা স্যার আঠারো তারিখে।'

এ-সব খুঁটিনাটির ওপর খুব দখল ভবেনের। বস্তুত প্রবোধবাবু আউট-লাইনেই থাকতে ভালোবাসেন কিন্তু খুঁটিনাটিতে ভবেনের সাহায্য ছাড়া চলা মুশকিল।

'তাহলে ফ্রেঞ্চ এক্সপার্ট ?' অস্পষ্টভাবে বললেন।

'ওটা তো স্যার বিশ তারিখে তিনটেতে।'

'ঠিক বলেছ,' এমনভাবে বললেন যেন ভবেনকে এতক্ষণ পরীক্ষা করছিলেন। এবার বুলবুলির দিকে ফিরে বললেন, 'আমি কোনোদিন কাউকে আন্‌রিজনেব্‌ল রিকোয়েস্ট করি নি, করব না। তবে রতনের কথা আলাদা, হি ইজ এ ব্রিলিয়েন্ট এঞ্জিনিয়ার। তার জন্যে বলা মুশকিল না। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ান প্রবোধবাবু। সামনে ম্লান চাঁদনীতে গঙ্গা ছলছল করছে। ওপারে আবছা বেলুড় মন্দিরের মাথা জেগে আছে।

'হাউ গ্র্যাণ্ড! বাড়িটা কিনে ভালোই করেছি, কি বলো নির্মল ?'

'হ্যাঁ জ্যাঠামণি।'

'ঘাটটা আবার বাঁধাব ভাবছি। মারোয়াড়ীদের হাতে ছিল। ওরা কি রাখতে জানে!'

একটু থেমে সস্নেহে বললেন, 'শুয়ে পড়ো। লেপ দিচ্ছ তো। ঠাণ্ডাটা চেপে পড়ে নি। তবে চিল্ লেগে যেতে পারে।' একবার গঙ্গার ওপারের দিকে চেয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'হরঠাকুর রামকৃষ্ণ নয়, সেটা সবাই জানে। আমিও তো সি. আর. দাশ নই।'

আবছা অন্ধকার গঙ্গার দিকে চেয়ে বললেন, 'বেশ ইন্টারেস্টিং এক্সপিরিয়েন্স, না ?'

॥ দশ ॥

কুঠিঘাটার স্নানার্থীদের সঙ্গে নির্মল আজকাল বেশ জমে গেছে। তার সম্পর্কে স্নানার্থীদের দুরকম অভিমত। কেদার মুখুজ্জে রামকৃষ্ণের 'কথামৃত' উদ্ধৃত করে বলেন, 'লেংড়া আমের কুচি মুখে ফেললেই টের পাওয়া যায়। ও এখন চুপচাপ আছে। সময় যখন আসবে সবাইকে মেরে বেরিয়ে যাবে।' অর্থাৎ নির্মলের সম্পর্কে যে উৎসাহ তা কেবল তার সম্ভাবনায়। সে পরে কী হতে পারে সেইটাই তার পরিচয়। আর একটা অভিমত স্পষ্ট ব্যক্ত

করলে দীপক, 'পাঁচ বছর মাস্টারী করলে গাধা বনে যায়। ওর দ্বারা আর কিছু হবে না।'

এমন সময় নির্মল ঘাটে নামে। গতকাল হরঠাকুরের কৃপায় ভালো ঘুম হয় নি। এখানে নিরিবিলিতে তার মনটা একলা একলা বেশ তৈরি করেছিল। যে-সব ইংরেজী সাহিত্যের বই পড়াতে গিয়ে একেবারে প্রাণহীন আপ্তবাক্যের মতো ঠেকে সেগুলোর সঙ্গে আর একবার পরিচয় করে নিচ্ছিল। সেগুলো অত প্রাণহীণ লাগছিল না। যেমন উইলিয়াম সেক্সপীয়রের চিত্রকল্প। যখন সে ছাত্রদের সামনে মুখস্থ গতের মতো বলবার চেষ্টা করেছে কিভাবে লেখকের চিত্রকল্প পাল্টে গেছে পর্বে পর্বে (যা বহুবার বহু ভাষ্যকার বলেছেন) তখন তার মনে এসম্পর্কে কোনো প্রতিধ্বনি ছিল না, কিন্তু এই নির্জনে 'কীং লিয়ার' পড়তে পড়তে তার মনে হল লীয়ারের সেই হিংস্রতা নিষ্ঠুরতার চিত্রকল্প— নেকড়ে, শেয়াল, বাঁদর, ব্যাঙ— এগুলো যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। অর্থাৎ গঙ্গার হাওয়ায় ভালো খাওয়াদাওয়ায় তার মনটা এলিয়ে না গিয়ে আরো আঁট হয়ে উঠছিল এমন সময় সহসা তার জ্যাঠামণির আবির্ভাবে তার চিন্তাগুলো ওলোটপালোট হয়ে গেল। প্রবোধ সেন তাঁর একবেলার আবির্ভাবে যেন তাকে বুঝিয়ে দিলেন যে চিন্তাশীল হবার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গিয়েছে, এখন কর্মবীর হওয়ার প্রয়োজন— আর সে কর্ম যে ধরনেরই হোক।

'পাঁচবছর কি মশাই! একটা বছর ছেলে পড়ালেই মাথার চুল পাতলা হয়ে যায়,' অপ্রতিভ দীপকের দিকে চেয়ে নির্মল বললে।

তারিণী বললে, 'মাস্টারমশাইদের যুগ আজকাল আর নাই। ছেলে-বেলায় দ্যাখতাম কি সম্মান, এখন প্যাটের দায়ে রাস্তায় নাইম্যা মিছিল করে। এখন আর প্যাট ছাড়া কিস্যু নাই।'

নলিনী ধমকে উঠল, 'মিছিল করবে না তো কি করবে? শুকিয়ে মরবে? তোমাদের সরকার তাদের পয়সা দেবে? লুটছে তো যত চারশো বিশগুলো, কাগজ আর সিনেমার মালিক। বি. টি. রোডের দিকে একবার চেয়ে দ্যাখো না। এত কারখানা হচ্ছে। চাকরি বাকরির কিছু সুবিধে হচ্ছে? যেই একটু দাঁড়িয়ে যাচ্ছে অমনি ছাঁটাই। আর গরিবের সরকার ব্যবস্থা করেছে ট্রাইব্যুনাল। তার মানে তিন বছর বুড়ো আঙুল চোষ।'

'মাস্টারী একটা মিশান,' দীপক বললে।

'তা ভায়া যা বলেছ,' কেদার মুখুজ্জে বললেন। 'সব লোকের মাস্টারী হয় না।' তারপর নাতনীকে তেল মাখাতে মাখাতে বললেন, 'নির্মলবাবুর যদি ভালো লাগে মাস্টারী করবেন, যদি না লাগে ছেড়ে দেবেন। এতে আর কি কথা আছে!'

নির্মলের মুখে ঠিক উল্টো কথা এসেছিল। কিন্তু বললে, 'আমার তো বেশ ভালোই লাগে।'

দীপক চোখ উল্টে বললে, 'সে কি মশাই, মাস্টারী করতে ভালো লাগে এরকম লোক আছে না কি?'

কেদার মুখুজ্জে বললেন, 'এটা তোমরা বাড়াবাড়ি করছ। আমি যখন অ্যান্‌ড্রুজে চাকরি নিলুম— সেটা হল নাইনটিন হাণ্ডরেড এইট— তখন ভাবতুম এ কোনো যবনদের দেশে এলুম। বেশ ছিলুম মা-মাসির আদরে। তারপর তিন-চার বছর যেতে না যেতে সন্ধেবেলা হ্যারিকেন জ্বালিয়ে কাজ। হিবার্ট সাহেবের তো ডান হাত হয়ে গেলুম বছর কয়েক যেতে না যেতে।'

'আপনার দাদুর টু পাইস্ ছিল,' দীপক বললে।

'আপনাদেরও ট্যুইশানি আছে, নোট লেখা আছে! কি বলেন নির্মলবাবু? ভগবান সব ব্যবস্থা করেছেন। যাঁহা মুশকিল তাঁহা আসান।'

'দাদু ঠাণ্ডা!' কেদার মুখুজ্জের নাতনী এতক্ষণ একটা কঞ্চি দিয়ে ঘাটের সিঁড়িতে দাগ কাটছিল। সে চেঁচিয়ে উঠল!

নলিনী সারা গায় শর্ষের তেল চাপড়ায়। তারপর নাকের ফুটোয় সজোরে তেল টেনে নিয়ে বলে, 'সব লাল হো যায়গা।'

'সে কি রে! আবার ইংরেজ আসবে না কি?' তারিণী বিদ্রূপ করলে।

'দূর, ইংরেজরা তো আজকাল সেকেণ্ড ক্লাস পাওয়ার।...সেদিনের ময়দান মিটিং তো দেখলে। সমস্ত কলকাতা নেমে এসেছে বুলগানিন ক্রুশ্চভকে দেখবার জন্যে। ইংরেজ এলে দেখত, আমেরিকান এলে দেখত?'

কেদার মুখুজ্জের মা কালী আর নলিনীর কমিউনিজ্‌ম কুঠিঘাটার সবচেয়ে জোরাল দুটো কথা। এ দুটোই অবশ্য দুজনের কাছে একান্ত ব্যক্তিগত উপলব্ধি। গত নভেম্বরে কলকাতার ময়দানে 'বিশ্বের বৃহত্তম জনসমাবেশ' নির্মলকেও বিহ্বল করেছে। সেই জনসমুদ্রে মাইক তলিয়ে গিয়েছিল।

বুলগানিন কী বলেছিলেন, ক্রুশ্চভ কী বলেছিলেন বেশির ভাগ মানুষের কাছেই তা পৌঁছয় নি। তারা দূর দূর থেকে এসেছে, ভিড়ের মধ্যে বসেছে, কখনো হাততালি দিয়েছে, কখনো 'রুশ ভারত মৈত্রী জিন্দাবাদ' স্লোগানে যোগ দিয়েছে, কেউ প্রাণপণ শুনবার চেষ্টা করেছে, কেউ কিছু শুনেছেও। তারপর তারা অনেকেই হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরেছে এবং নির্মলের মতো তাদের অনেকের মনেই পরের দিন খবরের কাগজে বর্ণিত 'বিশ্বের বৃহত্তম জনসমাবেশ' এক বিরাট প্রহেলিকা হয়ে আছে।

'এই কলকাতায় জনসাধারণ সেদিন দেখিয়ে দিয়েছে সারা দুনিয়াকে···' নলিনী জলে নেমে গামছা দিয়ে গা রগড়াতে থাকে।

দীপক চুপ করে থাকে। এসব রাজনৈতিক উত্তেজনা সে পছন্দ করে না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'হুজুগ, হুজুগ। নার্গিস কলকাতায় এলে দেখো না গ্র্যাণ্ডহোটেলের সামনে লাঠিচার্জ হয়। কি বলুন দাদু?'

কেদার মুখুজ্জের চান হয়ে গেছে। নাতনীকে জামা পরাতে পরাতে হঠাৎ থেমে গিয়ে বললেন, 'এই কলকাতা অনেক কিছু দেখেছে। ছেলে-বেলায় লালবাজারের কাছ দিয়ে আসছি। নেটিভদের তখন সহরের কোনো কোনো জায়গায় ফুটপাথে হাঁটা বারণ। একটা গোরা আসছিল। কাছে আসতেই সপাং করে ছড়ির বাড়ি কষিয়ে দিল গালে। ইংরেজদের আমলে সে কি জাঁক। লাটসাহেব কি এখনকার মতো ছিল? লাটের গাড়ি বেরিয়েছে। রাস্তা খাঁ খাঁ। অন্যসব গাড়ি ঘোড়া চলবে না রাস্তায়।'

'আপনি দাদু বড্ড প্রাচীনপন্থী। পুরনোকে টেনে না এনে আপনি কথা বলতে পারেন না,' দীপক তার মনের কথাটা বলে ফেললে।

কেদার মুখুজ্জে নাতনীর ফ্রকে বোতাম লাগাতে লাগাতে বলেন, 'আজ যা নতুন কাল তা পুরনো। সব মায়ের খেলা। কংগ্রেসও মায়ের খেলা কমিউনিস্টও মায়ের খেলা। একদিন সব খেলা সাঙ্গ হবে। কিন্তু মা তেমনি থাকবে।'

নাতনীর হাত ধরে যখন তিনি ঘাটে উঠতে থাকেন তখন দীপক নিজের মনে চেঁচায়: 'বোগাস্, বোগাস্, সব বোগাস্!'

কেদার মুখুজ্জে থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, 'সব বোগাস্, সব মায়া। খালি একজন এ মায়ার ওপরে— যিনি এ মায়া সৃষ্টি করেন।'

তিনি চলে যাবার পরও দীপক গজরাতে থাকে, 'এখন তো ভগবান ভগবান করবেনই। তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে। আমাদের ভগবান ভগবান করলে চাকরি হবে, সস্তায় বাড়ি পাওয়া যাবে ?'

'কেউ যদি সত্যিই ভগবানে বিশ্বেস করে শান্তি পায় সে তো খুব ভালো কথা,' নির্মল চাপা বিরক্তিতে বলে।

'লেনিন বলেছেন' দীপক শুরু করে।

নির্মল অসহিষ্ণু হয়ে বললে, 'রিলিজিয়ান ইজ দ্য ওপিয়াম্ অফ দ্য পিপ্‌ল। তাতে হল কি ? ভগবানে বিশ্বাস লোপ পেয়ে গেল ! আর আপনি তো মশাই দরকার হলে লেনিন বলবেন, দরকার হলে রামকেষ্ট বলবেন।'

এতক্ষণে তাঁতীবাবু এসেছেন। তাঁতীবাবু ঘাটে এলেই বোঝা যাবে জোয়ারের সময় হয়েছে। তাঁতীবাবু সাদা গোঁফজোড়ার ভেতর থেকে হাসতে হাসতে বলেন, 'আজ যে ঘাট খুব গরম।...আমার মশাই লেনিনও নেই, রামকেষ্টও নেই। ছেলে দুটোকে মানুষ করলাম। তাদের বাইরে চাকরি। মেয়েটাকে সাধ করে বিয়ে দিলাম, জামাইটা মরল। এখন মেয়েটার এক ছেলে। এই নিয়ে আছি।...ভেবেছিলাম শেষ বয়সে তীর্থ করব। তা এখন এই তীর্থেই আছি। চোখে দেখতে পারি না তবু তাঁত চালাই।'

জল বাড়তে থাকে। ঘাটে ঢেউ আছড়ায়। জোয়ারের সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ার জোর বাড়ে। নির্মল, নলিনী, তারিণী গা ভাসিয়ে দেয় ! কতক-গুলো চিল নিচু হয়ে পাখসাট খায় মাছের সন্ধানে। মাঝে মাঝে চোখ খুলতেই ভেসে ওঠে অপস্যয়মান কুঠিঘাটার সিঁড়ি, বটগাছের মাথা, নির্মলের জ্যাঠার সদ্যকেনা বাড়ি, কারখানার চিমনি, মন্দিরের চুড়ো আর নির্মেঘ শীতের আকাশ। নির্মল সাঁতরাতে সাঁতরাতে ভাবে যদি এত সহজে, এমন অবলীলাক্রমে সে এমন জগতে পৌঁছতে পারত যে-জগৎটা জ্যাঠামশাই এবং বাপের দুটো জগৎ থেকেই আলাদা, যেখানে তার জ্যাঠামশাইয়ের জগতের বাগাড়ম্বর নেই আবার তার বাবার জগতের দৈন্য এবং রূঢ়তাও নেই।

লক্ষ্মীপুর

ভারতবর্ষ স্বাধীন হবাব পর বাংলাদেশের যেসব তরুণ 'এ আজাদী ঝুটা হ্যায়' বলে রাস্তায় নেমে মিছিল করেছিল সুব্রত তার মধ্যে অন্যতম। তখন এক প্রবল উদ্দীপনার মধ্যে আরো অনেকের সঙ্গে পুলিশের লাঠি খেয়েছে, বার দুয়েক জেলেও গিয়েছে কিন্তু সেই উদ্দীপনার জ্যোৎস্নায় রাস্তার পাশের আবর্জনাও মনোহব। এই রাস্তায় নেমে মিছিল কবার সঙ্গে রুশ বিপ্লব, চীনের বিপ্লব একাকার হয়ে গিয়েছিল অনেকের মতো সুব্রতর মনেও। তার বাবাকে সে বলত 'ব্লাডি কেরীয়ারিস্ট', নির্মলকে বলত 'কাওযার্ড', আশে-পাশেব লোক যাবাই আগামী বিপ্লবের পদধ্বনি শুনবার জন্যে কানখাড়া করে নেই তাদের সকলকেই মনে হত ভিন্ন জগতের বাসিন্দা! পৃথিবী দুভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে। এক ভাগে সুব্রত ও সুব্রতর মতাবলম্বী লোকজন আর অন্য ভাগে আছে সেই সব মানুষ যারা এখনো ঠিক মানুষ নয়, যাদের মানুষ করতে হবে।

তবে গত দশ-বাবো বছবে ভারতবর্ষের সাম্যবাদ আন্দোলন নানান ওঠাপড়ার মধ্য দিয়ে যাওয়ায় এ আন্দোলনের কর্মীদের মধ্যেও অনিবার্য কারণে নানারকম পরিবর্তন এসেছে। তাদের মধ্যে যাঁরা ভালো ছাত্র তাঁদের কেউ কেউ সওদাগরী অফিসে ঢুকে কর্মদক্ষতাই যে শেষপর্যন্ত সাম্যবাদ আনতে সাহায্য করছে এই বিশ্বাসে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিব পথে অগ্রসর হয়েছেন। কেউ কেউ হয়েছেন বিষণ্ণ বিবক্ত, ছিবড়ানো লেবু, যৌবনেই বৃদ্ধ, হাসিটা মুখের কোণে এখনো জোর করে জিইয়ে রাখেন। আর কিছু কিছু কর্মীব জীবনেব ধার এখনো আছে, শুধু তাঁবা টিকে আছেন এমন নয়। রাজনৈতিক উত্থান-পতন, আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব তাঁদের যে আঘাত করে নি তা নয়, তাঁদেব অনেককেই তা গুরুতরভাবে জখম করেছে কিন্তু তাঁরা যেন রাজনৈতিক শাঠ্য মেনে নিয়েছেন এমনভাবে যেমন দার্শনিকেরা গরল ও অমৃতের অবিভাজ্য মিলনকেই গ্রহণ করেছেন মানুষের জীবন-ব্যাখ্যায়।

ভিড়ে-ঠাসা বাসটার এক কোণে বসে সুব্রত তার নতুন আস্তানার কথা ভাবে। বাইরে লালমাটি, রুক্ষ রাঢ়ের ধানকাটা মাঠ। নিজেকে সে প্রশ্ন করে, সে কি কাউকে বাস্তবিক ঈর্ষা করে—তার ভাই নাণ্টুকে কিংবা নির্মলকে? নাণ্টুকে তার বাবা এক জাঁদরেল ব্যারিস্টার বানাতে চান তাতে তার ক্ষোভ কি? আর নির্মলের মতো রাজনীতি থেকে পালানোও সে বোঝে না। মানুষের যে পারিবারিক জীবন তাতে গণ্ডগোল নেই? তাহলে পার্টি সংগঠনেও গণ্ডগোল থাকবে না কেন? আর তাই বলে পার্টি ছাড়তে হবে?

বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী শহর থেকে আসতে আসতে রাস্তার দুধারে শালবন আগাগোড়া তাদের বাসের ওপর এক লম্বা ছাতার মতো ছায়া ফেলে আসছিল। সুব্রত সেদিকে চেয়ে চেয়ে মাথা নাড়ায়—না, নাণ্টু সে হতে পারবে না। নির্মল হওয়াও তার পক্ষে অসম্ভব। গত দশ-বারো বছরে তার সমস্ত যৌবনের উষ্ণতা দিয়ে সে রাজনৈতিক পার্টি সংগঠনকে আঁকড়ে ধরেছে। এর হয়তো অনেকখানি 'মেক্ বিলিভ্' যেরকম নির্মল বলে, অনেকখানিই হয়তো মিথ্যের সঙ্গে আপস কিন্তু বাবার মতে মত দিয়ে নিখাদ ব্যারিস্টার হয়ে মস্ত পশার ফাঁদিয়ে কলকাতায় আরো একটা মস্ত বাড়ি করে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট হয়ে প্রাণত্যাগ করলেই কি সত্যের পথে থাকা হবে? অথবা নির্মল যেমন বড়ো চাকরি করবার জন্যে তাল করছে তা কি তার পক্ষে সম্ভব? নির্মলের সাহিত্য অধ্যাপনা কিংবা জীবনচর্চায় আত্মসচেতনতা বজায় রাখার সমস্যা তো একক মানুষের সমস্যা। সব ব্যাপারে সচেতন চেষ্টায় দর্শকের নিরপেক্ষতা বজায় রাখা তো সম্ভব না। নির্মল যে নিরপেক্ষ মোহহীন দৃষ্টির কথা বলে তার তো আসলে কোনো মানে নেই। নাঃ। পার্টি পার্টি পার্টি! মরুক বাঁচুক পার্টি! একলা মানুষের চেষ্টার কি দাম?

সুব্রত বিড়ি ধরায়। পাশেই রাখা এক ঝাঁকা পাকা কুমড়োর চাপা গন্ধে হঠাৎ তার গা ঘুলিয়ে ওঠে। একটা খালি পিঠের চাপে তার ছোটো রোগা শরীরটা চেপ্টে যায়। পুরু ফ্রেমের চশমা ঝাপসা লাগে। চশমা মুছে সুব্রত ভালো করে তাকায়। পাশে খালি-গায়ের লোকটার মাথায় ঝাঁকড়া চুল। একমুখ বিড়ির ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সে আরাম করে আরো ঠেস দেয় সুব্রতর গায়। সামনের লম্বা সীট জুড়ে কয়েকটা সাঁওতাল মেয়ে।

চুলে শিমূলের ফুল। সামনে ঝুঁকে পড়ে কি শুনছে। সামনের সীটে একটি যুবক। সুব্রত আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করে এই খালি গা আর আধময়লা ধুতির ভিড়ে ছেলেটার পরণে চোঙা প্যান্ট আর টেরেলিনের বুশশার্ট। হঠাৎ একটা চাঁছাছোলা গলার চীৎকার ভেসে আসে, 'গুড্ লেংথ বল, গুড্ লেংথ বল, ও মারভেলাস্ ড্রাইভ।' সুব্রত চম্‌কিয়ে এই ট্রান্‌জিস্টার-মালিকটির দিকে তাকায়। তারপর রূঢ় গলায় বললে, 'আপনার গুড্ লেংথ বলটা থামান তো। এখানে ওটা কেউ বুঝবে না। আপনিও বোঝেন কিনা ভগবান জানে!'

সুব্রতর তীক্ষ্ণ গলায় একটু ভয়ে ভয়ে তাকাল ছোকরাটি। তার শ্রোতা-দের মধ্যে সাঁওতাল মেয়েগুলোও অবাক হয়ে তাকাল। সেদিকে চেয়ে সুব্রত আস্তে আস্তে বললে. 'চালান চালান। সারা দেশটাই ছেয়ে গেছে। আপনি আর কি দোষ করলেন।'

'ইডেন গার্ডেনে আমিও স্যার খেলা দেখেছি।'

'বাঃ! কদ্দূর পড়া হয়েছে?'

ছোকরাটি এতক্ষণে তার আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে। বস্তুত তার আত্মবিশ্বাস না থাকবার কারণ নেই; গাঁয়ের সবচেয়ে সম্পন্ন ঘর তারা। বললে, 'পড়াশোনায় আজকাল কি হয় স্যার। আমাদের সঙ্গে সোনামুখী হাইস্কুলে পড়ত বারীন ব্যানার্জী। সব সাবজেক্টে ফার্স্ট। এখন ফ্যা ফ্যা করছে।'

'কি করেন?'

'ওঁরা তিলি গো, তেল বেচেন বটে।' পাশেই বসা লোকটা ফস করে বলে উঠল। এবার সে একটু সরে বসতে সুব্রত ভালোভাবে তাকে দেখে। এক হাঁটু ধুলো, বাবড়ি চুল। শক্ত কালো কুচকুচে চেহারা।

'সে বাবারা দেখে,' ছোকরাটি বেজারভাবে জবাব দেয়।

'মানে বাবা-জ্যাঠারা বলছে গো। তাঁরা তো প্যান্ট পরবে, রেডিও বাজাবে, ঘানি দেখবার ফুরসুত কই।' কথাটা বলেই লোকটি আবার একমুখ ধুঁয়ো ছাড়লে।

'মদন, আর কদ্দিন ঘরে ভাত আছে রে তোর?'

'মদন বাউরীর ঘরে কদ্দিন ভাত থাকে? তুমি কি একবার কলকেতা

ঘুরে শহরের লোক হলে নাকি হে?' মদন এবার তার ধুলোমাখা বাবড়ি ঘুরিয়ে তাকায়। বোধ হয় একটু তাড়িস্থ। সুব্রতর দিকে চেয়ে ফিসফিস করে বললে, 'নবীনের সাকরেদ নাকি? কোথায় যাও?'

গত তিন-চার বছরে সংখ্যাতত্ত্ব সন্ধানে কয়েকটা জেলা ঘুরেও এসব ক্ষেত্রে আড়ষ্টতা কাটিয়ে উঠতে একটু দেরি লাগে সুব্রতর। 'লক্ষ্মীপুর,' আস্তে আস্তে বলে।

মদন বললে, 'আমাদের গাঁয়ে চললে যে! মাছ মারবে নাকি তো বলো, ভালো চার জানি।'

নবীনও উৎসাহিত হয়ে বললে যে মাছ ধরার আয়োজন সেও করতে পারে। তা ছাড়া যদি শিকারে যেতে চায় সে তাহলে তার কাকার একটা রাইফেল আর একখানা শট্ গান আছে। গাঁ থেকে তিন মাইল দূরে আমতলার ঝিলে জল আছে। হাঁস পাওয়া যাবে।

প্রত্যেকবারেব মতোই তার কাজটা ঠিক কি তা বোঝাতে মুশকিলে পড়ে। তাদের ইন্স্টিটিউট সরকার থেকে সাহায্য পায় বটে তবে সবকাবি প্রতিষ্ঠান তাকে কিছুতেই বলা যায় না। কমিউনিটি ডেভেলাপমেন্টের কাজ করতে যাচ্ছে না, খবরের কাগজের রিপোটাব নয়, কিসান সভাব নেতা নয়, আবাব মাছ ধরতে কিংবা হাঁস মারতেও যাচ্ছে না, তবু সে গ্রামে যাচ্ছে। এ ব্যাপারটা সে কিছুতেই গাঁয়ের লোকদের বোঝাতে পাবে নি।

আর শুধু গাঁযের লোক কেন, তার নিজের পার্টি কর্মীদের কাছেও এভাবে গাঁয়ে যাওয়া এক ধরনের শৌখিনতা। তাদের কলেজের গৌতম তাকে বলে 'বিভিশানিস্ট'। অর্থাৎ এভাবে গাঁয়েব খবর সংগ্রহ করতে তার বাবা প্রবোধ সেনেরও যেমন আপত্তি তার রাজনৈতিক বন্ধুদেরও আপত্তি। সুব্রত আগেও ভেবে দেখেছে তাদের যে জীবনের ধারা তাতে বিলেত যাওয়া বরং সহজ, কিন্তু বজবজের কোনো কারখানায় আসা প্রায় অঘটন।

মদনের কালো ধুলোমাখা মুখ থেকে তাব হলদে চোখজোড়া তাকে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করে। তারপর মদন বলে, 'গব্মেন্টের লোক তো বটে?'

'তা তো বটেই,' সুব্রত কিছু বলবার আগেই নবীন উৎসাহ দেখায়। তার উৎসাহ সুব্রত সরকারি লোক কি না তা নয়। চেহারায় কথাবার্তায় একজন শিক্ষিত বাবু চলেছে তাদের গাঁয়ে। সেই বাবুদের মতো সেও হতে

চায়। যে বাবুদের মতো হতে পারলে সে আর কিছু চায় না। তাদের দুখানা ঘানি, শ' তিনেক বিঘে জমির স্বাচ্ছল্য, গাঁ জুড়ে লাল মোরামের আঁকাবাঁকা রাস্তা, গাঁয়ের চারপাশে বৃত্তাকারে প্রবাহিত শালী নদীর তীরে তীরে সেচের কাজে লোহার বাগ্‌দী মেয়ে-পুরুষের সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কলরব— তাকে আর ধরে রাখতে পারে না। তার মতো আরো গাঁয়ের অনেক যুবকের সাধ হয় সেই ট্রামের হাতলে-ঝোলা, ফ্ল্যাটে-থাকা, সিনেমা-দেখা, খবরের কাগজে মশগুল কলকাতার বাবু হতে। আর বাউলের গান নয়, সাঁওতালী নাচ নয়, প্রকৃতি নয়, গ্রামীণ কর্ম নয়, বাবুদের জীবনযাত্রার চিত্রকল্পই নবীনদের পাগল করেছে।

লালধুলোয় তামাটে ঝাপড়া দুটো শ্যাওড়া গাছের সামনে বাস থামে। যারা নামল তারা হন্ হন্ করে এগিয়ে সামনে শরবনের মাঝখান দিয়ে পায়ে চলার রাস্তায় মিলিয়ে গেল। চারদিকে হঠাৎ খুব চুপচাপ। সুব্রত পকেট থেকে ম্যাপ বার করে। যে রাস্তা সামনে তা টেস্ট রিলিফের রাস্তা, ম্যাপের ভাষায় টি. আর. রোড। আর মাইল দেড়েক গেলেই গন্তব্যস্থল লক্ষ্মীপুর, সেখানে সম্পন্ন চাষী রতন মুখার্জীর বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা। পেছন থেকে এতক্ষণ একটা লোক তাকে লক্ষ্য করছিল সে খেয়াল করে নি। লোকটা হেঁড়ে গলায় হেসে উঠল ম্যাপের দিকে চেয়ে। বললে, 'এখন তো বাবু জলে নামবাব হবে। সাঁতার জানো নাকি গো?'

'সাঁতার!' সুব্রত আকাশ থেকে পড়ল। কাল রাত্তিরে ট্রেনে ঘুম হয় নি, সকালে প্রাতঃকৃত্য হয় নি। বাসে ভিড়ে চেপ্টে বসে মাজা ধরে গেছে। এখন রতন মুখুজ্জের বিছানায় গা এলাবার জন্যে মন করছে। আবার ম্যাপটা মেলে ধরে সুব্রত। পরিষ্কার টি. আর. রোড লেখা।

[illegible]

আরো মাইল খানিক দূরে শালী নদী গ্রাম বেড়ে রয়েছে। সারা বছর চর আর পাথর। বর্ষার গোড়াতেও পায়ের পাতা ডোবে না। এখন বর্ষার শেষে নদীর চেহারা পাল্টে গেছে। প্রায় তিরিশ-চল্লিশ হাত চওড়া লাল

জল ক্রমাগত ঘুরপাক যাচ্ছে, আছড়াচ্ছে। তিনটে মাটির জালাতে কয়েকটা বউ আর ক্রন্দনরত শিশুদের ঠেলে ঠেলে পার করাচ্ছে বাউরীরা। পাড়ে দাঁড়িয়ে সেই ট্রানজিস্টারের মালিক তার নীল চোঙা প্যান্ট ছাড়ছে, পাশে সাইকেল।

'তোমার সাইকেল?' সুব্রত বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করে।

'ওরা সব পার করে দেবে, কিচ্ছু ভাববেন না। দেখছেন তো পাড়া-গাঁয়ের কি অবস্থা! এখানে কোনো ভদ্রলোক থাকতে পারে!'

'তোমার বাপ-ঠাকুর্দাদা পারত গো। তোমরা তো লোতুন ভদ্দরলোক। তোমরা তো পারবে না বটে,' আবার মদনের কর্কশ গলা শোনা যায়।

মদন মাথায় সুব্রতর বেডিং নিয়ে সাঁতরে চলে। নবীনের সাইকেল দুজন আধিয়ার জলের ওপর এক হাতে তুলে আর-এক হাতে সাঁতরিয়ে চলে। দুতিন খেপ্ হাঁড়ি পারাপার হল। আর-সকলের মতো ধুতি-পাঞ্জাবী পাগড়ী করে মাথায় বেঁধে জাঙিয়া পরে জলে নামে সুব্রত। জলটা যত তড়পাচ্ছে ততখানি বিপজ্জনক নয়। খানিকদূর বুক-জলে হেঁটেই পায়ের নীচে জমি পায়। পারে গেঞ্জি আর সাদা ধবধবে কাঁচিধুতি পরনে, পায়ে সাদা রবারের চটি পরে এক ঢ্যাঙা ফর্সা লোক কিছুক্ষণ থেকে সুব্রতর দিকে চেয়ে ছিল। লোকটির চেহারা স্থানীয় লোকজন থেকে স্বতন্ত্র। সে যে হুকুম তামিল করে না, হুকুম করে— তা তার স্থিরদৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে থাকার ম'ধ্যে স্পষ্ট।

ভেজা গায়ে সুব্রত পারে উঠতেই একটা আনকোরা নতুন তোয়ালে তার দিকে বাড়িয়ে রতন মুখুজ্জে বললেন, 'নিন, গা মুছে ফেলুন। যত পাপের শাস্তি। আপনাদের কি এসব জায়গায় আসা পোষায়। আপনাকে তো বলেছিলাম সোনামুখীর ডাকবাংলোয় উঠতে। এ গাঁয়ের যা খবর তা তো আমার মুঠোর মধ্যে।'

কাপড় পরে গাঁয়ের পরিচ্ছন্ন লাল রাস্তায় পা দেয় সুব্রত। তার মুগ্ধ দৃষ্টি লক্ষ্য করে রতন মুখুজ্জে বলেন, 'বেশ ছবির মতো, না? বাইরে থেকে যারাই আসে তারাই বলে। কমিউনিটি ডেভেলাপমেণ্টের রাস্তা। কয়েক বছর মোরাম পড়ে নি, জলে ধুয়ে যাচ্ছে। আর চার-পাঁচ বছর পর এলে হয়তো দেখবেন গাঁয়ের লোক যেমন আল ভাঙত তেমনিই আল ভাঙছে।'

তারপর খানিকদূর হাঁটতে হাঁটতে বললেন, 'তবে গাঁয়ের উন্নতি অনেক হয়েছে। রেডিও এসেছে গাঁয়ে। বাড়িতে বাড়িতে সাইকেল। গাঁয়ের ইয়ংম্যানদের হাতে ঘড়ি।...বাউরীদের কিচ্ছু হল না।'

'কেন হল না?'

'কুঁড়ে কুঁড়ে!' ভদ্রলোক দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

সুব্রত অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটছিল, একবার ঠোক্কর খায়। দুপাশে রুক্ষ রাঢ়ের ধানকাটা মাঠ বিকেলের হলুদ আলোয় আরো রিক্ত সর্বস্বান্ত লাগে। লোহার-বাউরীদের সম্পর্কে অপবাদ সুব্রত আগেও শুনেছে কিন্তু তার অর্থ-নীতির জ্ঞানে তা মেনে নিতে পারে নি। প্রায় শূন্যে জেগে থাকা একটা ঝোপ থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে নেয় সুব্রত। পাতাটা হাতের মুঠোয় নিয়ে সে এক অস্থিরতাবোধ করে যার আশু কোনো সমাধান নেই।

'কী ভাবছেন?' রতন মুখুজ্জে তার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

'নাঃ, কিছু না।' আবার দুজন চুপচাপ পথ চলে। যদ্দিন বাংলাদেশের চাষবাসে লাখ লাখ বাউরী-লোহার সমাজের অন্ত্যজ লোক তৈরি থাকবে অতি নিচু দরে তাদের শ্রম বিক্রির অপেক্ষায় তদ্দিন উন্নত চাষ মানে সোনার পাথর বাটি। কিসের তাগিদ রবিশস্যের জন্যে, ফার্টিলাইজারের জন্যে, সেচের জন্যে যদি অন্ত্যজদের বিশাল সৈন্যসামন্ত নিয়ে একবিঘত খোঁড়া মাটিতে ধান ছিটিয়েই লাভ হয়?

সুব্রত চশমা মোছে। বিকেলের আলো পড়ে আসছে। গ্রাম সামনে। দুটো কুকুর একসঙ্গে ডাকতে থাকে। তাড়ির গন্ধ হাওয়ায়। তিন-চারজন লোক এসে নমস্কার জানায় রতন মুখুজ্জেকে এবং সঙ্গে সঙ্গে সুব্রতকেও। গাঁয়ের একমাত্র কোঠাবাড়িতে উঠে আসে তারা। সামনের উঠোনে ধান ঝাড়াই হচ্ছে। এবার রতন মুখুজ্জে সরকারের 'কৃষকপণ্ডিত' খেতাব পেয়েছেন। বিঘে প্রতি অবিশ্বাস্য আঠারো মন ধান তুলেছেন। ধানের আঁটিগুলো সুব্রতর মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে পাশে গিয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে আঁটি গোনার এক সুরেলা গুঞ্জন ওঠে। বিকেলের আলো পড়েছে বাগদী-লোহার মেয়ে-পুরুষদের মুখের ওপর।

'আপনার কোনো ভাবনা নেই। স্যানিটারি প্রিভির ব্যবস্থা আছে।' সুব্রত চমকে উঠল রতনবাবুর কথায়। একটা নতুন চুনকামকরা ছোটো

দোতলা বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'ফর্টি থাউজেণ্ড পড়ল সব মিলে। বিল্ডিং মেটিরিয়ালের যা দাম! যখন চাষ করব ঠিক করলাম বামুনের ছেলে হয়ে তখন আত্মীয়-বন্ধুরা মুখ দেখত না। এখন তাড়াতে পারলে বাঁচি।...ঐখানে জলের কলসী। বিছানা পাতা আছে। কোনো দরকার ছিল না বেডিং আনার।'

সুব্রত চুপচাপ তক্তপোষখানার ওপর বসে থাকে। বাইরের ধানের আঁটি গোনার গুঞ্জন ছাপিয়ে হাঁস ডাকে। জানলার গায়েই পুকুর। সে কি ফের তিরিশ সালের গান্ধীবাদী যুবকদের রাস্তাতেই চলেছে যে কথা তার কলেজের সহকর্মী গৌতম বলে? সুব্রত আবার একটা বিড়ি ধরায়। গত দশ-বারোটা বছর আসলে সে একটাই চাকরি করেছে, সেটা হল বিপ্লবের চাকরি। আর সেই চাকরি করতে করতে বিপ্লবটা যেন কোথায় সরে গিয়েছে। গত কয়েক বছরে রাজভবনের সামনে একটার পর একটা মিছিলের সেও ছিল অন্যতম উদ্যোক্তা। সেই গলা ফুলিয়ে বিপ্লবের জয়গান, সেই একরকমভাবে রিপোর্টাররা নাক খুঁটতে খুঁটতে পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে আলাপ করবে আর কিছুক্ষণ পর কোনো রাজনৈতিক নেতা কোনো মন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করে এসে জ্বালাময়ী বক্তৃতা করবেন কেমনভাবে তাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলন জয়যুক্ত হয়েছে। এর মাঝখানে এক-আধবার পুলিশের লাঠি চার্জ হবে। আর ফুটপাথের ঠিক যেখানটায় রক্তস্নাত হয়ে কাল কোনো ছাত্র হাসপাতালে গিয়েছে আজ সেখানেই পা বাড়িয়ে উদাসীন পথচারী জুতো পালিস করছে। এ বিপ্লবের আদি বোধহয় ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট কিন্তু এর বোধহয় কোনো শেষ নেই। বিপ্লবের এই কাদামাখা ঘোলা জল শহরের জীবন বছরে একবার দুবার আরো কর্দমাক্ত করে তুলবে। কিন্তু কোনোদিনই ভাসিয়ে স্নানস্নিগ্ধ করে তুলবে না। সুব্রত বিপ্লবের এই অনঢ় খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসতে চায়, তার জন্যে সে গান্ধীবাদী হবার ঝুঁকি নিতেও রাজী। শেষ পর্যন্ত হয়তো এত চুপচাপ, এত শান্ত, এত অতীতের সঙ্গে সংপৃক্ত জীবন থেকে পালাবে। হয়তো আসানসোলের কয়লার খনি অঞ্চল কিংবা নতুন শিল্পনগরী দুর্গাপুরে লোহা কারখানার মজুরদের মধ্যে তার বিপ্লবের কর্মস্থল খুঁজে নেবে। ভারতবর্ষের যা চেহারা দাঁড়াচ্ছে তাতে হয়তো আরো অসংখ্য রাজনৈতিক কর্মীদের মতো এই সমাজবাদী বিপ্লবের

মায়াবী হরিণের পেছনে সারাজীবনই দৌড়তে হবে। কিন্তু এইখানেই সে নির্মলকে কখনো বোঝাতে পারে না। তাদের দৌড়তে হবেই। এটাই তাদের কালের সবচেয়ে বড়ো কথা।

সুব্রত সে রাত্তিরে না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ল। সোনামুখী থেকে বাসে মাছ আনিয়ে রতন মুখার্জির চিংড়ির মালাইকারীটা মাঠেই মারা গেল। ভদ্রলোক সুব্রতর হাবভাবটা বিশেষ বুঝতে পারলেন না। হয় তার অসম্ভব উৎসাহ অথবা হঠাৎ নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়ায় এইরকম একটা মনোভাব বাসতলা থেকে আসতে আসতে লক্ষ করেছিলেন তিনি। ঘাড় ধরে কয়েকবার ঝাঁকিয়েও দিলেন। কিন্তু সুব্রত অঘোরে ঘুমোয়। পাশেই একটা টিনের চালে নাম-না জানা একটা গাছ থেকে সারা রাত্তির ধরে দুড়ম-দাড়ুম করে কি একটা ফল পড়ার শব্দ আসে। সুব্রত এক-একবার চমকে-চমকে ওঠে, আবার ঘুমোয়। সকালে মুখে রোদ্দুর পড়ায় তার ঘুম ভাঙল।

॥ দুই ॥

প্রচুর মুড়ি নারকেল আর কলাইকরা বাটিতে তিনবার চায়ের সঙ্গে জলযোগ সাঙ্গ করে সুব্রতচন্দ্র বিছানায় গা গড়াচ্ছিলেন এমন সময় মুখুজ্জে ঘরে ঢুকেই বললেন, 'চলুন, চলুন, বেরোবেন, বেলায় ঘুমোবেন না।' সকালবেলার শিশির আর ঠাণ্ডা হাওয়ায় ভদ্রলোকের চেহারাটা আরো সতেজ দেখায়। রতন মুখুজ্জে আলুর ক্ষেত তদাবক করে ফিরলেন।

সুব্রত বাইরে আসে। একটা মস্ত ঝাড়াল শ্যাওড়া গাছ আর কাঁঠাল বন পার হয়ে ফাঁকায় এসে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে সুব্রত। তারে ঢাকা দুকাঠা মতো জায়গায় কয়েকটা পুরুষ্ট রোড আয়ল্যাণ্ড আর লেগহর্ন ঘুরেছে।

'এটা একটা চেষ্টা মশাই। দেখা যাক কদ্দুর কি হয়,' মুখুজ্জে বলেন।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে চেয়ে সুব্রত বললে, 'আপনারা যে কি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছেন তা পাড়াগাঁয়ে থেকে বুঝতে পারবেন না। শহরের লোকেরা চেঁচাচ্ছে, বক্তৃতা দিচ্ছে, বড়ো জোর মিছিল করছে। কিন্তু আমেরিকান গম দিয়ে তো দেশকে দাঁড় করানো যাবে না।'

রতন মুখুজ্জে সলজ্জ হাসেন। 'আমাদের ফ্যামিলি জানেন খুব পুরনো।

আমরা যে কেউ চাষ করব কেউ কল্পনাও করতে পারত না,' ভদ্রলোক তাঁর কাপড়ের খুঁট থেকে কি একটা বার করতে করতে বলেন।

'সেটাই তো আনন্দের কথা। অফিসের চাকরি বা আমাদের মতো মাস্টারীর আন্‌প্রোডাক্‌টিভ্‌ লেবার ছেড়ে আপনি দেশের প্রোডাক্‌টিভ্‌ ফোর্সকে জোরদার করছেন।'

সুব্রতর কথা তাঁর কানে ঢুকছিল কি না ঠিক বোঝা গেল না। তিনি এতক্ষণ তাঁর খুঁট থেকে বের করা একটা হলদে রঙ্‌জলা পাকানো কাগজকে সযত্নে সোজা করবার চেষ্টা করছিলেন। চোখে যেন তাঁর পিতৃস্নেহ। তুলোট কাগজখানার কোণগুলো ধীরে ধীরে সোজা করে দিতে দিতে বললেন, 'এসব জিনিস এই অজ পাড়াগাঁয়ে কে বুঝবে বলুন।···এইখানটা দেখুন এগারো শো বাহান্ন বঙ্গাব্দ শ্রীউপেন্দ্রদেব শর্মণঃ প্রায় দুশো বছর আগের কথা।'

মাঠের ওপাশে ফুটন্ত শিমূল গাছে এক ঝাঁক টিয়া এসে বসে। তারপরেই শাল কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে। শালবনের পেছনে সকালের অল্প কুয়াশা ভেদ করে শীতের নবীন সূর্য এতক্ষণ পর মাথা তুলেছে।

'চলুন যেখানটা সেচের কাজ হচ্ছে সেদিকটা দেখে আসি,' সুব্রত সেদিকে চেয়ে বললে।

তার কথা মুখুজ্জের কানে যায় না। বলেন, 'তাহলে দেখুন কি অবস্থায় আছি। এখানে আপনি কোথায় আর সোসাইটি পাবেন, মনের খোরাক পাবেন। থাকার মধ্যে তো খালি বাগদী আর লোহার। তাড়ি খাওয়ান আপনার পায়ে পড়বে. আবার পয়সার দরকার হলে আপনার বাড়িতেই সিঁদ কাটবে।'

হঠাৎ যেন গোবরে সুব্রতর পা গেড়ে যায়। সংখ্যাতত্ত্ব সংগ্রহের কাজ নিয়ে যে কটা গ্রামে গিয়েছে গত কয়েক বছর একই ব্যাপার চোখে পড়েছে। যাঁরা নতুন চাষ করার কথা ভাবছেন, কৃষিতে ফলন বাড়াচ্ছেন তাঁরা মেজাজের দিক থেকে আর গ্রামে নেই। এদিক থেকে দিনাজপুরে এক মুসলমান তামাক চাষীকে তার ভালো লেগেছিল। লোকটির নামে তখন অবশ্য তিনটে খুনের মামলা ঝুলছে। কিন্তু সেই সম্পন্ন চাষীটির তামাক বাগানটাই তার সব। সে তার ছেলেকে বড়ো চাকুরে বানাবে না, শেষ

জীবনে শহরের উপকণ্ঠে বাড়ি বানাবে না। সে তার আজীবন তামাক বাগান সমৃদ্ধ করে এই বাগানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবে। বিঘে প্রতি আঠারো মন ধান তোলার নায়কের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সুব্রত একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

'ক্যানালে জল এল, আর তাইতে জমির ফলন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ল। আপনি কাল বলছিলেন না? সবই ভাগ্য মশাই। ছেলেটাকে ইঞ্জিনিয়ারিঙে দিয়েছি। এখানে থেকে কি করবে বলুন।'

তুলোট কাগজখানা সুব্রতর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'একবার দেখবেন না?'

'কী দেখব?' একটা চাপা অসহিষ্ণুতা এতক্ষণে ফেটে পড়ল। 'আপনার পূর্বপুরুষদের চেয়ে আপনি আমার কাছে অনেক কাজের লোক। তাঁদের অনেক জমিজমা ছিল। কিন্তু তাঁরা কি আপনার মতো দাঁড়িয়ে থেকে চাষ করিয়েছে? এরকম জমির ফলন বাড়িয়েছে? দেউড়িতে হাতি বাঁধা থাকত কি না ভেবে ভেবে অনেক ফতুর হয়েছি রতনবাবু।'

শিশিরে ভেজা ন্যাড়া রুক্ষ রাঢের মাঠে হাঁটতে হাঁটতে সুব্রত চাঙ্গা বোধ করে। হয়তো এইভাবে বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে ঘুরে গ্রামজীবনের রিপোর্ট সংগ্রহ করতে করতে তার নিজের জীবনের একটা দিকও খুঁজে পাবে।

পাশে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ রতন মুখুজ্জে থমকে দাঁড়ান। 'আপনার কথা খানিকটা বুঝছি, খানিকটা বুঝছি না। বাসে যে ছোকরা দেখলেন নবীন, তার বাপ-কাকারাও এখানকার সচ্ছল লোক। তারাও বিঘে প্রতি তেরো-চোদ্দ মন ধান তুলেছে এবার।'

'তাহলে তো একটা কূল পাওয়া গেল মশাই। আমাদের আর ভিখিরী-দের মতো আমেরিকার কাছে হাত পাততে হবে না।'

রতন মুখুজ্জে মুখ গম্ভীর করে বললেন, 'তাই বলে আপনি নবীনের বাপ আর আমাকে এক লাইনে দাঁড় করাবেন?'

'এক লাইনে—কিন্তু আপনার স্থান সে লাইনের প্রথমে।'

'সেটাই আমার একমাত্র পরিচয়?' রতন মুখুজ্জের গলা কেঁপে উঠল।

'নবীনের বাপকে আমি জানি না। তবে এটুকু বলতে পারি আপনি আমার চেয়ে অনেক বেশি কাজের লোক। নবীনের বাপও বোধহয় তাই।'

'কিন্তু সেটা তো হল কাজের কথা!' ভদ্রলোক তবু বললেন।

'তাছাড়া আর কি কথা আছে? তাছাড়া আর কি কথা থাকতে পারে? এখানে আলু ছিল না আপনারা আলু করছেন, নতুন আনাজ করছেন, ধানের ফলন বাড়াচ্ছেন। আপনি বলুন, এর চেয়ে কী ভালো কাজ থাকতে পারে?'

রতন মুখুজ্জে তাঁর আলুর ক্ষেতের সামনে দাঁড়িয়ে পড়েন। ডান হাতে সাত-আট বিঘে জুড়ে ঘন কালচে সবুজের সারি, তার মাঝে মাঝে সর্ষের জলজলে হলদে ফুল মাথা তুলেছে। রতন মুখুজ্জে সেদিকে চেয়ে চোখ ফিরিয়ে নিলেন। তারপর প্রায় আর্তভাবে বললেন, 'কিন্তু আমাদের কালচার?'

'আপনি আলুর ক্ষেত দেখুন। আমি সেচের কাজটা দেখে ফিরছি।' সুব্রত পেছনের দিকে না ফিরে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে যায়।

সারাটা দিনই সুব্রত রতন মুখুজ্জেকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলে। সেচের কাজ দেখে বাগদী পাড়াতে একবার ঢুঁ দিয়ে আসে। প্রত্যেকবারের মতোই তার কাজ গাঁয়ের লোকদের কৌতূহল সৃষ্টি করে। তাকে কেউ কেউ ভাবে ব্লকের লোক, কেউ কেউ ভাবে পুলিশের লোক। দুপুরেও খেয়েদেয়ে বেরিয়েছিল। সন্ধেবেলা তিলি পাড়ায় ল্যাংচা ক্লাবেও ঘুরে নবীনের রেডিওতে প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর উদাত্ত বক্তৃতা শুনে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফেরে। সেদিন মাঝ রাত্তিরে বিশ্রী চেঁচামিচিতে সুব্রতর ঘুম ভাঙে। বাইরে উঠোনে ঝলমলে চাঁদনিতে ধান স্তূপাকার। ওপাশে পরিচ্ছন্ন মুখুজ্জের মরাই। তারপর ঠিক কারখানার গায়ে কুলি লাইনের মতো রতনবাবুর মজুরদের কয়েকখানা শীর্ণ খড়ের চালা। রতনবাবুর মাইনে-করা লোকজন ধান করে, রবিশস্য করে, গুড় করে। কমিউনিটি ডেভোলাপমেন্ট প্রজেক্টের টাকায় একটা 'লিটারেসি সেন্টারের' জন্যে আটচালাও বানানো আছে। সেখানে অবশ্য কিছু হয় না। চেঁচামেচি সেদিক থেকে আসছে।

সুব্রত সেদিকে যাচ্ছিল। রতনবাবুর পুরনো লোক যে দাওয়ায় শুয়ে ছিল সে উঠে আসে—'ওদিকে যাবেন না স্যার, মাতালদের ঝগড়া। এখনই থেমে যাবে। ওই মদনটা আছে, দাগী আসামী।'

'মদন বাউরী?'

'হ্যাঁ স্যার। মাতাল রাঁড়খোর লোক। সব ব্যাপারে বাগড়া দেবে। গাঁ তো আর আজকাল পেছনে পড়ে নেই গো। সব ব্যাপারে এগুচ্ছে। তিলিদের মধ্যে তিনটে ছেলে কলেজ গেল ? তবে ?'

রতনবাবুর এ লোকটির নাম গনু। সেও বাউরী। ছেলেবেলায় বাপ-কাকাদের সঙ্গে পালকি বয়েছে, জমি নিয়ে বাবুদের জন্যে একটু আধটু লাঠিবাজিও করেছে। এখন দুবিঘে জমি রতনবাবুর কাছ থেকে পাওয়ার পর সেও অন্যান্য বাউরী ক্ষেতমজুর থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র মনে করে। সারা দিন গনু উসখুস করছিল কলকাতার এই আগন্তুক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে।

'রতনবাবুর ছেলে স্যার ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছে', সেই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত ধানের আঁটি ছড়ানো উঠোনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গনু বললে।

'শুনলাম,' সুব্রত বেজারভাবে বলে।

আবার চেঁচামেচির রোল উঠল। এবার একটা স্ত্রীলোকের কান্নাও শোনা যায়।

'শালা পিটছে বৌটাকে। একটা চাঁড়াল বটে।' গনু বললে।

অস্বস্তি নিয়ে সুব্রত ঘুমোতে গেল। তক্তপোষে এপাশ ওপাশ করেও ঘুম আসছিল না। শেষ পর্যন্ত তন্দ্রার মধ্যে অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখলে সুব্রত। সে যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে তাদের আমহার্স্ট স্ট্রীট কলেজ বিল্ডিং-এর রঙ-ওঠা পানের পিক্ ছিটানো দেয়াল। তার সামনে মাস্টারদের ঘরের কাছে টুলের ওপর মদন বসে, তার পরনে নীল চোঙা প্যাণ্ট আর ঘিয়ে টেরেলিনের বুশশার্ট। কালো চোয়াড়ে দাড়ির খোঁটায়ভরা খরখরে গাল মাঞ্জা দিয়ে সে ফ্যাকাশে বেগুনী করে ফেলছে। হলুদ চোখের দৃষ্টি পাল্টায় নি, কিন্তু পাল্টেছে বাবড়ি। ধুলোমেখো ঝাঁকড়া চুল এখন চৌরঙ্গী অঞ্চলে আধুনিক পাঞ্জাবী মেয়েদের 'স্কাই স্ক্র্যাপার' কেশবিন্যাসসদৃশ। আর মদন যেন ভীষণ আত্মসচেতন পাছে চুড়োটা খুলে পড়ে। হাতে তার গোল্ডফ্লেকের টিন। বোধহয় কলেজ ছুটি হয়েছে। গোটা বাড়িটা খাঁখাঁ করছে। খালি মদন আর সুব্রত। আর সুব্রতর প্রচণ্ড তেষ্টা পেয়েছে। এক গেলাস জলের জন্যে পর্দা সরিয়ে সে স্তম্ভিত হয়ে আছে। মদনের সিগারেটের টিনের দিকে চেয়ে তার মুখে কথা ফুটছে না অথচ তেষ্টায় ছাতি ফাটছে।

॥ তিন ॥

কার্তিক মাস পার হতে চলল তবু সারা আকাশ জুড়ে মেঘের দামামা। মদন বাউরী দাওয়ায় বসে আকাশের দিকে তাকায় আর সুর করে বলে, 'আমায় রাজা বানাবে গো, আমায় রাজা বানাবে। আমার ঘরের চাল ছাওয়াবে, টিপ কলের জল দেবে, নেকাপড়া শেখাবে। আমরা নেকাপড়া শিখে বাবু হব গো শালা।' অশ্রাব্য গাল পাড়ে মদন। তারপর এক খাবলা থুতু ফেলে সামনে।

ফের বিড়বিড় করে, 'কোন্ কেষ্টঠাকুর এসে হাল ধরবে গো বাবু? বাপঠাকুর্দার ব্যবসা তো খেতে বসেছ! এখন বলে কিনা হাবুকে ইস্কুলে দাও। শালারা তিলি পাড়ায় যাক না। সব তো ব্যাঙের ছাতার মতো বাবু গজাচ্ছে সেথায়। আরে শালা তোর বাপের পিট কেটেছে আখের চোঁছায় আর তুই বাঞ্চোৎ পাউডার মাখছিস, বগলে সাবান ঘসছিস। থুঃ!' মদন আবার থুতু ফেলে।

হঠাৎ কি মনে করে দাঁড়িয়ে উঠল। গট গট করে ঘরের ভেতর যায়। অন্ধকারে মাদুরে তার সদ্যোজাত ছেলে ঘুমোচ্ছে। এক পাশে পাঁচ-ছটা নানা আকারের মাটির হাঁড়ি। মদনের পা লেগে দু-তিনটে উলটে যায়। মদন আবার গাল পাড়ে। 'থাকতে দিলে না ভাতকাপড়, শালা মরে করবে দানসাগর,' রাগে আর তাড়ির ঝোঁকে বাবুদের বাড়িতে শোনা একটা ছড়া নির্ভুল আওড়ায়। সামনে দড়িতে কি ঝুলছে, মদনের নাকে লাগে। একটা ফুলকাটা আর্ট সিল্কের তেলচিটে ব্লাউস। ফোকরের মতো ছোটো জানলা দিয়ে যে একটুকরো আলো আসছিল সেই আলোতে ব্লাউসটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে মদন। তারপর তার শক্ত আঙুল দিয়ে ফর ফর করে ছিঁড়ে ফেলে ব্লাউসটা। আবার বিড় বিড় করতে থাকে, 'শালী রোজ বুক চিতিয়ে যায় তিলিপাড়া। কেন রে, এ পাড়ায় তোর মরদ জুটল না! এতগুলো জোয়ান থাকতে! থুঃ!'

মদন টলতে টলতে অন্ধকারে তার ছেলের ঘাড়েই পড়ে যাচ্ছিল। একটু একটু আলো এসে পড়েছে ছেলেটার মুখের ওপর। কালো মোটাসোটা গড়ন, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। পরম বিদ্রূপে মদন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার ছেলেকে দেখতে থাকে। 'নাঃ, শালা আমারই ছেলে বটে। কি করবি বাছাধন? হাল টানবি না পাউডার মাখবি, অ্যাঁ?' তার কথাটা নিজের কানে ভয়ানক ভালো লেগে যায়। এতক্ষণের থম্‌থমে মেজাজটা হঠাৎ স্ফূর্তিতে জ্বলে ওঠে। মদন প্রবল হাসতে থাকে তারপর তার ঘুমন্ত ছেলেকে প্রচণ্ড ঠোনা দেয়, 'কিবে শালা, বল না?'

ছেলেটা হা হা করে করে কেঁদে উঠল। একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে মদন। তার খেয়াল হয় তার বউ গিয়েছে তেলিপাড়ায় মুড়ি বেচতে। হঠাৎ প্রচণ্ড ধমক দিয়ে ওঠে, 'চোপ্।' এবার তার ছেলের চীৎকারে ঘর উঠোন তোলপাড। হয়তো একটা থাপ্পর কষিয়ে দিত এমন সময় দুহাতে গোবর, খালি গা, খাকি হাফপ্যান্ট পরা একটা আট-দশ বছরের মেয়ে তার গোবরশুদ্ধ হাতে মদনকে ধাক্কা মারে। ধাক্কায় নয় বোধ হয় গোবরের গন্ধে মদনের হুঁশ হয়। 'তুই আছিস বেটি, যাক বাবা!' মদন হাঁফ ছাড়ে। ঘর ছেড়ে আবার দাওয়ার দিকে আসতে থাকে। তারপর চৌকাটে এসে তার খেয়াল হয়। তার খোঁয়ার অনেকটা কেটে এসেছে। ছেলের চীৎকারে আর গোবরের গন্ধে আমেজটা কেটে আসছে। এবার পেছন ফিরেই মদন গট গট করে সোজা চালের হাঁড়িটার কাছে চলে আসে। পায়ের পাতা দিয়ে নাড়া দেয় হাঁড়িটা। এখনো একটু ভার আছে। নিজের মনে মনে মদন বলে উঠল, 'আজ আর বেরুচ্ছিনে বাবা।'

দাওয়ায় নেমে নবীনদের পাড়ায় কলের গানে যে রবীন্দ্রসংগীত আজকাল খুব চলছে তারই এক কলি সে নিজের মতো করে গাইতে থাকে, 'পাগলা হাওয়া শালা বাদল দিলে, শালা বাদল দিলে', ঘরের মধ্যে মেয়েটি এতক্ষণ চাপড়াচ্ছিল মদনের ছেলেকে। সে খেঁকায়, 'চুপ করো।' মদন হঠাৎ চুপ করে যায়। আকাশ ঝলমল করে আলোয়। ফুরফুরে হাওয়া দেয়। মদনের দাওয়ার পাশে অযত্নে গজানো শিউলি গাছটার নীচে ছাই আর গোবরের গাদায় ছিটানো ফুলগুলোর গন্ধ এখনো মরে নি। তার সঙ্গে খেজুরের রসের গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে আছে। কোথায় যেন ঢাক বাজছে।

পুজো আসছে নাকি, না জমির নীলাম? আর এক পাত্তর চাপাবে কি না মদন মনে মনে তাল করছিল এমন সময় গ্যাঁড়া আসে।

গ্যাঁড়ার হয়তো এককালে কোনো নাম ছিল। এখন তা সবাই ভুলে গিয়েছে যেমন অনেকের নাম ভুলে গিয়েছে লোকে বাগ্দী পাড়ায়। বেঁটে খয়া, দাঁতের দুপাটিতে পানেব ছ্যাৎলা, গ্যাঁড়া এসেছে এই সকালে মদনকে পটাতে। যদি কোনোরকমে সে তার বোন টগরের সঙ্গে গ্যাঁড়ার একটা বিয়ে ঘটিয়ে দিতে পারে।

গ্যাঁড়াকে দেখেই মদন অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। 'তোমার হবে না সাফ বলে দিচ্ছি। আমার ওসব হুজ্জোত ভালো লাগে না। মরদ হোস্ তো সোজা গিয়ে বল না।'

গ্যাঁড়া দাওয়ায় উঠে আসে। বাগদীদের মধ্যে তার অবস্থা অবিশ্বাস্য-রকমের ভালো কারণ তার চার বিঘে জমি আছে। বছর দুয়েক হল ক্যানালে জল ছাড়ার পর থেকে সেও আলু তুলছে তার জমি থেকে। ডেভালাপমেণ্টের বাবুদের সঙ্গে যোগাযোগ কবে সার দিয়েছে জমিতে। কিন্তু টগরের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে ভিবমি খায়।

মদন হঠাৎ তার লালচে ধোঁয়াবী চোখ তুলে গ্যাঁড়াব দিকে চায়। 'সিলকেট ব্লাউস দিতে পারবি, গায়ে দিলে গন্ধ ছাড়ে?'

হাবার মতো গ্যাঁড়া তাকায়। 'সিলকেট ব্লাউস সেও জোগাড কবতে পারে। সোনামুখীর ব্যাপাবীদের সঙ্গে তাব যোগাযোগ আছে। কিন্তু ব্লাউস গন্ধ ছাডে এবকম কথা সে আগে শোনে নি। তবে হতেও পারে। রাতারাতি যখন বন কেটে লোহা কারখানা তৈবি হচ্ছে তখন সবই সম্ভব।

'বউয়ের যত্নআত্তি গ্যাঁড়া ঠিক পারবে মদনদা। তুমি একটু বলে করে দাও।' গ্যাঁড়ার বোগা হাত-পা। নীল লুঙ্গির ওপর আনকোরা নতুন গেঞ্জির তলায় ছোট্ট শবীবখানাব সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাকুতি করে।

'বিড়ি দে।' মদন হাত বাড়ায়।

গ্যাঁড়া খুঁট থেকে এক বাণ্ডিল বিড়ি আর দেশলাই মদনের সামনে রাখে। সে নিজে পান ছাড়া কোনো ব্যাপারে আসক্ত নয়। বিশেষ করে খেজুরের রসের মতো সুস্বাদু জিনিসেও তার অনীহা মদনকে মাঝে মাঝে ভয়ানক বিরক্ত করে। আজও তার ভক্তের মতো বিড়ি আর দেশলাই মেলে

ধরায় মদন জ্বলে ওঠে, 'শালা, তোমার দ্বারা কিচ্ছু হবে না। বাপঠাকুর্দা তাড়ি খেয়ে মানুষ। তুই বেটা তাড়ি খাবি না, একটা বিড়িও খাবি না। আমার হাবু যেদিন মাঠে যাবে আধবাণ্ডিল ওড়াবে। তুই মরদ নোস, হিজড়ে হিজড়ে। হাতে তালি মার, ঘুঙুর পরে নাচ শালা।'

গ্যাঁড়ার চোখদুটো করুণ দেখায়। তার এই একটা জায়গায় প্রচণ্ড দুঃখ— তার শারীরিক দুর্বলতা। তার বাপ ম্যানেজার বাউরীর শারীরিক শক্তির খ্যাতি ছিল। পাশের গাঁয়ের জমিদারবাবুদের পাইক হয়েছিল, জমিদারবাবুরা তার সঙ্গে পরামর্শ না করে কোনো কাজ করত না, সেজন্যে গাঁয়ের লোকের মধ্যে ম্যানেজার বাউরী নামে সে চালু ছিল। ঠিক জায়গায় ঠিকমতো লাঠি চালাবার পুরস্কার হিসেবে তিন বিঘে জমি পেয়েছিল গ্যাঁড়ার বাপ। সেই বিশাল লম্বাচওড়া শক্তিমান লোকটার ছেলে গ্যাঁড়া গাঁয়ের আর-পাঁচটা ঠাট্টার মতো একটা ঠাট্টা।

গ্যাঁড়া চুপ করে থাকে তারপর আস্তে আস্তে বলে, 'জন্মের ওপর কি মানুষের হাত আছে দাদা?'

'হাত নেই তো যেখানে সেখানে হাত দেওয়া কেন?' মদনের উল্লাস হয় খর্বাকৃতি লোকটাকে অপদস্থ করতে।

'মরদ হয়েছিস কেন? ঘুঙুর পরে নাচ আর...'

'আমি উঠলাম মদনদা', গ্যাঁড়া উঠে পড়ে।

'বোস।' মদন প্রচণ্ড ধমক দেয়। 'টগর আজকাল সন্ধেবেলা ভিলিপাড়া যায়। কেন যায় তোরা থাকতে? বাউরীর পো মাগীদের পায়ে হাত দিয়ে সাধে না, বুঝেছ শালা। চুলের মুঠি ধরে টান মেরে নিয়ে আসে। পারবি?'

'তুমি রাগ করবে না? তবে শ্যামাপদকে বলি।'

'অ্যাই কোনো শ্যালার কম্ম নয়। তুই বেটা লোক লাগিয়ে আমার বোনের ইজ্জত মারবি?'

মদন আসলে মারাত্মক কিছু লোক না। সে নিজেই জানে সে একটা ঢোঁড়া সাপ। 'বাউরীরা আজকাল সব ঢোঁড়া সাপ হয়ে গেল রে।' মাঝে মাঝে সে খেদ জানায়। কিন্তু হঠাৎ এখন রুখে দাঁড়িয়ে ওঠায় গ্যাঁড়ার কাছে তার মুখচোখ বিকট লাগে। মনে হয় এখনই বুঝি তাকে দু-চার ঘা লাগিয়ে দেবে।

'মদনদা, মেরো না, মেরো না। আমি মরে যাব।' গ্যাঁড়া হঠাৎ ডুকরে

কেঁদে ওঠে। কাঁদতে কাঁদতে বলে যে তাড়িতে তার কোষ্ঠতারল্য হয় সেজন্যে তাড়ি খায় না, বিড়িতে হাঁফ ধরে।

'তবে বিয়ে করবি কি রে শালা। বিয়ে করে গলায় দড়ি দিবি?'

গ্যাঁড়া চলে যাবার পরও মদন উত্তেজিত হয়ে থাকে। আসলে বোধহয় সে গ্যাঁড়াকে ঈর্ষা করে তার চার বিঘে জমির জন্যে। তার বাবারও জমি ছিল না, তার নিজেরও নেই। চার বিঘে জমি থাকলে সে বাবুদের ইস্কুলে যেত। গ্যাঁড়ার মতো নতুন ঘর তুলত, পাকা গোয়াল বানাত। জমি থাকলে বোধহয় বোনটা ওরকম বজ্জাত বনত না। তবে বিয়ে হবার আগে মেয়েরা একটু আধটু রঙ করে। তাতে কিছু ভাবার নেই। তবে মুশকিল বাধে, মারপিট দাঙ্গাও হয়। গ্যাঁড়া সেদিক থেকে ভালো। কিন্তু যতবারই গ্যাঁড়ার সরু সরু হাতের নলি মনে পড়ে ততবারই টগরের পাশে তাকে ভাবতে মদনের মন দমে যায়। তার চেয়ে কালীর সঙ্গেই ঘর করুক টগর। চালের সের যখন চার পয়সা ছিল তখনো তারা পেট চাপড়েছে, এখন যখন টাকা টাকা তখনো পেট চাপড়াবে। মদন গ্যাঁড়ার বাণ্ডিলটা থেকে আর একটা বিড়ি ধরায়। আবার ঝলমলে রোদ্দুরের মধ্যে গুড় গুড় করে মেঘ ডাকতে থাকে। আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে মদন গজরায়, 'সার দেবে, জাপানী কায়দায় ধান বানাবে। তাতে আমার কি রে? আমার তো সেই পাঁচ সিকে।'

মদন এতক্ষণ নজর করে নি। গোবরের গাদার পাশে শিউলি তলায় একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে কিছুক্ষণ থেকে। লোকটার খুব চড়া রঙ, এরকম গৌরবর্ণ লোক মদন বেশী একটা দেখে নি। তাছাড়া এসময় তাদের পাড়ায় এরকম ভদ্রলোকের আবির্ভাব ঘটনা বটে। এখন যেসব হাফ-হাতা বুশশার্টপরা সরকারি অপিচার বাবু যাতায়াত করছেন ইনি সেরকম নন আবার গাঁয়ের ইস্কুলমাস্টার মশাইদের সাম্প্রতিক অভাবী চেহারাও এঁর নয়। জমিদার নয় নিশ্চয়, সৌম্য শান্ত মুখ, দাড়ি থাকলে মিশনের সাধু বলে বোধ হত। মদন ফাঁপরে পড়ে। ভদ্রলোকদের সে ভয় করে। তার জীবনে তিনবার ভদ্রলোক তার উঠোন পাঁড়া দিয়েছে, ঠিক ঐভাবে শিউলি গাছের নীচে দাঁড়িয়ে মৃদু হেসেছে। আর তিনবারই তাদের পাড়ার কোনো সর্বনাশ হয়েছে। প্রথম জন ছিল পাশের গাঁয়ের জমিদারের জ্ঞাতি। মদন

তখন ছোটো। গাঁয়ের সাধারণ মানুষ নাকি তাঁর খুব ভালো লাগত, তাদের নিয়ে সে গল্প লিখত। তারপর দেখা গেল তিনি এসেছিলেন এ পাড়ায় মেয়েমানুষের সন্ধানে। তাঁকে নিয়ে একটা দাঙ্গা মতনও হয়েছিল, কয়েক-জন বাউরীর কয়েদ হয়েছিল। মদন চিত্রার্পিতের মতো শিউলি গাছের তলায় দাঁড়ানো লোকটির দিকে চেয়ে চেয়ে দ্বিতীয় ভদ্রলোকের কথা ভাবে। তিনি এসেছিলেন কোন মিশনের তরফ থেকে, তাদের জীবনের ভার হাল্কা করতে। একটা ফ্রি ডিস্‌পেনসারীও খোলা হয়েছিল। তারপর যেমন ভুতের মতো আবির্ভাব হয়েছিল তেমনি ভুতের মতোই যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল লোকটা। মাঝখান থেকে পাড়ার যে কয়েকজন কমবয়সী লোক আশায বুক বেঁধেছিল তাদের আশা ফুৎকাবে মিলিয়ে গেল। অনেকের মতো সেও মদ্যনিবারণী সভার পাণ্ডা হয়েছিল। সভা ভেঙে যাবাব পর তারা আবো পাঁড হল। তারপর কিষাণ সভার লোকও এল। ইংরেজী জানা ভদ্রলোকেব ছেলেগুলো তাদের সঙ্গে ভাত আর পাটপাতা খেয়ে দিনের পর দিন বেশ কাটিয়ে দিল। তারপর অবশ্য পাশের গাঁয়ে জমি নিযে দাঙ্গা বাধল। গুলি চলল। শক্তিব দাদা মারা পড়ল। তার বউটা এখনো রেলস্টেশনে ভিক্ষে করে। মদনের হঠাৎ খেয়াল হয় ইনি হয়তো ভোটবাবু। কিন্তু গতবছরই তো এরা এসেছিল। সারা বাগদী পাড়ায় উৎসব পড়ে গিয়েছিল, তাড়ির গন্ধে শেষে তাবই মতো নেশাখোরের গা গোলাত। মদনরা গিয়েছিল লরী চেপে নতুন কাপড়-জামা পরে ভোট দিতে কোন এক বাবুকে। সে নাকি মিনিস্টারও হয়েছে। তবে? আবার এসব উপদ্রব কেন? মদন গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। 'তুমি কে নাগর বট?'

লোকটি তেমনি হাসতে হাসতে এগিয়ে আসে। তার হাসি দেখে মদনের হাড়পিত্তি জ্বলে যায়। 'হাবু কোথায়?' লোকটি এগিয়ে আসতে বলে। গেরুয়া পাঞ্জাবী দেখে মদন বিড়বিড় করে, 'শালা কোন কোম্পানি? মিশন না ভোট?'

'হাবু কোথায়?' লোকটি এবার স্পষ্ট করে জিজ্ঞেস করে।

'তাতে তোমার কি?'

'আমার কিছু না, তোমরা সবাই মিলে ঠিক করলে গাঁয়ে ইস্কুল হবে,

ছেলে দেবে। তারপর সব জোগাড়যন্ত্র করা হল। এখন ছেলে না হলে স্কুল চলবে কেমন করে?'

'রাখালীটা তুমি করে দিয়ে যাবে? রাখালী করে দুগণ্ডা পয়সা আনে, এক বেলা খাওয়াটা দেয়। সেটা কেড়ে নেবে?'

ভদ্রলোক মাটির দাওয়াতে এসে বসলেন।

মদন তেড়ে এল, 'তোমাদের মতলব কি বলো তো?...ও দাঁড়াও, তুমি তো ডেবলপমেণ্ট কোম্পানির বড অপিচার গো। তালডাঙ্গায় বক্তিমা দিলে। সোনামুখীতে থাকো না? এখানে কোত্থায় উঠেছ? বড়ো গায়েনদের বাড়ি তো? হ্যাঁ, ও বাড়িতে মাছ পাবে। আমার গাঁয়ে সোনামুখীর মতো ল্যাংচা এসেছে গো। তোমাকে দিয়েছে? ছ্যায় নি? সে কি?'

'খোঁয়ারে আছ মনে হচ্ছে।'

'তোমার বাপের পয়সায় তাড়ি খাই নি বাবু।...তোমরা আসলে কী বাবু? গাঁয়ে একটা ইস্কুল বানালে। সেখানে আমাদের ছেলেদের খেদিয়ে নিয়ে হাজির করেছ—ইংরেজী শেখাবে। প্যাণ্ট পরে আর তোমার মতো পাঞ্জাবী চাপিয়ে বাগালী করবে আমাদের ছেলেরা? কি গো? চুপ করে আছ? একটা চাটাই আছে ঘরে এনে দেব?'

ভদ্রলোক স্থাণুর মতো বসে থাকেন। মদনের কথায় চটেছেন মনে হয় না। কিন্তু কেমন বিমূঢ় হয়ে পড়েছে লোকটা। তিন বছর আগে যখন তিনি এ গাঁয়ে এসেছেন ঠিক এই এক কথা শুনেছেন। গ্রামজীবনের বিপ্লব কমিউনিটি ডেভালাপমেণ্ট প্রজেক্ট, গ্রামে গ্রামে নতুন জীবনের সূত্রপাত, একক বিচ্ছিন্ন কপাল-চাপড়ানো চাষীর বদলে সমস্ত গ্রাম মিলে যৌথ অস্তিত্ব, যৌথ দায়ীত্ব। সোনামুখীর মতো ছোট্ট শহরেও এগুলো শুনতে ভালো লাগে। সবচেয়ে ভালো আগে কলকাতায় বসে মন্ত্রীদের মুখে মুখে শুনতে কিংবা উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা যখন প্ল্যান্-চার্ট-ম্যাপের সাহায্যে ইন্‌স্ট্রাকৃশন দেন। কিন্তু বাউরীপাড়ায় এসে পেটের ভেতরটা কেমন খালি হয়ে যায়।

'বিয়ে থাওয়া হয়েছে না বৈরেগী?'

ভদ্রলোক চুপ করে থাকেন। মদনের ছেলে হাবু ইস্কুলে পড়তে পারে না কারণ সে রাখালী করে আর এক বেলা খেতে পায়। আর

সেই ইস্কুলই টিঁকবে যেখানে একবেলা খাবার ব্যবস্থা আছে। নইলে লেখাপড়া হবে না, তাতে দুঃখ কিসের ?

মদন যেন বুঝতে পারে সোনামুখীর এই অফিসারটির মনের কথা। একটু মায়াও পড়ে। যাই হোক, বাবু তো, কি মতলব আছে, ভগবান জানে। তবে জমিদার পাইক নয়, ভোটের জন্যেও আসে নি। কিন্তু পরক্ষণেই মদনের সন্দেহ হয়। বলে, 'আচ্ছা বাবু, একটা কথা বলো তো, তোমরা ভোটের লোক ?'

'না বাপু, আমরা ভোটের লোকটোক নই। কেন, আমাদের লোকজন তোমাদের এখানে কিছু বলে নি ?'

'ট্যাক্সর লোক ?'

ভদ্রলোকের মুখ বেজার হয়।

'তোমাদের মতলবটা কি বল বটে। ট্যাক্স লিবে না, ভোট লিবে না, তবে কি লিবে ?' তার কাঁচাপাকা দাড়িব খোঁচা ভর্তি গাল ভরে হঠাৎ হাসি ফোটে। মেয়েমানুষের সাধ আছে ? বলো-না বাবু, লজ্জা কি গো !' তারপর আগন্তুকটিকে মদন সহানুভূতি দেখায়, 'বয়েস হলে দাড়ি গজায় তাতে লজ্জা কি বাবু ? দেখে মনে হচ্ছে মাগ-উদাসী মন বাবু তোমার।'

লোকটি উঠে পড়ল। মদন বললে, 'কি গো, উঠে পড়লে, চটে গেলে বাবু ! তা আমরা ঐরকম, তোমার ইস্কুলে পড়ি নি তো। গোরুর চারটে ঠ্যাং আছে, বলি ! দুটো ঠ্যাং কেমন করে বলি বাবু, যা দেখি নি কেমন করে বলব ! তোমরা হাবুকে শেখাবে গোরুর দুটো ঠ্যাং। সেটা শিখলে তো আর রাখালী শিখবে না।'

'তুমি তাহলে আর ছেলেকে পাঠাবে না ইস্কুলে', লোকটি শেষ চেষ্টা করে। মাস্টারী সুলভ গাম্ভীর্য দেবার প্রযাস আনে গলার স্বরে কিঞ্চিৎ অবসাদের সঙ্গে। তার আদর্শবাদী মুখের দেদীপ্যমান ভাবখানা মদনের আস্তানায় আধঘণ্টা থাকার মধ্যেই টাল খেয়ে গেছে।

কিন্তু মদনের বলতে গেলে এতক্ষণ পর মেজাজ খুলল। সে এখন বাউরী-পাড়ার ছোটোখাটো সুখদুঃখের কথায় তেমন মজা পায় না। তার এখন মজা লাগে বাবুদের সঙ্গে সমানে সমানে টক্কর দিতে। এরকম সুবিধে তো

সবসময় পাওয়া যায় না। এরকম একটা শুভ মুহূর্ত এসেছিল। সেটা এখন হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে।

'কোথায় যাবে বাবু? গায়েনপাড়া তো দু' মাইল। এখন রোদ চড়ছে, বসেই যাও বাবু। আমার আজ মাহিন্দারি নেই, খাওয়াও নেই। তুমি থাকলে বাবু বউটা উনুন ধরাবে। দু মুঠো চাল যদি আনতে পারে তবে মুলোর শাক···কি গো উঠেই পড়লে!'

লোকটি উলটোমুখে হাঁটতে শুরু করল। আর মদনের পুলক জাগে তার পলায়নে! 'এসো-না, পুকুরে গিয়ে দিব্যি চ্যান্ করি। ভাত না খাও এক পাত্তর···'

'কি গো পালালে···বা শালা!' পলায়মান ভদ্রলোকটির পেছনে পেছনে যেতে মদনের গলা দিয়ে বিকট আওয়াজ বেরোয়।

॥ চার ॥

খালের জল নামছে। উত্তরে হাওয়া দিতে শুরু করতেই শালীও শুকোতে আরম্ভ করেছে। বাসের রাস্তা পার হয়ে বরাবর যে বাঁধ গিয়েছে তার মাইলখানেক পার হলেই, খোয়াইয়ের শেষে পানকৌড়ি উড়ছে বিস্তীর্ণ আমতলির ঝিলে। কোনোদিন এখানে মস্ত আমবন ছিল। এখন একটা গাছও চোখে পড়ে না। শুধু খোয়াই শরবন। অনেককাল আগে এখানে এক সৌখীন ইংরেজ এসেছিলেন বেড়াতে। স্ত্রী হার্টের অসুখে টপ্ করে মারা যাবার পর সে সাহেব শাজাহানের মর্মর সৌধের মতো এ অঞ্চলে বিস্তীর্ণ এক বাগান বানান। এখানে এসে তিনি তাঁর স্ত্রীকে নির্জনে স্মরণ করতেন কিংবা পাখি শিকার করতেন এ নিয়ে মতান্তর আছে, কিন্তু সে স্মৃতির কিছুমাত্র আর অবশিষ্ট নেই। শুধু কয়েকটা মরকুটে সোনাঝুরি এখনো এক জায়গায় ঝাঁক বেঁধে আছে। তাদের ডাল থেকে লম্বা লম্বা হলদে ফুলের নোলক এখনো হাওয়ায় দোলে।

মদনদের গাঁ থেকে চোখে পড়ে পিল্ পিল্ করে পিঁপড়ের মতো বাউরীদের মেয়েরা বাঁধ থেকে নামছে। তাদের কারো হাতে ঝুড়ি, কারো কাঁধে

পোলো। দু-চারজনের হাতে খ্যাপলা জাল। গেরিমাটির গা থেকে কালো কালো বিন্দুগুলো জলের চারপাশ বেড়ে নামছে।

তাদেব আলাপ হাওয়ায় ভেসে আসে। আদিবাসী মেয়েদের বিশেষ করে এ অঞ্চলের সাঁওতাল মেয়েদের কাজের ফাঁকে ফাঁকে যেমন কলকল কলকল জলের শব্দের একটানা সুরেলা আওয়াজ ওঠে—বাউরী মেয়েদের কথাবার্তায় সেই আওয়াজ নেই। হঠাৎ নিস্তব্ধতা খান্ খান্ হয়ে যায়, 'দূর মাগী, ধামসী! তুই পারবি না! তোর গতর লড়ে না। টগর, চাপা দে, চাপা দে!'

যে মেয়েটাকে ডাকা হল তাব বয়স কম, মজবুত চেহারা। কালো পুরুষ্টু গডন। হাঁটু অবধি গেরুয়া কাদার সঙ্গে লেপ্টে আছে তার গায়ের ধুলোয রাঙানো কাপড। ক্ষিপ্রগতিতে সে হাতের পোলো নিয়ে এগিয়ে আসে। জল এখনো এদিকটায় তেমন নামে নি। অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটা বক তার প্রিয় জায়গা ছেড়ে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে উড়ে যায়। চামারদের শুয়োরটা শরবনে এতক্ষণ কাদা শুঁকছিল। সে বেরিয়ে পড়তেই পেছনের কযেকটা ছুঁড়ি সোরগোল তোলে।

'দ্যাখ্, দ্যাখ্, কি গত রওয়ালা ট্যাংরা', গ্যাঁডার দিদি ফের চেঁচিয়ে উঠল। এক ঝাঁক সরেস ট্যাংরা শরবনেব ভেতর থেকে বেরিয়ে গভীর জলের দিকে এগোচ্ছে।

'কি রে টগর, হাঁ কবে কি দেখছিস?'

'ভিমরতি!' টগর জল থেকে উঠে আসতে আসতে বলে। তারপর বারো-তোরো বছরের যে মেয়েটা তার পাশে একমনে গুগলি কুড়োচ্ছিল তাকে ডাকে। মেয়েটা টগরের সঙ্গে ঢোকে শববনে গামছা নিয়ে। শরে হাত ছড়ে টগরের। জলে একটা অর্ধচন্দ্রাকার বেড দিয়ে তারা ডাঙার দিকে উঠে আসে। অতবড়ো ঝাঁকটার অনেকখানি বেরিয়ে গেছে। কিন্তু তবু হাতখানেক জলের ভেতর থেকে দেখা যায় ছ-সাতটা বড়ো জাতের ট্যাংরার সঙ্গে দু-তিনটে চিংড়ি উদ্ভ্রান্তভাবে ছুটোছুটি করছে।

'টগরের কপাল ভালো,' কালোর মা সখেদে বলেন।

গামছাটা ওপরে তুলেই মুঠো চালিয়ে তুলতে চায় মেয়েটা, সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ় হাতে হাত চেপে ধরে টগর। গ্যাঁড়ার দিদি চেঁচিয়ে উঠল, 'গ্যাল, গ্যাল!'

সঙ্গে সঙ্গে একপাশ কাৎ হওয়া গামছা থেকে নীচে পড়েই মাছগুলো অদৃশ্য হয়। হাতে চেপে থাকা দুটো মাছ তার সঙ্গিনীর মুখে অকস্মাৎ ঠুসে দিতে দিতে টগর চেঁচিয়ে উঠল 'খা, খা।' মেয়েটা টগরের ঠেলায় পিছলে পড়ে, তারপর গাঁ গাঁ করে কাঁদতে থাকে।

চিল পাখসাট খায়। রোদ বাড়ে। বাউরী মেয়েদের গায়ের অনাবৃত অংশ রোদ্দুরে চিটমিট করে। মুখ আরো তামাটে কালচে দেখায়। এবার ধোপাদের পাতিহাঁসগুলো শরবনের গভীরে ঢুকে পড়ে। পানকৌড়ি, বক, কাদাখোঁচা একে একে উড়ে যায়। সকালবেলার মৃদু বাতাসে শান্ত ঝিলের পাশে মেয়েদের কথা, গুগলি তুলতে তুলতে ছোটো ছোটো মেয়েদের ছুটোছুটি সমস্ত ছাপিয়ে এখন একটা রুক্ষ পরিশ্রমের ছবি ফুটে ওঠে। হাত-পাগুলো যন্ত্রের মতো চলে। ক্রমান্বয়ে তিন ঘণ্টা পরিশ্রমেও বিশেষ পড়তা থাকে না মেয়েদের। প্রত্যেক ঝুড়িতে সামান্য কটা চিংড়ি আর পুঁটি।

এমন সময় টগর পিঠ চিতিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। ঘামে ভেজা চুলগুলো লেপ্টে আছে কপালে। বাহার করে একটা টিপ লাগিয়েছিল, সেটা গলে গেছে। হাঁটু আর কনুই পর্যন্ত কাদা। তার সঙ্গিনী কিছুক্ষণ কাঁদাকাটা করার পর আবার গুগলি তুলছে। টগর তার হাত ধরে পোলো ঝোলাতে ঝোলাতে বাঁধের ওপর উঠতে থাকে।

'কোথায় চললি পোড়ারমুখী?' পেছন থেকে কালোর মা ডাক দেয়।

'এখানে দিনটা কাটালে হবে?' মুখ না ফিরিয়ে টগর জবাব দেয়।

মেয়েরা এবার দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। বিশেষ করে প্রবীণারা, গ্যাঁড়ার দিদি, কালোর মা, ঝিলেই মাছ ধরতে থাকে। আর টগরের নেতৃত্বে পনেরো-বিশটা কমবয়সী মেয়ে বাঁধ থেকে আরো আধমাইল এগিয়ে যায় সরকারি সেচবিভাগের মজা পুকুরে। যেতে যেতে টগর বললে, 'আমাদের পাড়ায় এক বাবু এয়েছে, সে বুকের ফটো নেয়।'

'বুকের ফটো নেয়,' পেছনের মেয়েগুলো হাসিতে ফেটে পড়ে। 'হ্যাঁ, কালোর মায়ের ওখানে বলেছে। আমাদের এখানেও আসবে।'

'কে এমন বুকের ডাক্তার গো। আমার বুক যে কন্‌কন্ করছে তোমার কথা শুনে,' টগরের এক সম্পর্কের পিসী বললে।

'সে ডাক্তার নয়,' টগর মাথা নাড়ায়।

'তবে ? কি মতলবে এয়েছে ?'

'সে বলছে সরকারি লোক নয়, ভোটের লোক নয়, ডাক্তারে যেমন বুকের ফটো নেয় তেমনি আমাদের...

টগরের কথাগুলো গুলিয়ে যায়। সুব্রত দুদিন আগে কালোরমার বাড়িতে বুকের ফটো তোলার উপমা দিয়ে বুঝিয়েছিল সে এসেছে ডাক্তাদের রোগ নির্ণয়ের মতো গাঁয়ের সঠিক অবস্থা জানতে। 'কি জানি বাপু, ওঁদের কথা বুঝি না,' টগর তার হাতের ডানা ঝাঁকি দেয়। হাত পাল্টে পোলা নেয় অন্য হাতে।

এবার তারা একটা অর্ধসমাপ্ত পুকুরে নামে। পুকুরটা সরকারি সেচ-বিভাগের তরফ থেকে বছর তিনেক আগে কাটা শুরু হয়েছিল। তারপর কি কারণে কাটা বন্ধ হয়ে গেল গাঁয়ের লোক তা জানে না। এক হাঁটু কাদায় টগরের দল খলসে আর ঝিঁঝে কই ধরতে থাকে। উৎসাহে টগরের চোখ নাচে। একবার পা হড়কে পোলো শুদ্ধ কাদায় গড়িয়ে পড়ে। কনুই দিয়ে গালের কাদা পোঁছে। চোখের পাতায় তার কাদা, কিন্তু চোখদুটো আনন্দে জ্বলজ্বল করে। উঁকি মেরে দেখে তার কাদামাখা ছোটো চুবড়িটার প্রায় আর্ধেকটা সবুজ আর লালের নকশাকাটা ঝলমলে খুদে মাছে ভরে গিয়েছে। মেয়েগুলোর মাজা ধরে যায়, পরিশ্রমে হাঁপায়। ঘামে কাদায় কাপড় গায়ে সেঁটে থাকে। কারো চুল সামলাতে চুলে কাদা লাগে। টগর হাতের পাতা আড়া দিয়ে সূর্যের দিকে তাকায়। ঝলমলে নীল আকাশে আলো চোখ ধাঁধায়। মাথার ওপর খাড়া সূর্যের দিক থেকে চোখ ফেরাতে ফেরাতে টগর হিসেব করে— সূর্য আর একটু এদিকে থাকলে অন্তত বারো-আনায় বেচতে পারত মাছগুলো। কিন্তু এখন বাসতলায় বাজার উঠলেও আট-আনা নির্ঘাত সে পাবে। আট-আনায় কী আনবে ? দু পয়সার নুন, দু আনার তেল, বাকিটুকু চাল ? তাহলে একটুকরো সাবান কেনার যে সাধ ছিল তার কি হবে ? অনেকদিন তারা মাছ খায় নি। চুবড়িটা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে এক খাবলা মাছ নিজের অজান্তে সে কখন তুলে রাখছিল কুচুপাতায় আলাদা করে রাখবে বলে। তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আবার চুবড়ির মধ্যে সেগুলো রেখে দেয়। পিঠ টান করে দাঁড়ায় টগর। দূরে বাঁধের ওপর দিয়ে কালোর মা-রা ফিরছে।

॥ পাঁচ ॥

দুদিন সুব্রতর একটা চিঠি পড়েছিল সোনামুখী পোস্ট অফিসে। তিনদিন হল শালী নদীতে জল বেড়েছে। একখানামাত্র চিঠির জন্যে জল সাঁতরে গাঁয়ে যেতে পোস্টপিওন গররাজী। দিন-দুই পর জল কমলে চিঠিটা গাঁয়ে পৌঁছল।

এ দুদিন বাড়ি থেকে বেরোতে পারে নি সুব্রত। শুধু জলকাদার জন্যে নয় কারণ এ অঞ্চলের কাদা মারাত্মক নয়। অন্তত একটা ব্যাপারে কমিউনিটি ডেভোলাপমেন্ট ব্লকের কাজ প্রশংসনীয়। অনেকগুলো রাস্তা বেরিয়েছে গাঁয়ের ভেতর দিয়ে। নুড়ি সুরকি না পড়ায় ইতিমধ্যেই অযত্নের ছাপ কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রকট হলেও মোটের ওপর গাঁয়ের লোকেরা আল ছেড়ে রাস্তায় হাঁটতে শুরু করেছে। মানুষের এই অর্থনৈতিক অবস্থার সামান্য হেরফের, তার অভ্যাসের কিছু পরিবর্তন সুব্রতর কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। আগে রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে এই ছোটোখাটো পরিবর্তন চোখে পড়ত না। কিন্তু এখন এদিকে তার নজর প্রখর। গত দুবছরের সংখ্যাতত্ত্বের কাজও সুব্রতকে এই খুঁটিনাটির দিকে আরো টেনেছে।

গাঁয়ে আসার পর ছ-সাতদিনে পঁচিশ ঘর পরিবারের খোঁজখবর নিয়েছে সুব্রত। সে যেখানে আছে তার গা দিয়েই ঘরগুলো। এখানে প্রায় প্রত্যেক ঘরে সে দেখেছে সাইকেল। বাড়িতে টাইম পিস্ ছাড়াও কারো হাতে ঘড়িও দেখেছে। নবীন তো তার ট্র্যানজিস্টর রেডিও মারফত গাঁয়ে প্রায় বিপ্লব এনেছে। কুয়োতলায় মহিলামণ্ডলে, বাসতলার নতুন লেংচা রেস্টুরেন্টের খোড়ো ঘরে, এমনকি সন্ধ্যায় আখমাড়াইয়ের কলে গিয়ে টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইংরেজী আনুপূর্বিক বিবরণ, রবীন্দ্রসংগীত, মায় আধুনিক কবিতার মজলিশও সে শুনিয়ে এসেছে। এতে কি হচ্ছে ভগবান জানে! আগের মতো সুব্রত এসব ব্যাপারে তাড়াতাড়ি কোনো সিদ্ধান্তে আসতে রাজী নয়।

উপসংহার সে টানবে কিন্তু আজ নয়, দু বছর পর যখন সে আবার এই গ্রামে ফিরে আসবে। এখনকার তথ্য এবং তখনকার তথ্য মিলিয়ে সে গ্রামজীবনের পরিবর্তনের ছবি আঁকবে যাতে তার সত্য অনস্বীকার্য হয়। সে যদি তার সমাজ এবং দেশের রাজনৈতিক কাঠামো পাল্টাতে নাও পারে, যদি তার দেশের সম্পর্কে তথ্যই জোগাড় করে যায় তাহলে কি সেটা খুব হেলাফেলার কাজ হবে? সুব্রত এই ধরনের চিন্তাতেই বস্তুত এই তথ্য-সংগ্রেহের কাজে মেতেছে।

সকাল এখনো মেঘলা। কদিনে আকাশে যে ঝলমেলে ভাবখানা ছিল তা নেই। সুব্রত দাওয়ায় তক্তপোষখানায় এসে বসে। সামনে দুটো বেঁটে ঝাপড়া কাঁঠাল গাছের নীচে ছায়া বেশ ঘন। সেখানে শুকনো কাদামাখা পাতাগুলোর পাশে চিমড়ে একটা পেঁপে গাছের নীচে এক ফালি জমি। পুরুষ্ট পাটকেলি একটা মোরগ তার লাল ঝুঁটি নাচিয়ে মাটি থেকে খুঁটে খুঁটে পোকা খাচ্ছে। সুব্রত দাওয়ায় বসেই ঘামিতে শুরু করে। হাওয়া নেই, বোধহয় আবার বৃষ্টি নামবে।

গাঁয়ের এই চুপচাপ ভাবখানার সঙ্গে সুব্রত এখনো নিজেকে ধাতস্থ করে নিতে পারে নি। কুচবিহারে যখন প্রথম বেরিয়েছিল 'গাঁয়ের লোকের বুকের ফটো নেবার জন্যে' তখন ছিল অঘ্রান মাস। এক সম্পন্ন চাষীর টালিতে-ছাওয়া বাইরের কোঠাঘরে সে থাকত। তার ঘরের নীচেই ধান ক্ষেত। ধান ক্ষেতে হাওয়া দিলে যে অবিশ্রাম শব্দ ওঠে পড়ে সে সম্পর্কে তার ধারণা ছিল না আগে। এখন এই শব্দে চারপাশের নৈঃশব্দ্য যেন আরো ভারাক্রান্ত হয়ে উঠত। সে-জায়গা ছেড়ে গাঁয়ের বাজারের কাছে অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন জায়গায় একটা কাঠের বাড়ির দোতলায় উঠে গিয়েছিল। নীচে ছিল সস্তা হোটেল। একটু দিশি মদের ও ব্যবস্থা ছিল। সকাল থেকে মাঝরাত পর্যন্ত খদ্দেরদের আলাপ চীৎকার আর রাত্তিরের দিকে ভাঙা-গলায় হিন্দী ফিল্মের গান ভেসে আসত। কিন্তু তাতে সুব্রতর ঘুমের ব্যাঘাত হত না। ধানক্ষেতের শব্দে বরং তার ঘুম আসত না।

এ গ্রামটা সেদিক থেকে ভালোই লাগছে। চুপচাপ খুবই কিন্তু গত দুদিন খুব হৈহৈতে কেটেছে। একজন গ্রামসেবকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে সুব্রতর। বরিশালের প্রাইমারি স্কুলের মাস্টার ছিল লোকটা। তারপর কয়েকবছর

এসপ্ল্যানেডে লজেন্স বিক্রি করেছে। ব্লকে বছর দুয়েক হল লেগেছে। গান বেঁধেছে রাস্তা বাঁধার। সুব্রত একটা সিগারেট ধরায়। বাড়ির ভেতর থেকে মদনের ছেলে হাবু কাঁসার বাটিতে করে চা আর কাঁদাউঁচু থালাভর্তি মুড়ি নারকেল রেখে যায়। তারপর তার কোঁচড়ের ভেতর থেকে একটা মোড়ানো খাম তক্তপোষের এক কোণে রেখে বলে 'বাবু আপনাকে দিতে বললে।'

'বাবু কোথায়?' সুব্রত ভুরু কুঁচকে দোমড়ানো খামটার দিকে এক নজর চায়। আবার কলকাতা তার করাল হাত বাড়িয়েছে তাকে টেনে নেবার জন্যে যেমনভাবে সমস্ত পশ্চিম বাংলাকে গিলে ফেলেছে গত কয়েকটা বছরে, একটা প্রকাণ্ড অজগরের মতো। আবার গিলে হাঁসফাঁস করছে। সুব্রত আঁচ করে ওটা নির্মলের চিঠি। নিশ্চয় তাদের কলেজের কোনো কেচ্ছার কথা জানিয়েছে কিংবা তার বাবার নতুন বাড়ির কথা অথবা সুব্রতর গ্রামে আসা নিয়ে ঠাট্টা। হঠাৎ সে নির্মলের ওপর তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে। সে তার কাকাকে বুঝতে পারে, এমনকি তার নিজের বাপকেও, কিন্তু নির্মলকে একদম না। এরকম দু-নৌকোয় পা দিয়ে চলা সে বোঝে না, বুঝতে চায়ও না। যদি সে একটা সোজা চাকরি করতে চায় করুক। তার জ্যাঠামণির সঙ্গে দহরম মহরমের মাত্রা যদি বাড়িয়ে দেয় তাহলেই তো সিধে সড়ক। 'মেটাল বক্স', 'বার্মাশেল', 'বার্ড' কোথাও না কোথাও একটা মোটামুটি ভালো চাকরি হয়ে যাবে। নিদেনপক্ষে কোনো দৈনিক কাগজের সহকারী সম্পাদকটাও তো হতে পারে। কিন্তু তাকে টানা কেন? সে নিজে আট-দশ বছর আগে ছাত্র-আন্দোলন করে পুলিশের ঠেঙানি খেয়ে যে রাজনীতি করেছিল সে ধরনের রাজনীতি আজ করে না, করবেও না। কিন্তু তাই বলে ফোতো কাপ্তেন সে হতে পারবে না। সুব্রত একটানে খামটা ফরফর করে ছিঁড়ে ফেলে। নির্মলের চিঠি :

> সেদিন আমাদের কলেজে সুনীলের টি পার্টি হয়ে গেল। বেচারী ডি.ফিল.-টার জন্যে বড্ড হামলাচ্ছিল। বরেনকে বলেছিল, দুশ্চিন্তায় চুল পাতলা হতে শুরু করেছে। এখন তাকে চেনা দায়। টাই পরে ছবি তুলেছে বাংলা কাগজে। ডি.ফিল. হলেই পঞ্চাশ টাকা মাইনে বাড়ির প্রস্তাবটা এ মাস থেকেই চালু

হয়েছে। স্থনীল দিলদরিয়া। এন্তার কাটলেট আনাচ্ছে। বরেনের ডি.ফিল. পার্টিতে সেই পচা প্যাস্ট্রির কথা মনে আছে?'

তুই বেশ দেখালি যা হোক। দশ বচ্ছর রাস্তায় নেমে চেঁচালি 'চলবে না, চলবে না' তারপর যখন তোর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরাও বিপ্লবে নামব ভাবছি তখন তুই কাট মারলি। আর ইকনমিক্স ভো পরম ব্রহ্ম। জ্যাঠামণি যে তোড়ে অ্যাসেম্‌ব্লিতে সংখ্যাতত্ত্ব পরিবেশন করেন তাতে ধারণা হয়েছিল সংখ্যাতত্ত্বে তোর অ্যালার্জি হবে। শেষকালে তুইও সংখ্যাতত্ত্বের কাজ বৈপ্লবিক কাজ বলে রাজনীতি থেকে মুখ ফেরালি? কলেজে বলাবলি করছে যদি প্ল্যানিং কমিশনে দরখাস্ত করিস তাহলে তোর যা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ড আর কয়েক বছরের ফিল্ডওয়ার্ক—সব মিলে একটা মোটা মাইনেব এক্সপার্ট বনে যাবি। আমি সীরিয়াস্‌লি বলছি। বেশীর ভাগই তো ভুসি মাল। তোর মতো ছেলেদের খুব চাহিদা। আমি তো কলেজে তোকে একটা ছোটোখাটো জীনিয়াস্‌ বলে চালাই।

মাঝে মাঝে মনে হয় আমরা দু-জনে কি আবার আমাদের বাপ-জ্যাঠার ভূমিকায় নামব? বাবার যত বয়স বাড়ছে ততই তাঁর আদর্শবাদ ভোঁতা হবার বদলে চোখা হচ্ছে। কখনো কখনো ভয় হয় মেরেই বসবেন বুঝি আদর্শের ঝোঁকে। শরীর ততই খারাপ হচ্ছে। বিনেপয়সার রুগীর ভিড় বাড়ছে আরো। আর যখন হাঁফ ধরে তখন বালিগঞ্জ প্লেসে যাই। বুলবুলির সঙ্গে ব্যাগাটেলি খেলি। আর দেখি জ্যাঠামণি উত্তরোত্তর খ্যাতির শিখরে উঠছেন। আমরাও কি এই দুই বিপরীত পথেই হাঁটব?

স্থব্রত চিঠির আধখানা খামে পুরে তক্তপোষের কোণে ছুঁড়ে দেয়। তারপর ভুরু কুঁচকে চীৎকার করে, 'কই তোর বাবু কোথায়?'

ছেলেটি চমকে উঠে বললে, সে তো আগেই বলেছে সোনামুখীর এক দাড়িওয়ালা বাবু এসেছে। তার সঙ্গে আছে। ব্যাখ্যা করলে, 'খুব সোন্দর, গোরা, অপিচার বটে।'

'আমাকে জাগালি না কেন?'

'আবার আসবে ঘুরে। আমাকে বললে ইস্কুলে যেতে। ব্লক বাবু তো। অমনি বলে।'

'যাস না কেন?' চিঠিটা পড়ে যে বিরক্তি জমেছে তার মনে সুব্রত এখনই তা উদ্গার না করতে পারলে প্রাণে শান্তি পাচ্ছে না। 'কিরে জবাব দিচ্ছিস না কেন? হাবা হয়েই থাকবি? লেখাপড়া শিখবি না?'

ছেলেটি আরো কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বলে, 'বাবা বলে···'

'কী বলে মদন?'

'বাবা বলে আমরা হাবা, হাবাই থাকব।'

'কেন?'

সুব্রতর তীক্ষ্ণ স্বরে ছেলেটিকে বিশেষ বিচলিত দেখায় না।

'চালাক হলে পেট চলবে কি করে বাবু? একবেলা খেতে দিলে ব্লকবাবুদের কথা শুনব।' ছেলেটি গোটা ছুটো বাক্য গড়গড় করে বলে গেল।

'তুই এখন যা' সুব্রত আবার সিগারেট ধরায়। এখনো সস্তা ব্র্যাণ্ডে নামতে পারছে না ভেবে তার মেজাজ খিচড়ে যায়। সে বুঝতে পারে বৃষ্টি নামলে আরো মেজাজ খারাপ হবে। কিছুক্ষণ ধরে ঝুঁটি-খওয়া একটা কুচকুচে নধর কালো মুরগী মোরগটার পিঠ চুলকোচ্ছিল ঠোঁট দিয়ে। সেদিকে একটা ঢিল মেরে সুব্রত উঠে পড়ল। উঠতেই চোখে পড়ে মুখার্জীর সঙ্গে ফিরছেন হাবুবর্ণিত সেই দাড়িওয়ালা ব্লকবাবু। সুব্রত চমকে উঠল। আরে, এ যে নিতাই। সুব্রত চীৎকার করে ওঠে, 'নিতাই!' এতক্ষণ যে অবসাদের ঘোর নেমেছিল সে এক চীৎকারে তা কাটিয়ে তোলে।

'তুমি এখানে কি মনে করে ব্রাদার?' সুব্রত এগিয়ে যায়।

'আমারও তো সেই প্রশ্ন,' প্রশান্ত ভদ্রলোকটি বললে। আমি এখানে ব্রক ডেভালাপমেন্টের কর্তা। তুমি কলেজে ছিলে না?'

'হ্যাঁ, সেটাও আছে। এখানে এসেছি একটা ইকনমিক সার্ভেতে।'

নিতাই উৎসাহিত হয়ে বললে, 'ভালোই হল। আমাদের কাজে তোমাদের মতো লোকের দরকার সবচেয়ে আগে। আমাদের ক্যাম্পে এসো আজ সন্ধেবেলা, দিল্লী থেকে আমাদের বড়ো কর্তা মিস্টার দে আসছেন।'

'তোমরা ব্যাপারটা কী করছ বলো তো?'

'ব্যাপারটা ঠিক কী তা এখনো ধরতে পারছি না। বোধহয় মিস্টার দে ভালোভাবে বলতে পারবেন। তুমি এসো ঠিক—এখন আমার তাড়া আছে। আরো দু-একটা জায়গায় যেতে হবে।'

তারপর কথা থামিয়ে হঠাৎ লোকটা সুব্রতর আপাদমস্তক একবার দেখে নেয়। যেন তাকে বলা যায় কিনা ভেবে এক মুহূর্ত ইতস্তত করে। চোখদুটো তার বেশ বড়ো আর চোখের পেছনে কি পদার্থ আছে বোঝা না গেলেও এক দৃষ্টিতে সে যখন চেয়ে থাকে তখন বেশ জাঁকাল দেখায়। সুব্রতর মনে হচ্ছিল আর একটু রঙের জেল্লা থাকলে আর সের দশেক ওজন কমালে "বাল্মীকি প্রতিভা"-অভিনয়কালীন যুবক রবীন্দ্রনাথের মতো দেখাত নিতাইকে।

তার দ্বিধা কাটিয়ে নিতাই বললে, 'তুমি জানো কি না জানি না। মিশনে ঢুকেছিলাম। এই টাকা পয়সা বাড়ি গাড়ি—এর থেকে দূরে থাকব ভেবেছিলাম। দেখলাম, ওখানে ঐগুলোই আছে, আর কিছু নেই। তারপর এ লাইনে এসেছি। যদি সত্যিই ইচ্ছে থাকে, অনেক কিছু করবার আছে এখানে।...তবে ঠিক বুঝতে পারছি না...। যদি কয়েকটা রাস্তা আর ইস্কুল বাড়ি তৈরির জন্যে আমাদের রাখা হয়ে থাকে তবে পি.ডবলিউ.ডি. কী দোষ করল? তুমি এসো কিন্তু। কথা হবে।'

॥ ছয় ॥

গাঁয়ের একমাত্র কোঠাবাড়ি মুখুজ্জের সদ্যনির্মিত টিনের চালওয়ালা পাকা তকতকে গোয়ালে সভা হয়। দুটো পেট্রোম্যাক্সের আলো লালনীল কাগজের ছিকলি, খোলকরতাল নিয়ে গানের পার্টি সব মিলে জাঁকাল পরিবেশ। নবীন আর তার সাকরেদরা পাখসাট খাচ্ছে বুকে ব্যাচ্ লাগিয়ে। একটা ছোটা ডায়নামো ভট্‌ভট্ করে আওয়াজ দিচ্ছে। সেখানে বাগদী লোহার চাষীর ভিড়। গ্রাম প্রায় ভেঙে পড়েছে। নতুন চুনকামের গন্ধে, চাপা গরমে গলগল করে ঘামছে লোকগুলো। সুব্রতর মনে হল এখনই বুঝি হারানো ছেলের জন্যে আর্তনাদ সুরু হবে মাইকে:

বুলু, তোমার কাকা আমাদের অফিসে অপেক্ষা করছে। ধুতির চাঁদোয়ার তলায় মিষ্টি, চা, পানের দোকান— পাখা বেলুন বিক্রি হচ্ছে। একজন ব্যাপারী যে সস্তা বিস্কুট, কটকটে সবুজ লাল লজেন্স আর 'খোকা খেলবে পাখী, খুকু খেলবে পাখী' খেলনা নিয়ে কেঁদুলী থেকে শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলা পর্যন্ত সর্বত্র দোকান দিয়ে বেড়ায়, সেও দু-চারটে তোরঙ্গ খুলে বসেছে। দুজন বাউলও গাঁজার কলকেতে দম দিচ্ছে। সভা সুরু হলেই হয়।

একেবারে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় মিঃ দে সভায় ঢোকেন। হাতে জড়ানো জরিমোড়া বেলফুলের মালা। সঙ্গে নিতাই, কমিউনিটি ব্লকের এক বড়ো অফিসার, কলকাতার কোনো বিখ্যাত দৈনিকের বিশেষ প্রতিনিধি, সোনামুখীর উচ্চপদস্থ সরকারি ও পুলিশ কর্মচারী। আসার সঙ্গে সঙ্গে হৈ হৈ পড়ে যায়। মিঃ দে তাঁদের জন্যে সামনে রাখা চেয়ারে না বসে শতরঞ্চিতে বাগদী-চাষীদের মাঝখানে পা দুমড়ে বসে পড়েন। সরকারি কর্মচারীরা ইতস্তত করেন। খবরের কাগজের বিশেষ প্রতিনিধি চেয়ারে বসেই উঠে পড়েন। অনেক ইশারা সত্ত্বেও পাশ থেকে চাষীরা একে একে দাঁড়িয়ে উঠল। নিতাই গলদ্ঘর্ম।

মিঃ দে তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন। 'উড্ ইউ শেয়ার মাই বার্ড্‌ন?' বলে গড়ে ফুলের মালাটা সংবাদপত্রের প্রতিনিধির দিকে ছুঁড়ে দিলেন। সে ছোকরা 'থ্যাঙ্কস্' বলে সেটা লুফে নিল। তারপর নেহরু যেমন অপরিসীম আত্মবিশ্বাসে দুঃশীল জনতার মাঝখানে নিজেকে ছুঁড়ে দিতেন তেমনি আত্মবিশ্বাসে চাষীদের কাঁধ ধরে ধরে কখনো হেসে কখনো ধমকে তাদের বসিয়ে দিতে লাগলেন। খালি-গা লোকগুলো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বসে পড়তে আরম্ভ করল। তারপর ভদ্রলোক রুমাল বার করে চশমা মুছলেন। হাসিমুখে যখন এবার শতরঞ্চি ছেড়ে চেয়ারে এসে বসলেন তখন নিতাই কেন ব্লকের অন্যান্য কর্মচারীরা সকলেই তাঁর দিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে তাকিয়ে থাকে।

উদ্‌বোধন সংগীত কি হবে তাই নিয়ে গানের দুই দলের একটুক্ষণ আগেই বচসা হয়ে গেছে। একদল বাঁয়াতবলা নিয়ে উচ্চাঙ্গ সংগীত চর্চা করেন গাঁয়ে। তাঁরা একটা ধ্রুপদী সংগীত সুপারিশ করলেন। কিন্তু ব্লকের

লোকজনদের চাপে রবীন্দ্রসংগীত করাই ঠিক হল। কোন গান হবে তা নিয়েও মতভেদ দেখা দিয়েছিল। তারপর বোধহয় দিল্লী থেকে আসা মিনিস্টার সাহেবের জন্যে খোলকরতালে গান হল : ওই মহামানব আসে। দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে। মর্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে।

মিস্টার দে-র বয়স পঁয়তাল্লিশও হতে পারে পঁয়ষট্টিও হতে পারে। প্রথম নজরে ভাবা যেতে পারে এক বুড়োটে তরুণ। নামটা বাদ দিলে বাংলা দেশের সঙ্গে তাঁর বিশেষ যোগ নেই। লম্বা ধারাল গড়ন, বাদামী শরীর-খানার সঙ্গে খদ্দরের ধপধপে সাদা মিলেছে চমৎকার। যারা তাঁর পেছনের ইতিহাস জানে, যেমন নিতাই কিংবা সুব্রত, তাদের কাছে এ ধরনের চেহারা যেন কর্মদক্ষতার বারতা নিয়ে আসে। লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্সে ল্যাস্‌কির প্রিয় ছাত্র, যিনি ইয়োরোপে দশ বছর কাটিয়ে দিয়েছেন জ্ঞানচর্চায় তিনি ঠিক মন্ত্রী নন, সরকারি কর্মচারী নন, তিনি একজন বিশেষজ্ঞ। এমনকি সুব্রতরও মনে হতে থাকে যে এই ধরনের নিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবীর প্রয়োজন যাঁরা কেবল গড্ডলিকাপ্রবাহে নিজের জীবন ও দেশকে ঠেলে দিতে চান না। এই ধরনের ভদ্রলোক নিজের এলেমের জোরেই বোধহয আসন করে নিয়েছেন। সুব্রত উৎকর্ণ হয়ে বসে থাকে। নিশ্চয় তার বাবার অ্যাসেমব্লি বক্তৃতা থেকে আলাদা কিছু বলবেন মিঃ দে।

কিন্তু মুশকিল হল বক্তৃতা নিয়ে। মিঃ দের বেশীব ভাগ জীবন কেটেছে পাঞ্জাবে। বাংলা একেবারেই বলতে পারেন না। তাঁর বিশেষ দক্ষতা ইংরেজীতে। আর রবার্ট ক্লাইভ ইংরেজী ভাষার মারফত ভারতবর্ষ জয় না করলেও স্বাধীনতার পর আর একবার বোধহয় দেশ জয় করা যায় ইংরেজী ভাষার মারফত। কিন্তু সেদিক থেকে মিঃ দে-কে একপেশে বলা যায় না। তিনি উর্দুঘেঁষা চোস্ত হিন্দিতে বলতে লিখতে পারেন। বলা যায়, সর্ব-ভারতীয় ব্যক্তিত্বের প্রতিমূর্তি।

মিঃ দে দু-এক মিনিট ইতস্তত করে খবরের কাগজের বিশেষ প্রতি-নিধির দিকে চেয়ে চেয়ে বলতে সুরু করেন।

'History is a corelation of forces. The modern world witnesses a gigantic clash between socialism and capitalism, between the overpowering dehumanised control of the State

and the anarchy of private enterprize. India wants to strike a balance, to achieve a synthesis. The Community Development Project must be viewed from that perspective.'

ভদ্রলোক আবার তাঁর চশমা ঠিক করেন। আবার তাঁর ঝকঝকে ব্যক্তিত্ব স্পষ্টভাবে ঝিকিয়ে ওঠে চশমার ভেতর দিয়ে। আর সুব্রতর চোখে পড়ে বাগদী লোহার লোকগুলোর দিকে যারা হাত জোড় করে উবু হয়ে বসে আছে। একদিকে নিখুঁত ইংরেজী উচ্চারণ যত জোরালভাবে কানে বর্ষিত হতে থাকে তত যেন উবু হয়ে বসে থাকা লোকগুলোর হাঁটুর মধ্যে মুখ ঢুকে যায়। হঠাৎ মাইকের সামনে দাঁড়ানো তার বাবার ছবিটা মনের মধ্যে খেলে মিলিয়ে যায়: 'আজ ভারতবর্ষের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত যে সৃষ্টিযজ্ঞ চলেছে'...এবার সুব্রতর কানে আসে: The hammers of Five Year Plans are crushing to pieces the poverty of the people, India's No. 1 enemy. Simultaneously, the development work will carry on a bloodless revolution in villages. Here we don't need spectacular machines but men, men who matter, the toiling millions of India. মিঃ দে আঙুল বাড়িয়ে দেন কুণ্ডলীপাকানো মানুষগুলোর দিকে।

এরপর তাঁর চোস্ত হিন্দিতে বলে গেলেন, কেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গিয়েছে জনতারাজে। জনতারাজে জেলাশাসকদের চারপাইয়ে বসে গাঁয়ের মোড়লদের সঙ্গে সুখদুঃখের কথা বলতে হবে। জনতারাজ একটা মামুলী বাত নয়। বোধহয় হাফিজের কয়েকটা লাইন জুতসইভাবে লাগালেন কিন্তু বেশীর ভাগ লোকই তার মর্ম ঠিক বুঝলে না। নবীন আগে থেকে তৈরি করে রেখেছিল ছোকরাদের। বক্তৃতা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তারা তুমুল হাততালি দিলে।

সুব্রতর বোধ হয় সে স্বপ্ন দেখছে। নতুন চুনকামের গন্ধ, কার্বাইড আলোর নীচে সারি সারি খালি গা আর সামনে যেন রঙ্গমঞ্চের ওপর মাইকের পেছনে ঝকঝকে ব্যক্তিত্ব মিঃ দে হাত-পা নাচিয়ে কথা বলছেন। তাঁর বাবার ইংরেজী উচ্চারণ এমন পরিষ্কার নয় কিন্তু বাংলায় তাঁর ঝোঁকে ঝোঁকে বলার ঢঙ অবিকল এক: 'আমরা যা বলছি তা বৈজ্ঞানিকভাবেই পরীক্ষিত। আলুর

চাষ আমরা সোভিয়েট রাশিয়ার চাইতেও বাড়িয়েছি।' সুব্রত নিজের চিন্তাকে জলের কলের প্যাঁচ এঁটে বন্ধ করে দেয় হঠাৎ। এভাবে সে চিন্তা করবে না, আবার নিজেকে সচেতন করে। এ চিন্তার দাম কী? আজ দশ বছর এ চিন্তা তাকে কী শিখিয়েছে? রাজভবনের কাছে একদল বিহ্বল রোদ্দুরে পোড়া শুকনো চিমড়ে রেফিউজি মেয়েপুরুষ কিংবা উপযুক্ত কর্মের অভাবে কতগুলো উচ্চকণ্ঠ যুবকের মিছিল তৈরি করতে সাহায্য করেছে। কতবার পুলিশের কর্ডন ভাঙতে সে নিজেই মন্ত্রণা দেয় নি? কতবার তারা পুলিশকে বাধ্য করেছে গুলি চালানোয়? কিন্তু তারপর? তারপর দিনই কান খুঁটতে খুঁটতে চিনেবাদামভাজাওয়ালা সেই রণক্ষেত্রেই চিনেবাদাম বেচেছে, বাদুড়ঝোলা ঝুলতে ঝুলতে ট্রামবাস করেছে লোকে। বিপ্লবকে কান ধরে এমনি আনা যায়?

বাবার সঙ্গে তার যে বিরোধ তা কোনো আইডিওলজির জন্যে নয় বরং আইডিওলজি না থাকার দরুনই বিরোধ। সুব্রত খালি আশ্চর্য হয়ে ভেবেছে তার বাবা এত তাড়াতাড়ি ইংরেজভক্ত, গান্ধীভক্ত, নেতাজীভক্ত, রামকৃষ্ণভক্ত, রবীন্দ্রভক্ত হয়ে পড়লেন কি করে? তার কাকা যখন বৃদ্ধবয়সে বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে চেঁচান, নোনাধরা স্যাঁতসেতে ঘরের দেয়ালগুলো কাকীর ঠাকুরদেবতার গুচ্ছের ছবি দিয়ে সাজিয়ে রাখেন, বাগবাজার বস্তির বাসিন্দে আর গরিব বাউণ্ডুলেদের বিনে পয়সার চিকিৎসায় মাসের শেষে ধার করে উঠতে বসতে মিনিস্টার ভাইয়ের শ্রাদ্ধ করেন তখন তাঁর মনের গড়ন সুব্রতকে অবাক করে না। বোধহয় তার বাবার নিজেকে ছাড়া কোনো কিছুর ওপরেই বিশ্বাস নেই। গান্ধিজীকে আগে বলতেন, 'গেঁধে বেটা', সুভাষ বোসকে বলতেন মাথা মোটা, মন্ত্রী হবার আগে পর্যন্ত নেহরুকে বলেন, 'সোশ্যালিস্ট নবাব'; আজকাল ইংরেজদের এফিশিয়েন্সির কথা খুব বলেন কিন্তু সুব্রতর বিশ্বাস সেটা ভারতবর্ষের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সংক্রামক কুসংস্কার। তা থেকে তার বাবাও মুক্ত নন। তা ছাড়া তিনি নিজেও কি খুব এফিশিয়েন্ট? সে ব্যাপারেও তাঁর ছেলের যথেষ্ট সংশয় আছে। প্রায় বলা যায় তালে গোলে মিনিস্টার বনে গেছেন যেমন আর পাঁচজন লোকও মন্ত্রী হয়েছেন। সুব্রতর আপত্তি সে সাম্যবাদে বিশ্বাসী আর তার বাবা সাম্যবাদ বিরোধী বলে নয়। তার আপত্তি তার বাবা কেরীয়ারের এমন

ব্রহ্মে পৌঁছে গেছেন যেখানে সমস্ত বাদ একাকার। আর সে মাঝে মাঝে ঘাবড়ে যায় এই সব 'এফিশিয়েণ্ট' লোকজনের জন্যই তো সর্বত্র যারা কোনো সঙ্কটকেই সঙ্কট না ভেবে রায় দিতে পারেন। তাঁদের জয় কি কোনো একটি রাজনৈতিক দলেই সীমাবদ্ধ?

সুব্রত তাই সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে মিঃ দের কথায়। এখানেও সেই 'সায়লেণ্ট ব্লাডলেস্ রেভলিউশ্যানের' জয়গান। এসব কথা কাকে বলা হচ্ছে? সেদিন এক জায়গায় পরিসংখ্যান জোগাড় করতে সুব্রত ক্রমাগত একই সমস্যার মুখে পড়ছিল। এখানকার এত দাঁত-বের-করা দারিদ্র্য যে অনেক ক্ষেত্রেই পরিসংখ্যানের অর্থ নেই। অনেক বাগদী লোহারের বাড়ি একটা চাটাই আর মাটির হাঁড়ি ছাড়া আর কিছু নেই। নিতাইয়ের দল শিক্ষা শিক্ষা করে খুব চেঁচাচ্ছে, ছোকরা গ্রামসেবকেরা রবীন্দ্রনাথের গান গাইছে লোকজনদের উদ্‌বুদ্ধ করার জন্যে। কিন্তু সুব্রতর কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই গুরুসদয় দত্ত উদ্‌ভাবিত 'চল, আয় কচুরী নাশি'-র পর্যায়ে। ইংরেজ আমলে জেলা-মহকুমা শাসক বছরে একদিন খাকি হাফ প্যাণ্ট পরে কচুরীপানা তুলে গ্রামের লোকজনদের মধ্যে উৎসাহসঞ্চারের চেষ্টা করতেন। এখন মন্ত্রী অফিশিয়ালরা জনসাধারণকে রক্তহীন বিপ্লব এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার গুণগান শোনান। সুব্রত চমকে ওঠে। আবার পুরনো খাতে তার চিন্তাকে বইতে দিচ্ছে। গত দশ বছর থেকে কি সে কখনো মুক্তি পাবে না? অথবা, বলা যেতে পারে, বাংলাদেশ মুক্তি পাবে না? সেই লোকজনকে উত্তেজিত করে রাস্তায় নামাতে হবে পুলিশের কর্ডনের সামনে, সেই নাক চুলকাতে চুলকাতে পুলিস-অফিসারের সঙ্গে সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা নির্বিকার গল্প জুড়ে দেবে, ঘাম চপ্‌চপে শার্টের আস্তিন গুটিয়ে গলার রগ ফুলিয়ে চীৎকার দিতে হবে, 'ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ', আর ইন্‌ক্লাব তখন ওপরে নীল আকাশে মেঘের আড়ালে মুখ লুকিয়ে হাসবে।

'কি মশাই, ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি?' নিতাই সুব্রতকে ঝাঁকি দিল। 'ফাস্টক্লাস বলেছে মশাই, ভদ্রলোক সম্পর্কে আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। এইরকম এক্সপার্টদের আজ সবচেয়ে দরকার।'

মিঃ দে কী এক্সপার্ট কথা বললেন বোঝা গেল না। কিন্তু যে স্বল্পসংখ্যক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এসেছিলেন জমায়েতে তাদের মধ্যে কথাটা দাবানলের

মতো ছড়িয়ে গেল। সবাই বলতে লাগলেন, 'সাবজেক্টের ওপর ভদ্রলোকের অসামান্য গ্রাস্প,' কিংবা 'সিচ্যুয়েশনটা ঠিক অ্যাসেস্ করতে পেরেছেন' কিন্তু মুশকিল বাধালে মদন বাউরী। সেই কোলকুঁজো মানুষের কুণ্ডলীর মধ্যে হঠাৎ লোকটা খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে লাগল, 'এসব ইংরেজী বাত তোমাদের নিজেদের মধ্যে করো। আমরা জল পাব? কি গো, আমরা জল পাব?'

কৃষি দপ্তরের উচ্চপদস্থ এক অফিসার তড়াক করে লাফিয়ে উঠে চেঁচিয়ে বললেন, 'পাবে, পাবে, সব পাবে। বোস বোস।' ইতিমধ্যে মদনের আশেপাশে আরো কয়েকটা খালি-গা উঠে দাঁড়িয়েছে। চার দিকে একটা বিজবিজনি ফুসফুসনির মধ্যে সভাটা হঠাৎ ভেঙে যায়।

নিতাই কিন্তু উত্তেজিত। সে মিঃ দে-র জলজ্বলে ব্যক্তিত্বের ঝলকে উত্তপ্ত। তার মনে হয় স্বাধীনতালাভের অ্যাদ্দিন পরে একটা কাজের কাজ হয়েছে। আর সে স্থির করে ফেলে মনপ্রাণ দিয়ে গ্রামোন্নয়নে লেগে যাবে। মিঃ দে তাকে আরো দম দিয়েছেন। তার মুখচোখ দেখে বোধ হচ্ছিল ভারতবর্ষের বুকের ওপর দারিদ্র্যের যে জগদ্দল পাথর বহুযুগ ধরে চেপে বসে আছে তা এখন নড়তে সুরু করেছে। নিতাই ভাবছিল, অ্যাদ্দিন ধর্ম ধর্ম করে সে কি অদ্ভুত খেপে উঠেছিল, কি অযথা সময় নষ্ট করেছে। আর মনে মনে স্থির করে ফেলে সে সব রকম আত্মত্যাগ করতে রাজী, তার জন্যে তার সবচেয়ে নিকট আত্মীয়ও যদি ভুল বোঝে তবু পিছপা হবে না। সে শুধু অফিসার নয়, সে কর্মী, সে হাত লাগিয়েছে ভারতবর্ষের বুকের ওপর থেকে দারিদ্র্যের পাথর নামাতে। এর চেয়ে কি মহৎ কাজ হতে পারে? তার দৃঢ় ধারণা হয়, রাজনৈতিক নেতা নয়, তাদের মতো এই সব অখ্যাত লোকেরই প্রয়োজন যারা জনসাধারণের মনে উৎসাহের সঞ্চার করবে। আজ এই পেট্রোম্যাক্স আর কার্বাইডের কম্পিত আলোর নীচে সারি সারি খালি-গায়ের সভায় সে প্রত্যক্ষ করতে পারবে ভারতবর্ষ বলে একটা কিছুর উপস্থিতি। হয়তো মিঃ দে ঠিক বলতে পারেন নি, হয়তো ইংরেজীতে বলা উচিত হয় নি, হয়তো কেন নিশ্চয়ই সরকারি কর্মচারী ও চাষীর মাঝখানে ব্যবধান এখনো দুর্লঙ্ঘ্য। কিন্তু এই পাঁচিলে ফাটল ধরাতেই হবে! নিতাইয়ের ফর্সা মুখখানা উত্তেজনায় লাল থমথমে দেখায়।

'চলো, আমাদের ক্যাম্পে চলো', সুব্রতর হাত ধরে নিতাই।

সুব্রত চমকে তাকায় নিতাইয়ের দিকে। নিতাইয়ের হাতটাও কেঁপে উঠল তার হাতে। 'আবার বক্তৃতা?' সুব্রত ক্লান্ত গলায় বলে।

'তুমি রেভল্যুশানারী না? তোমারও বক্তৃতায় ভয়?'

সুব্রত ক্লান্ত গলায় বলে. 'সেইজন্যেই তো ভয়। বিপ্লবটা বক্তৃতাতেই সব বেরিয়ে গেল। চাষীদের জন্যে আর কিছু থাকল না।'

'এতটুকু মন নিয়ে তুমি গাঁয়ে এসেছ?' নিতাই তেতে উঠে বললে।

'হ্যাঁ, আমার এতটুকু মন। আমার বাবার মতো, তোমার নেতার মতো এত দরাজ কি করে হব? আমি শুধু একটা কথাই বুঝতে চাই, সেইজন্যেই গাঁয়ে এসেছি। আমি জানতে চাই, কত ধানে কত চাল।'

'এসব হেঁয়ালী রাখো!'

'আসলে তুমি ভালোভাবে চাকরি করতে চাও,' সুব্রত ফস করে বলে ফেলল। ঠিক এই ধরনের কথা বলবে না বলেই সুব্রত প্রতিজ্ঞা করেছে। সেই তীর্যক তীক্ষ্ণ ভঙ্গী, সেই 'পলেমিকের' মেজাজ, তাতে কিছু হবার নয়। সুব্রত জানে, তাতে শেষপর্যন্ত রাস্তায় নেমে গুলি খেয়ে মরতে হয়।

আর ঠিক যেভাবে ঘা দিতে চেয়েছিল ঠিক সেই ভাবে কথাটা বাজে নিতাইয়ের মনে। নিতাই চীৎকার করে ওঠে, 'আইডিয়ালিজম্ তোমাদের একচেটিয়া সম্পত্তি. না? কী স্যাকরিফাইস্ করেছ? কী ছেড়েছ ভাই? বাপ মিনিস্টার হলে ছেলে যদি তার পোঁ না ধরে তাহলেই ধন্যি ধন্যি পড়ে যায়। আমার বাবা মিনিস্টার নয়, ইস্কুলমাস্টার। আমরা সারা পরিবার ইংরেজের জেল খেটেছি। কখনো পয়সাকে পয়সা জ্ঞান করি নি। চাকরি করব ভাবলে মিশন করতাম না, এই পাড়াগাঁয়ে অ্যাদ্দিন পড়ে থাকতাম না মাটি আঁকড়ে।'

'চলো, চলো তোমাদের ক্যাম্পে। গেঁয়ো লোকরা ঠাট্টাও বোঝে না।'

নিতাই জল হয়ে যায়। বলে, 'চাষবাস সম্পর্কে তোমার অনেক প্রশ্ন থাকতে পারে। থাকাই তো উচিত। আমিও তো ভাই তোমার মতো আগন্তুক। আমাদের শ্যামবাবু আছে— ডিস্ট্রিক্ট অ্যাগ্রিকাল্চার অফিসার। তুখোড় লোক ভাই। তুমি তার কাছ থেকে সব পাবে।'

সভা শেষ হবার পর গুঞ্জনমুখর জনতা ভেঙে ভেঙে বাইরে চাঁদনীতে ছড়িয়ে পড়ছে। মাঝে মাঝে দীর্ঘস্বরে এক-একটা ডাক ভেসে আসে, 'রজনী, ও রজনী…'। মদনের বাজখাঁই গলা কানে আসে, 'বাবুমশাই, তোমরা জলের একটা পাকা ব্যবস্থা করো গো।' তারপর সেই চাঁদনীতে মিলিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরই চারদিক ফাঁকা লাগে। ধপধপে জ্যোৎস্নায় খোলা গোরুর গাড়ির সামনে মুখুজ্জের দুটো বলদ পরম নিশ্চিন্তে জাবর কাটে। একটু দূরে এখনো একটা ভিড় কার্বাইড আলোর চার পাশে। দোতারার সঙ্গে গানের আওয়াজ উঠছে।

'বাউল,' নিতাই বললে। তারা দুজন থমকে দাঁড়াল ভিড়টার পাশে। সুব্রত ঘাড় উঁচু করে দেখে দোতারা বাজাচ্ছে মাঝবয়সী একটা ফকির। তার চোখদুটো মঙ্গোলীয়, চাপা. চিবুকে সামান্য একটু পাতলা ছাগলের দাড়ি। পরনে ফাটা গোলাপী রেশমের আলখাল্লা, গলায় ঝুটো মুক্তোর মালা। লোকটা তার মস্ত বড়ো মুখ ব্যাদান করে মাথা নাড়িয়ে নাড়িয়ে গায়, ঘুরে ঘুরে নাচে। সঙ্গে নীল হাফপ্যান্ট আর গেঞ্জীপরা, মাথায় ধুতি পাগড়ি করে পরা আট-ন বছরের একটা ছেলে সংগত করে। তারা যা গান করছিল তাতে নিতাই আর সুব্রতর চিন্তাসূত্রের হঠাৎ ছেদ পড়ে। আসতে আসতে তারা জমির 'ইল্ড' কি করে বাড়ানো যায় আলাপ করছিল কিন্তু সেসব কথা ভুলে তারা দাঁড়িয়ে পড়ে।

'বড্ড ডিপ্রেসিং না?' নিতাই ফিসফিস করে বললে সুব্রতকে। কিন্তু সেও এক অযৌক্তিক আকর্ষণে শুনতে থাকে। বাউল নিজের মনে হাসে। মাথার ওপরে দোতারা দুহাতে তুলে পাক খেয়ে লাফ মারে আবার গায়:

হৃদয়ের ইস্টিশানে
বসে খোদ মহাজনে,
চালায় কল রাত্রিদিনে যেখানে মন চলে।
ও মরি মরি কুলকুণ্ডলিনী মহারাণী
তিনি বিরাজ করেন চতুর্দলে।

নিতাই তার সম্মোহ কাটাবার জন্যে বিড় বিড় করে, 'আবার সেই দেহতত্ত্ব, সেই ভুসি মাল। দেশটা যে এগিয়ে যাচ্ছে, এরা কিছুতেই মানবে না, কিছুতেই মানবে না।'

শেষকালে দোতারার ঝমঝম আর পায়ের মলের ঐকতানে, ছেলেটার তালে তালে প্রেমজুড়ির সংগতে গানটা জমকালো হয়ে ওঠে। আর একটা খুব সহজ সত্য, মানুষের জন্মমৃত্যুর অনাদ্যন্ত কাহিনী জ্যোৎস্নালোকিত ধানকাটা রুক্ষ রাঢ়ের মাঠে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। নিতাই তার ঘোর কাটাবার জন্যে চেঁচিয়ে উঠল, 'এসব পুরনো গান ছাড়ো। একটা সামাজিক কিছু গাও। একটা সোশ্যাল কিছু।'

বাউল তার দোতারা থামিয়ে ফ্যালফ্যাল করে একবার চেয়ে থাকে নিতাই আর সুব্রতর দিকে। পাশে তার গেরুয়াপরা একটা বুড়ো, বোধহয় তারই দলের কেউ, তাকে কি বলে। পানসে চোখ মেলে দেখে আগন্তুকদের পেছন থেকে একটা মুনিষ চেঁচিয়ে উঠল, 'ব্লক বাবু, ব্লক বাবু।' বাউল একবার সেলাম করে নিতাই আর সুব্রতর দিকে। তারপর দোতারা সজোরে বাজতে থাকে। নিতাই অস্পষ্টভাবে বলে, 'ক্যাম্পে খাওয়া আছে। তাড়াতাড়ি যেতে হবে। অ্যাগ্রিকাল্চার অফিসারও থাকবে।' আবার গান সুরু হয়, আবার সেই কখনো ফিসফিস করে, কখনো গলা চড়িয়ে দুহাত তুলে দোতারা ঝমঝমিয়ে, যেন বাবুদের কথাগুলো তার কানে যায় নি, কিংবা গেলেও সে মনে রাখে নি :

অনুরাগ না জাগিলে হৃদকমলে
প্রেম কি কথায় মেলে।
কস্তু প্রেম কি ছকুড়া-নকুড়া
কুড়িয়ে নেবে যারা তারা,
সাধিতে সাধিতে উদয় হবে
শুভযোগ পেলে।
প্রেমের গাছে প্রেমলতা
জগৎ জুড়ে তার পাতা
পাতায় পাতায় পরশমণি
তার বুকেতে দোলে।

'চলো চলো, অনেক হয়েছে,' নিতাই সুব্রতর হাত ধরে টান দেয়। তারপর চাঁদিনীতে আল ভাঙতে ভাঙতে বলে, 'শুধু প্রেম দিয়ে কিছু হয় না।' আবার তারা জমির 'ইন্ডে' ফিরে আসবার চেষ্টা করে। কিন্তু

তেমন জমে ওঠে না কথাবার্তা। মাঠের মাঝখানে আবার এক জায়গায় পেট্রোম্যাক্সের কড়া আলো চোখে পড়ে। অর্ধসমাপ্ত স্কুলবাড়িটা থেকে লুচিভাজার গন্ধ আসে।

আরো কিছুদূর আসতেই মিঃ দের শেরোয়ানী আর চশমা চোখে পড়ে। মিঃ দে আর বিখ্যাত সংবাদপত্রের বিশেষ প্রতিনিধি কি বিষয়ে একটা তর্ক করছেন। নিতাই এ ভোজসভার উদ্যোক্তাদের একজন। রান্নার তদ্‌বির করার জন্যে সে 'কিচেনে' ঢোকে। কোনো কোনো অফিসার সস্ত্রীক এসেছেন এ ভোজসভায়। সোনামুখীর দু-তিনজন বড়ো ব্যাপারীও আছেন।

সুব্রত এক কোণে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোকদের কথাবার্তা শোনে। কতগুলো কথা বারে বারে ভেসে আসে, 'ভিলেজ পোটেনশিয়াল,' 'অ্যাগ্রিকালচারাল বেস্' 'চেঞ্জেস্ ইন অ্যাটিচিউডস্' ইত্যাদি। খানিকক্ষণ কথা চলার পরই সাংবাদিকটি জিজ্ঞেস করেন, 'তাহলে আপনি বলছেন, অ্যাদ্দিন যা হয়েছে তা ঠিক হয় নি?' অমনি 'নট্ এক্স্যাক্টলি' বলে' মিঃ দে যেখান থেকে সুরু করেছিলেন আবার সেখান থেকেই আরম্ভ করেন। প্রায় মিনিট পনেরো এই লুকোচুরি চলতে থাকে। কেউ ঠিক ধরা দেন না।

সুব্রতর মনে হল শেষকালে সাংবাদিকটি হাল ছেড়ে দিলেন। তাঁর চাঁছাছোলা উদ্‌গ্রীব মুখখানার ওপর ক্লান্তির ছায়া নামে। তাঁর বোধহয় গ্রামে আসার পরিশ্রমটাই মাঠেমারা গেল কারণ তেমন কিছু লেখার নেই। যদি মিঃ দেকে দিয়ে কোনোক্রমে বলানো যেত যে অ্যাদ্দিন পর্যন্ত যা হয়েছে তা কিছু হয়নি তাহলে নিশ্চয় প্রথম পাতায় দুকলম জুড়ে জাঁকিয়ে বসত খবরটা। কিন্তু তা হল না। সুব্রত আঁচ করে মিঃ দের গ্রাম সম্পর্কে উৎসাহ মূলত 'চেঞ্জেস ইন্ অ্যাটিচিউডস্' বা 'ব্লাডলেস্ রেভল্যুশান্' ইত্যাদি কতগুলো জুতসই কথা ব্যবহার করার উৎসাহ, তেমনি খবরের কাগজের প্রতিনিধির এই লক্ষ্মীপুর গ্রাম সম্পর্কে আগ্রহ আসলে ভালো 'কপি'র জন্যে আগ্রহ। আর যদি সেই আগ্রহ না মেটে তাহলে এই গোটা লক্ষ্মীপুর গ্রাম সম্পর্কেই আগ্রহ হারিয়ে যায়। দুজনের কাছেই এই বৃত্তাকার শালী নদীর পারে তিলি-বাগদী-লোহার এতগুলো মেয়েপুরুষের কয়েক শতাব্দী ধরে বাস, তাদের অসোয়াস্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের বাঁচার সান্ত্বনা, এখানকার বিভিন্ন ধরনের জমি, আর বিভিন্ন ঋতুতে তাদের ওপর স্বতন্ত্র প্রক্রিয়া,

এখানকার আবহাওয়া, মানুষ ও জীবজন্তুর শরীরে বিশেষ ধরনের উন্নতি আবার বিশেষ ধরনের রোগ, এখানকার মানুষদের সরকারি যেসব প্রতিষ্ঠান সে সম্পর্কে মনোভাব অথবা তাদের ভূত-প্রেত-বাউল-কিংবদন্তীর জগৎ—এক কথায় এই কয়েক হাজার মানুষের অঞ্চল সম্পর্কে তাঁদের যে উৎসাহ তাতে বোধহয় এক মাইল রাস্তায় কয়েক ইঞ্চি পর্যন্তই যাওয়া যায়।

'এই যে তোমাকেই খুঁজছিলাম,' ঘামে ভেজা উত্তেজিত নিতাইয়ের মুখখানা কাছাকাছি মানুষগুলোর মাথার ওপর ভেসে ওঠে। 'কোথায় এতক্ষণ ছিলে?...এই যে শ্যামবাবু, বলেছিলাম না? ব্রিলিয়েন্ট লোক। চাষবাসের ব্যাপার একেবারে নখদর্পণে।'

শ্যামবাবুর পরনে ধূসর পেন্টুলুন। তার ওপর খদ্দরের সাদা বুশশার্ট, মোটা ভুরু, লাইব্রেরি ফ্রেমের চশমা, বড়ো বড়ো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ চোখ, চেটাল হাতের থাবায় স্বাস্থ্যের ইঙ্গিত। শ্যামবাবু মৃদু হাসেন। বোঝা যায় এভাবে পরিচয়ে তিনি অভ্যস্ত। মোটা থাবাটা নিতাইয়ের মুখের সামনে নাড়িয়ে বলেন 'এখানকার আসল ব্যাপারটা তো হল ল্যাটারাইট সয়েল? এটা মনে রাখলেই আর কিছু ভাববার দরকার নেই।'

সুব্রত উৎসুক চোখে ভদ্রলোকের কেজো মুখখানার দিকে তাকায়। ভদ্রলোক বলেন, 'যেটা গ্যানজেটিক সয়েলের অসুবিধে এখানে তা নেই। এখানে দুটো কাজ—বাগু আব টেরাস্ কাল্টিভেশান—যা গ্যানজেটিক ক্লে সয়েলে সম্ভব না। তাই এখানে একটু ইমাজিনেশান্ খাটালেই ট্রিমেণ্ডাস্ পসিবিলিটি।'

'আপনি যেসব কথাগুলো বলছেন সেগুলো হচ্ছে? চাষীরা আপনাদের কথায় চাষ করছে?'

সুব্রতর প্রশ্নে শ্যামবাবু একটু অসহিষ্ণু হয়ে বললেন, 'একি আর এক দিনের ব্যাপার মশাই! আমাদের মতো ব্যাকওয়ার্ড কান্ট্রিতে কবে কোন জিনিস লোকে আগবাড়িয়ে নিয়েছে। বিদ্যেসাগর মশাই তো বিধবাবিবাহ চালু করলেন। কটা ইয়ংম্যান বিধবাবিবাহ করছে মশাই?'

এরপর কথা চলে না। শ্যামবাবু বিশদভাবে বোঝান যে এসব প্রচেষ্টায় ঠিক ব্যাপারীর বুদ্ধি নিলে চলবে না। এ ধরনের প্রোগ্রামের পেছনে দরকার হলে কোটি কোটি টাকা ঢালতে হবে। তা থেকে এখনই কী লাভ

হবে, সঙ্গে সঙ্গে চাষের ইল্ড কত বাড়বে এভাবে দেখার পেছনে যে বুদ্ধি তা পাটোয়ারী বুদ্ধি। তা দিয়ে দেশ এগোয় না। 'সমস্ত ব্যাপারটাকে একটা পার্সপেক্টিভ্ দিতে হবে,' শ্যামবাবু এতক্ষণে সমস্ত সংশয় দূর করতে পারলেন এভাবে কথা শেষ করেন।

এরপর আবার বক্তৃতা। বোধহয় এই লুচিমাংসের ভোজসভাকে একটা 'পার্সপেক্টিভ' দেবার চেষ্টা। এর উদ্যোক্তারা যেন বলতে চান এটা মামুলি ভোজসভা নয়, এখানে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আলোচিত হবে, দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের চেষ্টা হবে। যাতে সমাগত অতিথিবর্গের লুচিমাংস সদ্ব্যবহারে বিবেকদংশন না থাকে। যাতে তাঁরা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় এই ভোজসভায় যোগ দিতে পারেন।

বক্তৃতায় মিঃ দে বলেন আত্মত্যাগের কথা। দেশের চারদিকে সৃষ্টিযজ্ঞ চলেছে— খামারে কারখানায়। ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করতে হবে। ব্যাপারী যেমন লাভ ছাড়বে, যিনি সরকারি কর্মচারী তিনিও আত্মত্যাগ করবেন। 'মনে রাখবেন, কমিউনিটি ডেভালাপমেন্টের মারফত যদি সত্যিই গ্রামের উন্নতি করতে হয় তবে তা শুধু চাকরি করে হবে না।'

মিঃ দের বক্তৃতা শেষ হবার পরই সুব্রত আশ্চর্য হয়ে দেখে নিতাই দাঁড়িয়ে পড়েছে মিঃ দের পাশে বক্তৃতা করার জন্যে। সকলেরই খিদে বাড়ছে, ভালো ঘিয়ের গন্ধে তা এখন আরো তেজাল। এখন একটা বক্তৃতা, বিশেষ করে স্থানীয় ব্লক অফিসারের কাছ থেকে বক্তৃতা, কারো বরদাস্ত নয়। কেউ কেউ অপ্রসন্নভাবে, কেউ করুণামিশ্রিত কৌতূহলে তাকায় নিতাইয়ের দিকে। সুব্রত আশ্চর্য হয়ে দেখে প্রবল উত্তেজনায় থমথম করছে নিতাইয়ের মুখ। চোখ জলে ভরা, গলা ধরা। দু-তিনবার কাশবার চেষ্টা করে কাঁপা গলায় নিতাই বললে যে সে তার মাইনে থেকে মাসে মাসে একশো টাকা কম নিয়ে ভলান্টিয়ারদের মাঝখানে বিলি করবার ব্যবস্থা করবে তাদের কাজে আরো উৎসাহ দেবার জন্যে। নিতাই যেমন লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছিল তেমনি ধপ করে বসে পড়ে পাশের চেয়ারে।

নিতাইয়ের থমথমে ভাবখানা সমবেত মানুষগুলোর মাঝখানে হঠাৎ ছড়িয়ে পড়ে। কেউ কেউ তাঁদের কুঁচকানো ভুরু, ফোলানো নাক, কিংবা করুণামিশ্রিত হাসির মারফত এই নাটকীয় প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করেন।

তাঁদের অবস্থা থেকে বোধহয় যেন কোন দিগ্‌বিজয়ী বিজনেস ফার্মের বোর্ড মিটিংয়ে একটা নেংটা পাগল ফস্ করে ঢুকে পড়েছে। একটু একটু ভয়ও করে সকলের। কেউ আড়ে আড়ে মিঃ দের দিকে তাকান তাঁর মুখের ভাবখানা বুঝবার জন্যে। মিঃ দে নিচু গলায় নিতাইকে ভর্ৎসনা করেন, 'আপনার স্ত্রীকে বলতে হবে আপনার পাগলামির কথা।' আর সঙ্গে সঙ্গে চারপাশের লোকজন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। একজন এই বেকায়দা অবস্থাটা কাটাবার জন্যে চেঁচিয়ে ওঠেন, 'এক সার বসিয়ে দাও এখন। আবার জলকাদায় ফিরতে হবে।' নিতাইয়ের মুখে কেউ এক পোঁচড়া কালি লেপে দেয়। তার সেই রাঙা উদ্‌ভাসিত মুখখানা হাসির অভিনয়ে ভীষণ কাঁদো কাঁদো বোকা দেখায়।

এরপর সভা জমে ওঠে। বেশী পদ হয় নি সত্যি কিন্তু এরকম অজ পাড়াগাঁয়ে পাকা বাড়িতে বসে ভালো ঘিয়ের লুচিমাংস খাওয়ায় আরাম আছে। তারপর মিঃ দে-র উপস্থিতিতে এই মামুলি খাওয়াদাওয়াব ব্যাপারটা আরো তাৎপর্যপূর্ণ। মিঃ দে সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে অথচ নিচু গলায় বলতে থাকেন কবে পণ্ডিত নেহেরু তাঁকে কি বলেছেন। 'নেহেরুও আমার সঙ্গে একমত হলেন।' কিংবা 'নেহেরু আসলে আমার-আপনার ওপরেই নির্ভর করে আছেন। আমরা কি করতে পারি গ্রামে তার ওপরেই ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ,' বা 'গত বছর জেনেভাতেও লাংগে— জানেন তো ওদের সবচেয়ে বড়ো এক্সপার্ট— আমার সঙ্গে একমত হলেন,'— মিঃ দে-র এই ধরনের আলাপে আশ্চর্য এক কুহক সৃষ্টি হয়। আর এ কুহকের রাজ্যে সমবেত অফিসারবৃন্দ ব্লক কর্মচারীদের সঙ্গে সঙ্গে তাদের অজ্ঞাতসারেই নিতাই সুব্রত ঘুরে বেড়াতে থাকে। ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চল এক আলোকিত রঙ্গমঞ্চ আর সেখানে মিঃ দে যাদুকরের মতো ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেন কথায়। সে রঙ্গমঞ্চে শত শত কোটি টাকার ফার্টিলাইজার তৈরি হয়। হাজার হাজার মেগাওয়াট আলোক প্লাবিত করে গ্রাম-গ্রামান্তের ঝুপড়িকেও। আর ঝুপড়িই থাকছে না যেমন শহরে বস্তি থাকছে না, থাকছে না মহাজন, থাকছে না ভারতবর্ষের কৃষকদের শত শতাব্দীব্যাপী ঋণ ও দারিদ্র্য।

হঠাৎ সংবাদপত্রের বিশেষ প্রতিনিধি বলে উঠলেন, 'এসব যা বলছেন সবই ঠিক। তবে আপনাদের প্রহিবিশান পলিসি আমি সাপোর্ট করি না।

ফাঁকা আদর্শবাদ দিয়ে তো আর ডেভালাপমেণ্ট হয় না। আপনারা কত কোটি টাকা রেভেনিউ লস্ করেছেন ভাবুন তো।'

'ইকনমিক প্লেনে অবশ্য এ পলিসি টেঁকে না। ইউ আর রাইট,' মিঃ দে বলেন।

'আরে মশাই স্বাধীনতা পেয়েছি বলে আমরা তপস্বী হব নাকি? আমরা ভালো খাবদাব, কাপড়জামা পরব, এরই নাম তো স্বাধীনতা।'

জেলাশাসক এক ছোকরা আই.এ.এস. অফিসার। তিনি সামলে দেন, 'ডণ্ট বি টু হার্শ অন হিম্। মদ খাবার জন্যে স্বাধীনতা কি না, দ্যাট্স এ ম্যাটার অফ ওপিনিয়ন। কিন্তু এ নিয়ে আমাদের গেস্টকে···'

শ্যামবাবু সাংবাদিকটিকে লক্ষ্য করে তাঁর জোরাল গলায় বললেন, 'আমাদের অনেকরই স্যার মাঝে মাঝে দু-এক পাত্তর ভালোই লাগে। বাট্ ইউ ডোণ্ট নো ভিলেজেস্। তাড়ি খেয়ে শালারা পড়ে থাকল।'

আবার আলাপটা ঠিক পথে পাক খেয়ে চলে এল। 'সো ইউ সি' বলেই মিঃ দে আর একটা উৎসাহের বোতল খুলে ফেললেন। আর গলগল করে সেই সফেন উৎসাহ সবাই পান করতে থাকেন। শ্যামবাবু উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'আসল ব্যাপারটা তো স্যার ল্যাটারাইট সয়েল···।' জেলাশাসক ভুরু কুঁচকালেন কিন্তু তিনিও শেষ পর্যন্ত জমে গেলেন।

জমল না খালি দুটো লোক। তারা দুজনে সভা ভাঙবার একটু আগেই উঠে পড়েছিল। তারপর যেমনভাবে এসেছিল তেমনিভাবে জ্যোৎস্না-লোকিত আলের ওপর দিয়ে ফিরে যায়। ধবধবে আলোতেও নিতাইয়ের করুণ মুখখানা মালুম হয়। বিশাল বুক চিতিয়ে হেলে দুলে চলনের বদলে মাথা হেঁট করে সুব্রতর পেছনে পেছনে সে এগোয়। আর সুব্রত তার এই নতুন বন্ধুত্বে তৃপ্ত হয় না। গত দশ বছর ধরে, বলা যায় তার গোটা যৌবন ধরেই তো তার এই বন্ধুত্ব— যে বন্ধুত্ব দাঁড়িয়ে আছে প্রতিবাদের ওপর। নিতাইকে সে যেমন দেখেছিল এই গ্রামে সেই উৎসাহিত ব্লক অফিসার রূপেই সুব্রত দেখতে চায়। সে তো গ্রামে এসেছে এই প্রতিবাদের ভূমিকা ত্যাগ করবে বলে। যে অশান্ত গুঞ্জন গত দশ বছর ধরে তার কানে বেজেছে তাকে শান্ত কববে বলে। ভারতবর্ষের কি কোথাও কোনো জায়গা নেই যেখানে সৎ হয়েও কার্যকরী হওয়া যায়, যেখানে তার বাবার মতো, মিঃ দে-র মতো,

কিংবা (যা সুব্রতর কাছে আরো ভয়ংকর) তার নিজের পার্টির কোনো কোনো নেতার মতো শুধু কথার ফানুস উড়িয়েই জীবন শেষ করতে হবে না ?

একটা ঢ্যাঙা মতো লোক আসছে আলের উল্টো দিক থেকে। নিতাই হাঁক দেয়, 'কে ?'

'আমি মদন, ব্লকবাবু নাকি ?'

'ওটা কী ?' মদনের বগলে কী একটা লক্ষ করে নিতাই বললে।

মদন হাসল। কিরকম টেনে টেনে ঘড়ঘড়ে একটা আওয়াজ বের করল গলা থেকে।

'মহুয়া ! এক কাগজের নোক এয়েছেন গো কলকেতা থেকে।···চৌকিদার ধরেছিল। কলকেতার সাহেব বলতেই ছেড়ে দিলে।···চলবে ?'

'ভাগ্ এখান থেকে।' নিতাই চেঁচিয়ে উঠল।

কয়েক পা এগোতে এগোতেও তারা মদনের হাসির আওয়াজ শুনতে পায়।

॥ সাত ॥

পাথরে কোপ মেরে কি লাভ ? নির্মল বলেছিল সুব্রতকে। যা লোকে নিতে চাইছে না তার জন্যে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করার পেছনে কী লোকনীতি ? যদ্দিন পর্যন্ত ইংরেজ শাসন সম্পর্কে মানুষ উত্তেজিত হয় নি তদ্দিন কি ছটফটিয়েছে বাংলাদেশের তরুণ সম্প্রদায় ! গুপ্ত সমিতি স্থাপন, বোমা বানানো, পিস্তল ছোঁড়া, তারপর মরীয়া হয়ে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন। আজ সেই তরুণদের আত্মবিসর্জন এক চমকপ্রদ ঘটনা, বড়োজোর খবরের কাগজে রোববারের পাতায় রোমাঞ্চ কাহিনী বা জনপ্রিয় ফিল্ম। কিন্তু আজ এই আত্মবিসর্জন রাজনৈতিক নেতাদের গলাকাঁপানো বক্তৃতা ছাড়া আর কি কাজে দেবে ?

সুব্রত অবশ্য এ যুক্তি মানে না। রাজনীতিতে যে রাস্তায় সাফল্য সেই রাস্তাই একমাত্র নয় তার মতে। আর সাফল্য কী ? গান্ধী ভাঙিয়ে দশ-পনেরো বছর চলছে, তারপর নেহরু ভাঙিয়ে আরো পনেরো বছর কি তারও বেশী। তারপর ? তাদের জীবনে না আসুক প্রকৃত সমাজবাদ ভারতবর্ষে আসবেই।

কিন্তু তাদের তাত্ত্বিক বিরোধ থাক, নির্মলকে সে সুবিধেবাদী বলে যতই ঠাট্টা করুক তার এই সুবিধেবাদই সুব্রতকে আকর্ষণ করে। নির্মল ঠিকই লিখেছে, তারা কি তাদের বাপ-কাকার ভূমিকা পুনরাবৃত্তি করবে না? নির্মলের চিঠি পড়ে সে চটেছিল কিন্তু বরাবরই সে এইরকম ঠাণ্ডাভাবে তাদের সামনের সমস্যাগুলো ধরবার চেষ্টা করেছে। সুব্রত যখন রাজনৈতিক উত্তেজনায় আলোড়িত হয়েছে, একটার পর একটা কলকাতার রাস্তায় মিছিল সংগঠিত করেছে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার্টির ঘরোয়া মিটিংয়ে আত্ম-সমালোচনা করে করে মুখে ফেনা তুলেছে তখন নির্মল একটাই বক্তব্য রেখেছে বছরের পর বছর : রাজনীতি সে ঠিক বোঝে না। সুব্রতর কাজের সে কোনোদিন সমালোচনা করে নি, তারিফ করে নি। পক্ষে কি বিপক্ষে তার কোনো উত্তেজনা নেই। নিজের সীমা সে বেঁধে ফেলেছে। তার জ্যাঠামণি প্রবোধবাবু সম্পর্কেও সে তাঁর ছেলের মত পোষণ করে না। প্রবোধবাবুর কথা ও কাজের মধ্যে যে ফারাক তাঁর ছেলেকে পীড়া দেয়, নির্মলের কাছে তা অবশ্যম্ভাবী। 'তুমি যদি ঐ চেয়ারে বসতে তোমাকেও ঠিক ঐরকম কথাই বলতে হ'ত। তোমার অর্থনীতির জ্ঞান আরো প্রখর থাকায় আরো হয়তো কায়দা করে কথাগুলো বলতে। আর তা ছাড়া মিনিস্টারদের কি করণীয় আছে— সেক্রেটারিরা যা লেখে তাতে সই দেওয়া ছাড়া?'

কথাটা সুব্রত একেবারে উড়িয়ে দিতে আজকাল পারে না। যদি প্রচণ্ড মতবিরোধ ঘটে তাহলে পদত্যাগ করতে পারেন বাবা মন্ত্রীত্ব থেকে। কিন্তু তা না হলে নির্মলের কথামতো সই মারা ছাড়া কিংবা গলা কাঁপিয়ে বক্তৃতা দেওয়া ছাড়া কি করণীয় আছে? কিছু আছে, যেমন ভবেন গাঙ্গুলীদের চাকরি করে দেওয়া কিংবা বুলবুলির স্বামীর মতো কিছু লোকজনের ট্র্যান্সফার সুপারিশ। এখানেও তো ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। হতেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, কিছুটা করার ছিল। দিশী বিলিতি ফার্মের আয়কর ফাঁকি দেবার কমিশন বাবদ দু-তিন হাজারী কয়েকটা চাকরি দেবার ক্ষমতাও হাতে থাকত। 'শালারা আমাদের পাত্তাই দেয় না,' কোনো সাহেবী ফার্ম সম্পর্কে তার বাবার সখেদ উক্তি সুব্রতর মনে পড়ে।

নির্মলের এই নিরুত্তেজ সতর্কস্বভাব তার সঙ্গে একেবারে না মিললেও

মাঝে মাঝে এই বৈপরীত্যই তাকে আকর্ষণ করে। সেইজন্যই লক্ষ্মীপুরে আসার আগে নির্মলের এক কাণ্ড দেখে সুব্রত আশ্চর্য হয়েছিল। কাণ্ড মানে ছেলেমানুষী কাণ্ড! যা অতি সহজেই সাবালকমানুষ ভুলে যায় কিন্তু নির্মল সেই ছেলেমানুষীতে মেতে উঠেছে। সুব্রত যতবারই স্মরণ করে নির্মলের আত্মসচেতন মুখে সেই চাপা লজ্জা ততবারই সে মজা পায়। আসলে নির্মল যে এখনো ছেলেমানুষ ও 'সেন্টিমেণ্টাল' সে বিষয়ে সুব্রতর সন্দেহ থাকে না।

ব্যাপারটা কিছুই না। সুব্রতর কাছে একেবারে এলেবেলে ব্যাপার। তাদের যশোরের বাড়ির পাশে এক মুসলমান উকিলের বাস ছিল। তাঁদের পরিবারের সঙ্গে যথেষ্ট আদানপ্রদান ছিল। তারপর দেশভাগ হবার পর সেই ভদ্রলোক ক্ষমতার শিখরে উঠলেন পাকিস্তানে। সুব্রতর ঠিক খেয়াল নেই তবে কাগজে দেখেছে সে ভদ্রলোক কখনও মুসলীম লীগ, কখনও আওয়ামী লীগ, কখনও অন্য কোনো লীগের নেতা এবং ক্রমান্বয়ে ঢাকা ও করাচীতে কখনও মন্ত্রী, কখনও স্পীকার,—আবার কখনও অ্যাম্বাসাডর। কখনও এই শোনা গেল তাঁর নামে হুলিয়া, আবার কদিন পরই গভর্নর তাঁকে আপ্যায়ন করছেন। অর্থাৎ তার বাবার চেয়েও প্রাতঃস্মরণীয় এক রাজনৈতিক নেতায় উন্নীত হয়েছেন তিনি। আর তাঁর ছোটো মেয়ের সঙ্গে নির্মলকুমারের পেরেম চলছে।

পেরেম বলে ঠাট্টা করেও সুব্রত স্থির থাকতে পারে না, কারণ যেটা হচ্ছে সেটা কিছুই না। একটা কমবয়সী মেয়ের মতিভ্রম। ছেলেবেলার স্মৃতি সবমানুষেরই ভালো লাগে। দশ-বারো বছরের মেয়েটিকেও বোধহয় কয়েকবার নির্মলচন্দ্র সাইকেলের ক্যারিয়ারে চাপিয়ে ঘুরিয়েছে। সে মেয়েটির এক দাদাও নির্মলচন্দ্রের সহপাঠী। তিনিও করাচীতে কোন দৈনিক কাগজের মুখ্য সম্পাদক। 'ত্যাখ কাণ্ড!' বলে সলজ্জ হেসে নির্মল কয়েকখানা নীল কাগজে লেখা চিঠি দেখিয়েছিল সুব্রতকে। সেই ইনিয়ে বিনিয়ে লেখার মধ্যে চিত্তাকর্ষক কিছুই পায় নি সুব্রত। 'বাচ্চা মেয়ে,' সুব্রত অপ্রস্তুতভাবে বলেছিল দু-একবার। কিংবা 'দেশভাগটা সত্যিই মেয়েটার বড্ড লেগেছে' বা 'ওর কলকাতায় পড়বার খুব ইচ্ছে ছিল'। কিন্তু এসব কোনো কথাই সুব্রতর মনে হয় নি চিঠিগুলো পড়ে। 'নিউরটিক', সে

বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু নির্মলের মুখের দিকে চেয়ে বলতে পারে নি। একটু রূঢ়ভাবে বলেছিল, 'দেশভাগ নিয়ে প্যান্ প্যান্ করে কি লাভ?'

'সেটাও বা কম কি!' নির্মল সতর্কভাবে জবাব দেয়।

'তুমি কি ওকে বিয়ে করবে ভাবছ?'

'কি সব বাজে কথা বলছ। শি ইজ জাস্ট এ পেন ফ্রেণ্ড', নির্মলের গলায় চাপা উত্তেজনা।

'অত চটছ কেন?'

'না না, চটছি না, চটছি না।'

॥ আট ॥

দু-তিন বছর হল মুখুজ্জের গোয়ালের পাশে সার ও বীজ বিতরণ কেন্দ্র খোলা হয়েছে। পরেশ বলে যে ছোকরাটি সেখানে তদারক করে সে খুব উৎসাহী, রবীন্দ্র সংগীত করে, নজরুল দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী গান গলা ছেড়ে গায়, কিন্তু সার কি বীজ চেনে না। আলুর সার কিছুদিন এসে পড়ে আছে। বেচারী খেয়াল করতে পারে নি। এদিকে আলুর জমি তৈরী করার সময় চলে গেল। মুখুজ্জে সোনামুখী গিয়েছিলেন মামলার তদ্বিরে। পরেশকে ফিরে এসে ধমকালেন। তারপর সার বিতরণ হল। ফলে এ বছর আশানুরূপ ফসলের সম্ভাবনা কম।

এতদিন গুড় বানানোর কাজও থমকে ছিল। মুখুজ্জের আর নবীনদের কলেই গাঁয়ের আখ মাড়াই হয়। কাল রাত থেকেই আখ মাড়াইয়ের শব্দ, মেয়েপুরুষের কোলাহল বচসা, বাতাসে গুড় জ্বালের মিষ্টি গন্ধ। সুব্রত খেয়েদেয়ে গা মোড়ামুড়ি দিচ্ছিল। আকাশে মেঘ নেই তবু ফর্সা আকাশে গুড় গুড় করে একটু আধটু আওয়াজ উঠছে, ঠাণ্ডা বাতাসও দিয়েছে। হয়তো দূরে কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে।

ক্যাপস্টেন সিগারেটের একটা টিন হাতে মুখুজ্জে ঘরে ঢুকলেন। চালে মাথা ঠেকবে বলে মাথা নিচু করে মুখখানা বাড়িয়েই বললেন, 'আপনি এখনও আছেন! আমি ভাবলাম ভেগেছেন অ্যাদ্দিনে।'

তারপর সুব্রতর মুখের আশ্চর্য ভাবখানা লক্ষ করে বললেন, 'কি, ঠিক বলি নি ? সখ করে গরিবিয়ানা কদ্দিন চলবে ?'

সুব্রত ভুরু কোঁচকায়। মন্ত্রীর ছেলে পরিচয়টা কি তাহলে খবরের কাগজের প্রথম পাতায় গরম খবরের মতো বেরিয়ে পড়েছে ? আগেও ঘটেছে এ ব্যাপার। সমীহ, কিঞ্চিৎ দ্বিধামিশ্রিত ভয় আর স্তাবকতার ঢল ঢল ভরা ভাদরে সে বার কয়েক ভেসে গিয়েছে। মুখুজ্জের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে সুব্রত ভাবে, কালই ভোরে তল্পিতল্পা গুটোতে হবে নাকি ? সেরকম বিপদ নেই বোধ হয়। মুখুজ্জে খোলা টিনটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এটা আপনার কাছেই রাখুন।'

'বেশ তো আছি। কেন এসব করছেন ?'

'ওসব বলবেন না স্যাব। কলকাতার লোক গাঁয়ে এসে বাস করছেন··· তা প্রায় দিন পনেরো তো হল···এ কি চাট্টিখানি কথা ! গ্রাম উজোড় করে লোক শহর যাচ্ছে, পুকুর উজোড করে মাছ চলেছে কলকাতায়। আচ্ছা মশাই, এই কলকাতা যাওয়াটা বন্ধ করতে পারেন না ? গ্রামদেশেও তো মানুষটানুষ থাকবে, না কি ?'

তারপব পকেট থেকে বিড়ি বার কবে ধরিয়ে বললেন, 'দেখলেন তো, কয়েক ঘণ্টা দে সাহেব এসে কেমন ভেল্কি দেখিয়ে দিলেন সারা গাঁয়ে।'

'ভেল্কিটা কি ?'

'এই এত লোক, এত কথা। এখানে তো সব মশাই মরে আছে। দিন হচ্ছে, রাত হচ্ছে। দিন হচ্ছে, রাত হচ্ছে। এর মধ্যে দে সাহেবের মতো লোকজন এলে প্রাণে বল পাই। যখন শুনি সারাটা দেশ হৈ হৈ করে এগোচ্ছে ·····'

'শীতে কি বুনলেন এবারে ?'

'পছন্দ হল না বুঝি কথাগুলো ?'

'পছন্দ হবে না কেন ? দে সাহেব পণ্ডিত লোক। বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পাবেন।'

'বলুন, পারেন না ?' মুখুজ্জের চোখ উৎসাহে জ্বলে ওঠে। তারপর তাঁর কি মনে পড়ে যায়। তাঁর ঢোলা কামিজে পকেট নেই। কামিজের নীচে কাপড়ের খুঁট থেকে একটুকরো মোচড়ানো কাগজ বার করলেন। পরিপাটি

করে ভাঁজ খুলতে খুলতে সলজ্জ হেসে বললেন, 'দেখুন তো, এটা ঠিক আছে কি না।'

সুব্রত অবাক হয়। ইংরেজীতে ব্লক ডেভালাপমেন্ট অফিসারের কাছে লেখা এক আর্জির ওপর আনমনে চোখ বোলাতে বোলাতে বলে, 'ঠিকই তো আছে।'

'না না, ইংরেজী ঠিক আছে? আমি বলছি মানে ভাষা ঠিক আছে? দেখবেন স্যার।' ভদ্রলোক একটু অধীর হয়ে বললেন।

সুব্রত অপটু হাতের ডেগা ডেগা অক্ষরগুলোর ওপর আবার আনমনে চোখ বোলাতে বোলাতে বললে, 'হ্যাঁ, ঠিকই তো আছে।'

'না না, আপনি দেখছেন না, দেখছেন না,' ভদ্রলোক হঠাৎ অসহিষ্ণু হয়ে পড়লেন। তারপর তাঁর অত্যন্ত আত্মসচেতন মুখখানা নিচু করে বিনীত ছাত্রের মতো জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা সুব্রতবাবু, 'ইফ্'-এর পরে কি 'দেন্' হয়?'

সুব্রত বোকার মতো মুখুজ্জের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। তারপর সে খেয়াল করে মুখুজ্জের মুখে প্রার্থনার করুণ ভঙ্গী। তার এই জিজ্ঞাসার জন্যেই যেন এই দুপুরে তার ঘরে এসে ঢোকা, এমনকি বোধহয় এরই জন্যে সিগারেটের টিন।

'ইফ্ এর পরে কি দেন্ হয়?' গলা খাঁকারি দিয়ে মুখুজ্জে আবার জিজ্ঞেস করলেন।

'কেন? হয় কি না হয় তাতে আপনার কী এসে যায়?' সুব্রত উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করে।

'খুব এসে যায় স্যার, খুব এসে যায়,' মুখুজ্জে শান্ত গলায় বললেন। 'সোনামুখীতে একজন আমায় বললেও, আমার সব কিছুই ভালো কিন্তু ইংরেজীটা···মানে ঠিক ইস্কুলে তো পড়ি নি ভালোভাবে নইলে আমার এক কাকা ধরুন কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশানার সাউথ, আর এক আত্মীয়···'

সুব্রতর কানে আর কিছু ঢোকে না। হঠাৎ লক্ষ্মীপুরে থাকাটাই কেমন আলুনি লাগে। কলকাতার সেই অকারণ-গর্বিত অসহায় মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের ভূত এই রাঢ় বাংলার মানুষকেও তাড়া করে বেড়াচ্ছে।

এছাড়া এ দেশের মানুষের কি নিজস্ব কোনো ছবি নেই? কোনো ভবিষ্যৎ নেই?

সুব্রত তার হাত তুলে বললে, 'আপনি আঠারো মণ ধান করেছেন, আলু তুলেছেন, সমস্ত গ্রামের আপনি আদর্শ। একটা ফোকোটিয়া কে আপনাকে কি বললে তাই আপনি ভাবছেন?' উত্তেজনায় গলা কাঁপতে থাকে সুব্রতর। আর মুখুজ্জে আরও কাঁচুমাচু করুণ হয়ে পড়েন।

'আমরা কি করব স্যার বলুন। আমাদের তো কাজ করতে হবে। ইংরেজী জানলে কাজের সুবিধে হয় তাই বলছি।'

'চাষীকেও ইংরেজী শিখতে হবে? চাষীর ঘরেও বাবা ব্ল্যাক্ শিপ, হ্যাভ্ ইউ এনি উল? আমাদের দেশ বলে কি কিছুই থাকবে না? সব ফোতো, ফরফর কাগজের ফানুস?'

'না না মশাই, আপনি চটে যাচ্ছেন মিছিমিছি। নিন, সিগারেট খান।' মুখুজ্জে কৌটো খুলে সিগারেট বার করলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'আপনি তো রেগেই খালাস। আমাদের তো রাগলে চলবে না। যেদিকে দেশের হাওয়া সেদিকে আমাদেরও চলতে হবে।'

'দেশের হাওয়া যদি আমাদের বাঁদর বানায় আপনিও বনবেন?'

'এসব কি বলছেন?'

সুব্রত আত্মগতভাবে বললে, 'আপনারা নিজেরাই জানেন না কি বড়ো কাজ করছেন। প্রত্যেক বছর আমরা ভিখিরীর মতো হাত পাতছি বিদেশের কাছে আমাদের ভাতরুটির জন্যে। আপনারা আমাদের বাঁচাবার চেষ্টা করছেন। আপনারাও যদি ইফ্ এর পরে দেন করেন তাহলে দেশটা কোথায় যাবে?'

'কি সব বলছেন! নিন, বিশ্রাম করুন। আমাদের গুড়ের কাজ সুরু হয়েছে। দেখেছেন ওদিকটা?'

ভদ্রলোক যেমন সন্তর্পণে মাথা নিচু করে ঘরে ঢুকেছিলেন তেমনি বেরিয়ে যান সন্তর্পণে।

॥ নয় ॥

গুড়ের কাজ পুরোদমে সুরু হয়েছে। গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় দুটো বড়ো আটচালার নীচে নারীপুরুষের সমাবেশ। তিনটে পেল্লাই কড়াইয়ে আখের রস জ্বাল হচ্ছে। আশেপাশে বিশ্রাম করছে মুখুজ্জের মুনিষ জলধর, শক্তি আরও কয়েকজন। মদনের ছেলে হাবাও জুটে গেছে। তদারক করে বেড়াচ্ছে নবীনের দুই কাকা। একপাশে নাগরীর স্তূপ। পাশের চালায় আখ মাড়াই চলেছে। আবছা চাঁদের আলোয় দশ-বারোজন লোককে একরাশ আখের আঁটির পাশে জিরোতে দেখা যায়। জনাপাঁচ বাগদী মেয়ে অপেক্ষা করছে। গুড়ভরা নাগরী মাথায় করে শালী নদীর ওপারে বাসুখোলায় পৌঁছে দিতে হবে। পার খেপ্ আট আনা।

জলধরের বয়স হয়েছে। শক্ত বেঁটেখাটো গড়ন, মাথাভর্তি টাক। ঠিক মালুম হয় না বয়স। সে প্রসঙ্গ নিয়েই আলাপ হচ্ছিল।

'বলে কি বয়স কতো? আমি বলি তিরিশ চল্লিশ। লোকটা কে বটে?'

'পুলিশ হবেন,' শক্তি ফুটন্ত রস নাড়তে নাড়তে বলে।

'ফের বলে সেবার ঝড়ে রাধাগোবিন্দ মন্দিরের চূড়ো পড়ল তখন আমার বয়স কত। আমি তখন হাবার মতো। শুনে শালা বলেন, আমার ষাট বয়স।'

হাফপ্যান্টপরা শক্তিকে বয়সের তুলনায় ছোটো লাগে। সে বলে, 'কি জানি, কি ফিকিরে ঘুরছেন। হয়তো পুলিশের লোক। বয়স বেশী শুনলে ভিটেই ক্রোক করবেন।'

এক চিলতে চাঁদের আলো কড়ার হাতলে পড়ে চকচক করে। সেদিকে চেয়ে জলধর বললে, 'আবার বলে, কটা ছেলে? কটা ছেলে আমি কি তা জানি! বললাম, তুমি কি আমার বাপের ঠাকুর? ছেলে কটা মানুষ করবে?'

উনুনে চেলাকাঠ ভরতে ভরতে হাই তোলে জলধর। নিজের মনে বিড় বিড় করে। 'কি অসুখ করেছিল আমি কি তা জানি। আপনার হেল্‌থ সেণ্টারের ডাক্তার এসেছিল?···কেউ হাগতে হাগতে মরল, কেউ বকতে বকতে মরল। আমি তা কি জানি?'

'তোমার রতন মরেছে গাছ থেকে পড়ে,' শক্তি স্মরণ করিয়ে দেয়।

'রতনটা গেছে বটে পা পিছলে। সোনামুখী নিয়ে গেলাম। হাড় ভাঙলে না কি হল, মরেই গেল।'

'কবে মরল ছেলেটা?'

'যেবার কালুর গোরুটা মারা গেছে।'

'মানুষ মরেছে কি বাঁচছে, ভগবান জানে।'

'হ্যাঁ!'

এরপর তারা এমনভাবে আলাপ করে যেন মৃত্যু তাদের পড়শী যে পড়শীর সঙ্গে নিজেদের সরাসরি মোলাকাত না হলেও যার উপস্থিতি তারা হামেশাই অনুভব করে। বস্তুত জন্মের সঙ্গে মৃত্যুর কোনো তফাৎ নেই শক্তি-জলধরের কাছে। এ দুয়ের উপস্থিতি নদীর জলের মতো সর্বদা তাদের গায়ে আছড়ে আছড়ে পড়ছে। সুব্রতর সংখ্যাতত্ত্ব তাদের কাছে দুর্বোধ্য। কার কটা ছেলে, কে কি করেছে করে নি, কে কিভাবে মরেছে এগুলো অপ্রাসঙ্গিক। সবাইকে এই ধরণীতে কয়েক দিনের জন্যে ধুলো খেলতে হবে, তারপর বিদায় নিতে হবে। তার মধ্যে কেউ রতনের মতো গাছ থেকে পা পিছলে পড়ে হঠাৎ বিদায় নেয়, তাই মনে থাকে। নইলে এসব ঘটনা এত স্বাভাবিক, এত দৈনন্দিন যে মনে রাখার মতো নয়।

'টগর কি বলছে?' জলধর আবার হাই তুলতে তুলতে বলে।

'এ বছর হবে নাই, ঘরে পয়সা নাই একটা।'

'ঐ লেংড়াটাই নেবেন ওকে।'

'বললাম, আমরা একটা ঘর দেখি। দুজনে খাটব, খাব।···শালী বিবি হবেন।'

'বয়স আছে তো।' আখের গাদায় ঠেস দেয় জলধর। 'বয়স থাকলে সবাই বিবি, সবাই বাদশা। আমরা তো বুড়ো হয়ে গেলাম।' তারপর

বাইরে চাঁদের আলোয় ধবধবে সাদা ধানের গোলাটার দিকে চেয়ে বললে, 'তোর টগরের মতো তিনটেকে রেখেছি।'

শক্তি চেঁচিয়ে উঠল, 'তোমাদের বয়সের সময় গম খেত লোকে?'

'দূর!'

'আধপেটা খেয়ে থাকত?' শক্তির গলা চড়ে যায়।

'দূর! দূর!'

'তোমার সময় হলে দশটা রাখতাম, দশটা!' শক্তি বুক চাপড়ে বলে।

জলধর এখন তাড়িস্থ। এ অবস্থায় সে মেয়েমানুষ রাখার গল্প করে। যখন অন্নের এত হাহাকার ছিল না তখন আরো অনেক সহজ ব্যাপারের মতো মেয়েমানুষ রাখাও সহজ ছিল, এই তার বক্তব্য। সে বক্তব্যে মাঝে মাঝে বাধা পেয়ে চটে যায়। বিড়িবিড় করে, 'ঐ ল্যাংড়া নেবেন টগরকে! হ্যা!'

শক্তি হঠাৎ গলা খাটো করে বলে, 'ল্যাংড়ার কাছ থেকে শ দুই টাকা নাও। তোমায় বাবা বলব। একটা সাইকেল রিক্সা করব সোনামুখীতে। এমনি খুঁটে খুঁটে খাব কদ্দিন?'

'তুই টগরকে নিয়ে ভাগবি? তোকে দেবেন কেন বটে?'

শক্তি একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে জলধরের দিকে। তারপর আস্তে আস্তে বলে, 'একটা বচ্ছর কিছু বলব না। একটা বছর গ্যাঁড়ার কাছে থাকুক। তারপর আমি আসব।'

জলধরের নেশা কাটতে সুরু করেছে। তার চকচকে চাঁদিতে জ্যোৎস্না। চোখদুটোও ঝকঝক করছে ঘুমন্ত ভাব কেটে গিয়ে।

'তারপর?'

'তারপর দেখা যাবে,' শক্তি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে।

'মদন কি বলবে?'

'বেটা ঢোঁড়া সাপ, তাড়িখোর। পারবে না কিছু করতে।'

জলধর বিড়ি ধরায়। গুড় দানা বাঁধছে। সুঘ্রাণ উঠছে। জলধর বিড়িতে টান দিতে দিতে বলে, 'আচ্ছা বল।'

ওদিকে যখন গুড় জ্বাল দেওয়া হয় তখন টগর, কালোর মা, গ্যাঁড়ার দিদি, আরও টগরের দু-তিনজন সাকরেদ অপেক্ষা করে গুড়ের নাগরী বাসতলায় নিয়ে যাবে বলে। দু-একটা মশা পোঁ পোঁ করে।

'ওঁরা সবাই অমনি। ওই যে বসে আছেন জলধর ওখানে উনিও অমনি।' কালোর মার স্বরে আক্ষেপ নেই। এ যেন জলহাওয়ার মতোই স্বাভাবিক ঘটনা। কালোর মা বহুকাল কালোর বাবার সঙ্গে থাকে না। কিন্তু বিপদে পড়লেই লোকটা আসে। সেই গল্প করে কালোর মা। কালো যখন পেটে এসেছিল সেই সময় কালোর বাবা তার বউ রেখে পাশের গাঁয়ে তারই বয়সী এক বিধবার সঙ্গে ভেগে গেল। তারপর যখন বসন্ত হল, কেউ দেখল না তাকে, তখন উঠে এল তার যন্ত্রণা নিয়ে কালোর মা-র ঘরে।

সন্ধের পর নাগরীগুলো একটার পর একটা সাজানো হয়। চাঁদ আছে, চলতে অসুবিধে নেই। মেয়েদের দলটা আস্তে আস্তে বেরিয়ে যায়। টগর ওঠে গড়িমসি করে। দূর থেকে আগুনের আঁচে জলধরের মুখখানা দেখা যাচ্ছে। শক্তির গলা পাওয়া যায়। টগরের মনে হতে থাকে ওরা আসলে একটাই লোক। শক্তি ওকে বলেছে, সোনামুখী কিংবা দুর্গাপুরে উঠে যাবে। সাইকেল রিক্সা ধরবে। যদি না পোষায় বাসের কণ্ডাক্টরি করবে। কিন্তু সেই ঘর-বাঁধার প্রতিশ্রুতির পেছনে আর একটা লোক যেন বসে আছে জলধরের মতো যে বৌকে ছেড়ে গেছে। পুরুষ মানুষের সেই দ্বৈতরূপ —একদিকে তার প্রবল আগ্রহ অন্য দিকে তার অনাসক্তি বা নতুন আসক্তি টগরের মনের মধ্যে এক অস্পষ্ট চাপ সৃষ্টি করে। মাথায় বেড়িটা ঠিক করে এক ঝটকায় গুড়ের নাগরী তুলে নেয়। কাঁখে আর-একটা তোলে। তারপর অভ্যস্ত পদক্ষেপে আলো-আঁধারের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে যায়।

পঞ্চাশ-ষাট হাত দূরে কি একটা উবু হয়ে বসে আছে আলের ওপর। টগর থমকে দাঁড়ায়। গুড় নাগরীর ভেতর ছলকে ওঠে। টগর ভুরু কুঁচকায়। সামনের রাস্তাটা বাঁক নিয়েছে বাসতলির দিকে। কালোর মা-দের দেখা যায় না। ম্লান আলোয় পথের বাঁকে কয়েকটা অর্জুন গাছ দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে জটলা করছে।

উবু হয়ে বসা লোকটা উঠে দাঁড়ায়। সেই বেঁটে মানুষটার বেঁকে দাঁড়ানো হঠাৎ টগরের গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। ঠোঁট কামড়ায় টগর। পিচ্ করে থুতু ফেলে।

গ্যাঁড়া ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে টগরের সামনে এসে দাঁড়ায়। ভয়ে সে প্রায় কাঁপছে। ভয়ার্তভাবে ফিস ফিস করে ওঠে, 'শক্তির সঙ্গে যাস নে, যাস নে

টগর। ও তোকে পথে বসাবে। তোকে রেললাইনের বস্তিতে তুলবে। তারপর ভাগবে।···টগর···টগর···'

গ্যাঁড়া উত্তেজনায় বসে পড়ে টগরের পায়ের কাছে। টগর চীৎকার করে ওঠে, 'ওঠ্।' এক জায়গায় ভার নিয়ে দাঁড়িয়ে তার হাতের ডানা ধরে ওঠে। গ্যাঁড়া দাঁড়াতেই টগর কাঁখের নাগরীটা তার হাতে তুলে নেয়। তারপর অভ্যস্ত আঙুলে নাগরীর ঢাকনাটা চাপ দিয়ে খুলে ফেলে। গ্যাঁড়া মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর কিছু ভাববার আগেই এক খাবলা গরম গুড় তুলে নিয়ে টগর মুহূর্তে লেবড়ে দেয় গ্যাঁড়ার মুখে। তারপর আর-এক ঝটকায় নাগরীটা টেনে নিয়ে পাশ কাটিয়ে শন্ শন্ করে এগিয়ে যায়। গ্যাঁড়ার গাল জ্বালা করে কি না সেদিকে খেয়াল থাকে না। সেই চন্দ্রালোকিত অর্জুন গাছের তলায় সামনে রাস্তার বাঁকে অপস্রিয়মান আবছা নারীমূর্তির দিকে সে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে।

॥ দশ ॥

ভাষা কী? ভাববিগ্রহ না ভাবের ঘরের চুরির সবচেয়ে সার্থক ষড়যন্ত্র? আমাদের ইন্দ্রিয়ের অতন্দ্র ক্রিয়ায় আমাদের যে ভাবতরঙ্গ মস্তিষ্কের গর্ভগৃহে আছড়ায় শয়নে জাগরণে ভাষা কি বাস্তবিক তাকে রূপ দেবার জন্যে? অথবা সে ভাব ইস্পাতের কোনো দৃঢ় রেখায় অঙ্কিত করার সাধ— এক আকাশচারী কল্পনা? বরং মানুষের জীবনচর্চায় ভাষা প্রয়োগের দৃষ্টান্ত তুলে তুলে কি বলা যায় না ভাবের বিপরীত পথে চলার নামই ভাষা?

প্রেমিক যখন বলেন, 'আমি তোমায় ভালবাসি।' তার মানে কী? তার মানে কি তোমার অবয়বে এমন কিছু আছে যেমন হয়ত, আয়ত চোখ, মসৃণ ত্বক, উত্তুঙ্গ বুক অথবা এগুলোর কোনোটাই না, শুধু ঘাড়ের রেখা, দাঁতের পাটি মেলে হঠাৎ হেসে ওঠা, স্থিরভাবে তাকানো অথবা কোমর থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত গড়ন— এগুলো আমার কাম সঞ্চার করে? এই সমস্ত অঙ্গের ক্রিয়াকলাপে আমি উষ্ণতাবোধ করি, আমার রক্তে বেগ জাগে?

কিংবা আমি তোমায় ভালবাসি তার কারণ তুমি আমার জীবনের

প্রায়শ্চিত্ত। আমি তো জীবনে কিছুই করতে পারলাম না, পারবও না। এখন তোমার সঙ্গে মিলনে যদি সেই আত্মদৈন্যের পাপ, সেই গ্লানির অসহনীয় একাকীত্ব কিছুটা কাটে। তোমাকে ভালবাসি কারণ তোমার কথা চাল-চলন, আমার প্রতি তোমার বিশ্বাস আমাকে আত্মপ্রতারণায় সাহায্য করে এ জীবন কিছু পরিমাণ সহনীয় করে তোলে।

অথবা আমি তোমায় ভালবাসি কারণ তোমার দুচোখে আমার সর্বনাশ নয় আমার সন্তানের দুই চোখ দেখি। আমার এই নশ্বর দেহ মিলে যাবে পঞ্চভূতে যেমন আবার বাবা ঠাকুর্দাদা তার বাবা-বাবারা মিলে গেছেন পঞ্চভূতে তাঁদের অসংখ্য কলরব গুঞ্জরনের ইতিহাস পেছনে রেখে। আমরা কেউ আলবার্ট আইনস্টাইন নই, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব নই, লেনিন নই। আমাদেব এই ধরাধামের ভালবাসার কোনো বিমূর্ত রূপ নেই, কোনো কালা-তিরিক্ত স্বাক্ষর নেই। তাই তোমার কাছে আসি। তোমাকে ভার্যাভাবে পেতে চাই। যখন পডবে না মোব পায়েব চিহ্ন এই বাটে তখন আমার অস্তিত্ব, এই আমি সমস্ত সৌবজগতের খেলায় খেলবে এই বোধেব প্রশান্তি আমাব মন ভবায় না। আমার তখন মনে হতে পারে কোন্ শূন্য থেকে এসে আমি কোন্ শূন্যে মিলিয়ে যাব। তাব বদলে আমি আবো সীমাবদ্ধ এক স্বপ্ন, ধবাছোঁয়া যায এমন ভাবনা ভাবতে চাই— আমার পুত্র-প্রপৌত্রদের ঘরকন্না যার মাঝখানে আমি বেঁচে থাকব যেমন আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহরা আছেন আমার মধ্যে।

আমি তোমায় ভালবাসি এ কথায় এই তিনরকম কেন, আরো তিরিশ রকম ভাব থাকতে পাবে। কিন্তু এই তিনটি শব্দের খোলে আমরা এত ভাব কিভাবে ঢোকাব? তাহলে তো তিনটি খোলই বিবাট আওয়াজে ফেটে যাবে। এতগুলো ভাবনার আক্রমণে যে ভাষা বেরোবে তা প্রায় অসংলগ্ন অর্থহীন, তা বডো জোর মনস্তাত্ত্বিকের কাঁচামাল হতে পারে কিন্তু ভাষার দিক থেকে তা মৃত। তাই ভাষা মানেই বেশ কিছু পরিমাণ আপ্ত-বাক্য, অথবা একটা বিশেষ পায়রার খোপ যে খোপে সেঁধিয়ে আমাদের ভাববাবু হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। আমরা তখন সে ভাবের সৌকুমার্য, তার বিশেষ ছাঁদ, তার অপূর্ব শক্তির তারিফ করি। কিন্তু আসলে ভাবের প্রচণ্ড রূপকে সে হারিয়ে ফেলেছে। সে ঠিক সত্যের চেহারা আমাদের সামনে

রাখতে পারছে না। বরং সত্যের চেহারার নামে সে আমাদের ইচ্ছা পূরণের সহায়ক।

রাজনীতিতেও কি ভাষার এই প্রবল অসহায়তা আমাদের জীবনে দৈনন্দিন প্রকট নয়? তোমরা দেশের জন্যে এগিয়ে এসো— এ কথার কী মানে? এ কথার কি মানে কতগুলো মানুষ যারা দেশের স্নায়ুতন্ত্রের ঘাঁটিগুলো আগলে আছে তাদের কিংবা তাদের দলের বা তাদের বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়দের সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসব? অর্থাৎ তারা যাতে আরো ভালকরে খেয়েদেয়ে নির্ভাবনায় ঘুমোতে পারে তার জন্যে আমাদের এগিয়ে এসে দরকার হলে জীবন বিসর্জন দিতে হবে?

অথবা অর্থনীতির ভাষা— জীবনের মানোন্নয়ন যথা, আমাদের জীবনের মানোন্নয়নই একমাত্র লক্ষ্য। তার মানে কি এই— আমরা যারা নিমের দাঁতন আর ঘুঁটের ছাই দিয়ে দাঁত মেজে সত্তর বছরেও বত্রিশপাটি অক্ষুণ্ণ রেখেছিলাম তারা উন্নত অবস্থায় দু-বেলা পেস্ট দিয়ে দাঁত ব্রাশ করে চল্লিশ পার হলেই দাঁত তুলবার জন্যে ডাক্তারের কাছে ছুটব? কিংবা একবারও ইস্ত্রি করতে হয় না এরকম জামার বুশশার্ট পরে বেয়ারাকে ডাকবার জন্যে ঘন্টি টিপতে টিপতে পঁয়তাল্লিশে হৃদ্‌রোগে পটল তুলে ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানির কাছ থেকে স্ত্রীপুত্রদের এক কাঁড়ি টাকা পাইয়ে দেব? মানোন্নয়ন মানে কী? পায়ে না হেঁটে গাড়িতে চলা, খড়ো ঘরের বদলে পাকা বাড়িতে থাকা, বাংলার বদলে ইংরেজী বলা?

ভাষা নিয়ে কি কেচ্ছা! কি যাচ্ছেতাই ব্যাপার! অথচ মানুষের এমন অসহায় অবস্থা, সত্যকে ধরার জন্যে সে হাজার হাজার বছর ধরে এই যন্ত্র নির্মাণ করেছে, তারপর সেই যন্ত্র এখন বিরাট রাক্ষস হয়ে সত্যকে গ্রাস করে ফেলেছে। বাস্তবিক এখন এমন অবস্থা যে একটা বিখ্যাত পানীয়ের বিজ্ঞাপন আর কিং লীয়ারের লাইন একেবারে একাকার। বোঝাই যায় না কোনটা আসল কোনটা নকল। যেটা নকল সেটা আসলের চেয়েও ঝকঝক করে।

লক্ষ্মীপুরের কৃষি-অফিসারের দোষ কি। সে বেচারা টেরাস কাল্‌টি-ভেশান কথা দুটোকে আঁকড়ে ধরেছে মরিয়া ভাবে স্রোতের মুখে কুটোর মতো, কেননা এই শব্দ দুটোই তো তার ছেলেদের স্কুলে পাঠাতে সাহায্য

করছে, তার স্ত্রীর গায়ে শাড়ী চড়াচ্ছে। এ কথাগুলো যেন এক এক গ্রাস ভাত। এ কথাগুলো যদি সে জুতসইভাবে না বলতে পারে তাহলে তার ভাত জুটবে না। তার ছেলেদের স্কুল বন্ধ হবে, স্ত্রী মুহূর্তে হবেন এক বিষণ্ণ নারী।

তার মিনিস্টার বাবারও তো সেই কৃষি-অফিসারের অবস্থা। ভেবে দেখতে গেলে তাঁর আশেপাশে মিলের চেয়ে গরমিলই বেশী। প্রবোধবাবুকে অনেকগুলো সরকারি হস্তশিল্প সংস্থার উদ্‌বোধন করতে হয়েছে; আর প্রথম প্রথম সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ীই মনে হয়েছে এগুলো আসলে ফাঁকি, তাঁতিদের শোচনীয় অবস্থার সমাধান এভাবে হবে কিনা সন্দেহ। তার পর চিন্তা করছেন অন্যভাবে কি করা যায়। কিন্তু অন্য পথে এতকরম বাধা, এত প্রচলিত ধারার বিরুদ্ধে যেতে হয়, এতরকম অন্যায়ের ঝুঁকি নিতে হয় যে মন্ত্রী থাকা যায় না। আব হস্তশিল্প কেন, যে-কোনো শিল্পবিস্তাবে খোলনলচে পাল্টে ফেলতে হবে। অর্থাৎ কিছু করতে গেলে মন্ত্রী থাকা যাবে না। প্রবোধবাবু প্রথম বছরের শেষ থেকেই সংকল্প করলেন তিনি মন্ত্রী থাকবেন, তখন থেকেই 'স্বাধীনতাব পর থেকে আমাদের ধাপে ধাপে অগ্রগতি', মানোন্নয়নের জন্যে গ্রামে গ্রামে স্বস্তিযজ্ঞ,' 'আমরা সত্যের সাধক, ভারতবর্ষের ঐতিহ্যের বাহক,' 'শুধু স্লোগানে দেশ তৈবী হয় না, দেশ তৈরী করতে গেলে চাই কাজ,' 'দেখতে হবে আমরা অতীতের ভাবধারা কতখানি সমৃদ্ধ করতে পেরেছি,' 'দুনিযার সমস্ত দিকে আমবা বন্ধুত্বেব হস্ত প্রসারিত করেছি, কি আমেরিকা, কি সোভিয়েট রাশিয়া'— এই ধরনের কথা অবলীলাক্রমে বলে যেতে লাগলেন। যত দিন যাচ্ছে এই সব কথাগুলো যেন তাঁকে পেযে বসছে। আগে একটু জিভের জড়তা ছিল, নিজস্ব দৃষ্টি দিয়ে দেখবার চেষ্টা মাঝে মাঝে দেখা দিত। তাতে দেখলেন ঠিক 'এফেক্‌টিভ' হওয়া যায় না। 'এফেক্‌টিভ' হতে গেলে মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে কথার মালা গাঁথতে হয়। একটার পর একটা রঙবেরঙের ফুল দিয়ে একটার পর একটা মালা। তাদের কী রঙ, কী বাহার! এ শব্দের মালা যেন তাঁরই বিজয়মাল্য। অথবা বলা যেতে পারে প্রবোধ সেন মানে কোনো মানুষ নয়, কোনো বিশেষ চিন্তা নয়, এমনকি কোনো বিশেষ কর্ম নয়। প্রবোধ সেন একটা শব্দের মালা যা নতুন নতুন রঙে গন্ধে আমাদের সামনে দোলে।

অথবা ধরা যাক প্রাতঃস্মরণীয় সাংবাদিকদের কথা— কোনো ঘটনাকে যাঁরা গুরুত্ব দিতে পারেন অথবা গুরুত্ব না দিতে পারেন। এবং তাঁদের খ্যাতির বেশীর ভাগই তো এই শব্দপ্রয়োগের কৃতিত্ব যে কৃতিত্ব এমন প্রবল যে সাদা কালো দেখায়, কালো সাদা দেখায়। এ ক্ষমতাকে যাঁরা তিলকে তাল করার ক্ষমতা ভাবেন তাঁরা এই ক্ষমতাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেন না। এ হচ্ছে সত্যের নাকে দড়ি দেবার ক্ষমতা। অনেক সময় দেখা যায় কোনো কোনো নামজাদা সাংবাদিক একই ঘটনা পাঁচরকম কাগজে পাঁচরকমভাবে লেখেন। এ যেন মানুষের ব্রহ্মে পৌঁছানোর অবস্থা, একই ব্যাপারকে পাঁচভাবে দেখা যায়, একই রাজনৈতিক দলকে একই সঙ্গে ভাবা যেতে পারে প্রগতিবাদী, প্রতিক্রিয়াশীল. উদারনৈতিক বা প্রাচীনপন্থী। সত্যকে নিয়ে ফুটবল খেলার এই অপরিসীম ক্ষমতার জন্যেই সংবাদপত্রকে ফোর্থ স্টেট বলা হয় না? তাঁদের যে ক্ষমতা তা সত্যের নাকে দড়ি দেবার ক্ষমতা। সুব্রত বেচারী কি করবে! চারদিকে এই শব্দের জয়যাত্রা। তার বাবা কেন সবাই শব্দকে গ্রহণ করেছেন তাঁদের ইচ্ছাপূরণের সবচেয়ে সার্থক হাতিয়াররূপে। সত্যের প্রতিবিম্ব নয়, আমাদের মস্তিষ্কে যে ভাবোচ্ছ্বাস তার সার্থক চিত্রকল্প নয়, ভাষার শুধু প্রয়োজন সত্যকে সে কতখানি খেলাতে পারে, সেই সাফল্যের জন্যেই তার চাহিদা।

সুব্রতর কাছে কৃষি-অফিসারের কথায় সরলীকরণের প্রবল ঝোঁক প্রকাশ পেয়েছে। এইভাবে কতগুলো কথাকে অবলম্বন করে আমাদের দেশের ফসল বাড়ানো যায় না, তার মনে হয়েছে। কিন্তু বাস্তবিক কৃষি-অফিসারের কি দোষ? সুব্রত যদি একদিন কলকাতার হাইকোর্টে আসে তাহলেই শব্দের ওপর আইনজীবিদের অত্যাশ্চর্য ক্ষমতায় সে অনেক বেশী অভিভূত হবে। এক ঘরে ফাঁসীর আসামী মুক্তির আদেশ পেল তার মানে এ নয় সে হত্যা করে নি। বস্তুত ফরিয়াদী কৌঁসুলী বিলক্ষণ জানেন তাঁর মক্কেল হত্যাকারী। কিন্তু অপরিসীম কৌশলে আইনের বইয়ের কণ্টকিত পথের মাঝখানে যে সরু মসৃণ পিচঢালা রাস্তাটি আছে তার ওপর দিয়ে আসামীকে হাঁটিয়ে এনেছেন, আর সেই হাঁটিয়ে আনাটা এমন কৃতিত্বের ব্যাপার যে জুরী ও জজ উভয়েই মুগ্ধ, আসামী খুন কবল কি করল না সেটাই বড়ো কথা নয়, তাকে কিভাবে সমস্ত বাধা পার করিয়ে আনা হয়েছে সেটাই বড়ো কথা।

প্রেমিক, প্রবোধবাবু, রাজনৈতিক নেতা, অ্যাগ্রিকালচার অফিসার, কূটনৈতিক সাংবাদিক, জাঁদরেল আইনজীবী, সমাজের প্রত্যেক স্তরের সকল মানুষ যাঁদের কথা রোজ সংবাদপত্রে কীর্তিত হয়, ট্রামবাসে যাঁদের কার্যকলাপ নিয়ে আলোচনা চলে তাঁরা তো সবাই বেঁচে আছেন বা করে খাচ্ছেন তাঁদের প্রত্যেকের শব্দপ্রয়োগের সাফল্যের ওপর। বেচারী লক্ষ্মী-পুরের অ্যাগ্রিকালচার অফিসার কী এমন দোষ করলে!

শেয়ালদা

একটু সকাল সকাল দোকান বন্ধ করেন সুবোধ ডাক্তার। বাগবাজার স্ট্রীটে তাঁর পুরনো ডিসপেন্সারী। বাইরে শীতের সন্ধে ধোঁয়া আর কুয়াশায় আচ্ছন্ন। স্টেথিস্কোপের বাক্স বন্ধ করতে করতে হঠাৎ থেমে যান। এই সময়টা তাঁর সবচেয়ে প্রিয় সময়। রোগীর ভিড় নেই, বাড়ি ফিরে পয়সার অনটনের দরুন যে অপ্রীতিকর অবস্থার সামনে বেশীর ভাগ দিন পড়তে হয় তা থেকেও তিনি দূরে। পাশের ক্যাম্প চেয়ারে শুয়ে সুবোধ ডাক্তার কয়েক মিনিটের জন্যে চোখ বোঁজেন। আর ছেলেবেলায় দেখা খুব অস্পষ্ট স্মৃতি উনিশ শো পাঁচ সালের কলকাতা, তারপর যুদ্ধে মেসোপটেমিয়া, আরব, তুরস্ক। সুবোধ ডাক্তারের খুব খেজুর খেতে ইচ্ছে করে। সেই সব রসাল পেল্লাই সাইজের খেজুর কলকাতায় বিশেষ চোখে পড়ে নি। বেশ কয়েকটা বছর কেটেছিল মরুভূমিতে ঘোড়ার পিঠে লম্বা আলখাল্লাপরা মানুষগুলোর মধ্যে। তারপর দেশে ফিরে এক দুপুরের কথা খুব মনে আছে। ডালহাউসি স্কোয়ারে বাসে যাচ্ছেন। হঠাৎ বিকট আওয়াজ। পঞ্চাশ হাত দূরে ওয়াটসন সাহেবের গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চলেছে। চারদিক ছত্রভঙ্গ। সবাইকে পেটাচ্ছে পুলিস। তারপর চাকরি ছেড়ে টেররিস্টদের সঙ্গে ভিড়ে গেলেন। খুব বাজেভাবে ধরা পড়েছিলেন পিস্তল সঙ্গে। সাত বছর জেল। সুবোধ ডাক্তাব চোখ মেলে ডান কব্জিটা আলোর সামনে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে থাকেন। জেলের ভেতর ইংবেজের মারেব দাগ এখনো মেলায় নি। হঠাৎ তাঁর দিবাস্বপ্ন ভঙ্গ হয়। ডাকেন, 'পরেশ, পরেশ!'

পরেশ হাজির হয় মুখ বেজার করে। সে জানে এই সময়টাতে স্বাদেশিকতার ফোয়ারা ছুটবে। বাড়িতে তার নতুন বউকে বারবার বুঝিয়েছে কেন সকাল সকাল দোকান বন্ধ করেও তার দেরী হয় ফিরতে। 'বুড়োর বয়স যত বাড়ছে তত দেশ দেশ করে এই ভিমরতি বাড়ছে,' তার এই ধরনের কৈফিয়ত তার যুবতী স্ত্রীর ঠিক গ্রাহ্য নয়।

'আচ্ছা পরেশ, আমরা কি করলাম অ্যাদ্দিন? এই চারদিকে এত দারিদ্র্য, অনাহার, এতরকমের পাপ, জাল জোচ্চুরি। এর জন্যেই আমরা পড়ে পড়ে ইংরেজের মার খেলাম?'

পরেশ প্রতিবাদ করে না, ঘাঁটায় না— পাছে কথায় কথা বেড়ে যায় আর স্ত্রীর কাছে আরো দীর্ঘ কৈফিয়ত দিতে হয়।

'এই দ্যাখো, এই শ্রীদাম। একেবারে ছিনিমিনি খেলা হল এদের নিয়ে। বাচ্চা ছেলে যদি বলে, মাথায় চড়ে হাগব, তাই মানতে হবে? কতগুলো উল্লুক বললে হিন্দু আর মুসলমান এত আলাদা যে দুটো দেশ না হলে তারা বসবাস করতে পারবে না। অ্যাদ্দিন যে হিন্দু-মুসলমান একসঙ্গে ছিল, তোরা শালারা কোথায় ছিলি? এই সব সেল্ফ স্টাইল্ড লীডার্স, এই সব ট্রেটার্স!'

সুবোধ ডাক্তারের গলা চড়ে যায়। আরো শীর্ণ রুক্ষ বৃদ্ধ লাগে তাঁর ছুঁচলো মুখখানা। আর পরেশ নিজের মনে মনে বলে, 'গ্যাস, গ্যাস! আজীবন নিজেকে গ্যাস দিয়ে কাটিয়ে দিল।' প্রকাশ্যে বললে, 'অত উত্তেজিত হবেন না, শরীর খারাপ হবে।'

'কথা বলে শরীর খারাপ হয় না সুবোধ ডাক্তারের। কেউ কখনো ভেবেছিল সুরেন বাঁড়ুজ্জেকে হারিয়ে দেবে বড়ো কর্তা? তোমাদের এই চীফ মিনিস্টার বিধানচন্দ্র রায়কে আমরা ডাকতাম বড়ো কর্তা। বড়ো কর্তা কবে কথা বলেছে হে? চীফ মিনিস্টার হয়ে। আমরাই তো কয়েকটা ছোকরা জিতিয়ে দিলাম বিধানচন্দ্রকে।'

পরেশ যতই নেকনজরে দেখুক ডাক্তারের স্বাদেশিকতা, এ ধরণের কথা-বার্তা (বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রীকে বিশেষ নামে ডাকা কিংবা তাঁকে তুমি বলা) তাকে কিঞ্চিৎ অভিভূত না করে পারে না। একটু ভয়ে ভয়ে বলে, 'একবার চীফ মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা করুন না।'

সুবোধ ডাক্তার ফেটে পড়লেন, 'কেন, কেন দেখা করব? আমাকে দেশ সেবার জন্যে পেনশান দাও— এই জন্যে? দ্যাখো পরেশ, স্বাধীনতা আসার পর ব্যাঙের ছাতার মতো সারা দেশ জুড়ে দেশপ্রেমিক গজিয়েছে। যারা কখনো দেশ সম্পর্কে ভাবে নি, খালি নিজের পেট সেবা করেছে, তারা মিনিস্টার, দেশনেতা। তারা প্লেনে চড়ে দেশবিদেশে ডেলিগেশানে বেড়াচ্ছে। আমি যদি শুকিয়ে মরি তবু এই দেশপ্রেমিকদের কাছ থেকে হাজার মাইল তফাত থাকব।'

'এতে ডাক্তারবাবু কিচ্ছু হবে না। কতগুলো হাভাতে হাঘরে লোক ডিস্পেনসারীতে ভিড় বাড়াবে। বিনে পয়সায় চিকিৎসা করাবে আবার

আপনাকেই চোখ রাঙাবে! আর যারা কাজ গোছাবার তারা কাজ গুছিয়ে নেবে।' গভীর আত্মপ্রত্যয়ে পরেশ বললে।

'এই কাজ গুছোনই তো দেখছি। দিল্লীতে, কলকাতায়, দেশের সর্বত্র এই কাজ গুছোন। তোমার সঙ্গে মিলছে না মতে, ক্লিক্ করে হটিয়ে দিলাম। বড্ড সমালোচনা করছ, মিনিস্টার বানিয়ে দিলাম। আরো বাড়াবাড়ি করো, জেলে ভবে দিলাম।...আর এই কতগুলো কাগজ জুটেছে। ছেলেবেলায় গাঁয়ে কবিগান হত। বড়ো বড়ো কবিয়াল আসত। কর্ণ, অর্জুন, রাম, রাবণ যেদিকে ভিঁড়িয়ে দাও সেদিকেই গাইবে। প্যালা পেলেই ঢোল। কাগজগুলোও অবিকল এক।'

সুবোধ ডাক্তারের এ ধবণের জোবাল কথাবার্তা শুনতে অভ্যস্ত হলেও মাঝে মাঝে পবেশেব অসোয়াস্তি হয়। বাড়িতে বকা খাবে এই হিসেব ভেস্তে যায়। চাপা উত্তেজনায় বলে, 'আপনি স্যর কিছু মনে কববেন না। একদম কমিউনিস্টদেব মতো কথা বলছেন ডাক্তারবাবু।'

'ছেঁদো কথা বোল না, ছেঁদো কথা বোল না,' সুবোধ ডাক্তার চেঁচিয়ে উঠলেন। 'ষাটটা বছব পাব কবে দিয়েছি যেভাবে আব কটা বছবও তেমনি কেটে যাবে।'

তাবপব হঠাৎ শান্ত গলায় বললেন, 'তবে পবেশ, আমবা বোধহয় বুড়ো হয়ে গেছি। আমবা যেভাবে ভেবেছি দেশসম্পর্কে সেরকমভাবে সবকাবও ভাবে না, কমিউনিস্টরাও ভাবে না। কই, দেশ যখন ভাগ হল, কোনো মিঞা তো ট্যাঁ ফোঁ কবে নি। আর এই সব শ্রীদামদের নিয়ে সরকারও বাণিজ্য করছে, কমিউনিস্টরাও বাণিজ্য করছে। দেশ বলতে, দেশের লোক বলতে আগের দিনের সেই মমতা নেই। মিনিস্টাবদের বলতে যাও, তারা শোনাবে সংখ্যাতত্ত্ব, কিভাবে ঝড়েব গতিতে দেশ এগোচ্ছে তাব ফিরিস্তি। আর তোমাদেব বামপন্থীদের কাছে যাও, তাঁরা প্যাঁচ কষবে কিভাবে তাদের পার্টি জোরাল হবে।...আমাব মাঝে মাঝে কিবকম ভয় হয়। হয়তো দেশের লোকেরা এইবকমই চেয়েছিল, এইরকমই চায়, এই গোঁজামিল আর জোড়াতালি, এই সব কথার ধাপ্পা দেশের নামে।'

পবেশকে এবার ক্লান্ত দেখায়। অবসন্নভাবে মুখ বেজার বরে দাঁড়িয়ে থাকে। সেদিকে চেয়ে সুবোধ ডাক্তারের মুখেব ভাবখানাও পাল্টে যায়।

'বড্ড রাত করিয়ে দিলাম পরেশ। বড্ড দেরী হয়ে গেল তোমার। এই সব কথা জানো বুকের ওপর বড্ড চেপে বসে থাকে। একটু বলে হাল্‌কা হই।'

সুবোধ ডাক্তার উঠে পড়েন। পরেশ টপাটপ জানলায় ছিটকিনি আঁটতে থাকে। যেন আবার কোন কথা উঠে পড়বে এই ভয়ে ইজিচেয়ার-খানা দেয়ালের কাছে টেনে দেয়। সুবোধ ডাক্তার টুক টুক করে হাল্কা পায়ে অন্ধকারে ধোঁয়া আর কুয়াশায় মিলিয়ে যান।

প্রত্যেক দিনের মতো দরজায় তালাচাবি দিয়ে পরেশ কম্পাউণ্ডার পাশের দোকানে এক কাপ চা খেতে যায়। সেখানে পা দিতেই কানে আসে রেডিয়োর ঘোষণা, 'অস্ট্রেলিয়া ওয়ান হানড্রেড অ্যাণ্ড সেভেন্টি ফাইভ ফর টু।' আর ক্রিকেটে বিশেষ উৎসাহ না থাকলেও পাশে বসা লোকটিকে উৎসাহের সঙ্গে পরেশ বললে, 'ওয়ান হানড্রেড সেভেন্টি ফাইভ ফর টু।' বাঃ বেশ খেলছে তো!'

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে সে হাঁফ ছাড়ে। সুবোধ ডাক্তারের অপ্রীতিকর সান্নিধ্য থেকে সরে গিয়ে সে এখন তার নিজের জগতে প্রবেশ করেছে।

॥ দুই ॥

'আজও এল না!' সুবোধ ডাক্তার ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলেন।

'তাতে কি হল!' জলে পড়ে নি তো।' প্রমদাদেবী খাটের পাশ থেকে উঠে এলেন। খাটের পেছনে এক কোনে ঠাকুর ঘর করা হয়েছে। খাটের নীচে পটল আলুর ঝুড়ি, কয়েকটা সজনের খাড়া মাথা বের করে আছে, খাটের আর এক কোনে কোনো রকমে পাতা টেবিল, সেখানে নির্মলের ছোটো ভাই পরিমলের পড়ার ব্যবস্থা। দেয়াল ভর্তি তেত্রিশ কোটি না হলেও প্রায় শ'খানেক দেবদেবীর ছবি আর ক্যালেণ্ডার। দেয়ালের যে অংশগুলো ফাঁক সেগুলো আর কাঠের কড়িবর্গার আশেপাশে নোনা আর ছ্যাৎলা। তার ওপর চুনকাম করার ব্যর্থ চেষ্টায় কোথাও কোথাও চাপড়া চাপড়া নীল, কোথাও কালো। বাইরে একটা কলের প্যাঁচ কেটে যাওয়ায় দিবারাত্র জল পড়ার শব্দ।

দেশ থেকে আনা বিশাল ভারী রঙ-ওঠা আলমারীর ফাঁকে কাপড়ে উপচে পড়া আনলাটার সামনে দাঁড়িয়ে কাপড় ছাড়তে ছাড়তে ডাক্তার

বলেন, 'কি আছে সেখানে? আমার ভয় হয় কোন সাধুবাবার পাল্লায় পড়ল কিনা!'

প্রমদাদেবী খাটের ওপরে এসে বসলেন। দুবেলা রান্নার ধকল, পুজো আচ্চা সেরে এই সময়টা তাঁর আধ ঘণ্টার জন্যে ছুটি। খাটে বসেই বললেন, 'চিনি কিন্তু ফুরিয়ে গেছে।'

'ফুরিয়ে গেছে তা আমি কি করব?'

'তাহলে চা বন্ধ করে দাও।'

'তাই করব।'

'তুমি কোনদিন তাই করবে। ধার করে চা খাবে।' সুবোধ ডাক্তার সেদিকে কান না দিয়ে বললেন, 'নির্মলটা কোনো সাধু টাধুর পাল্লায় পড়ল নাকি?'

'পড়লে তো ভালই। সিনেমা আর আড্ডার চেয়ে…' ঘুমে তাঁর চোখ জুড়ে আসে।

সুবোধ ডাক্তার এক গেলাস জল খেয়ে স্ত্রীর পাশে এসে বসলেন খাটে। একবার নিজের গালে হাত বুলোন আর চোয়ালের চুঁচলো হাড়গুলো হাতে বেঁধে। 'প্রমোদ, আমি বড্ড বুড়ো হয়ে গেছি, না?'

'গাল ভেঙে গেছে বলেই বড্ড বিশ্রী দেখায়।'

'খুব রোগা হয়েছি কি?'

'কবে আর মোটা ছিলে?'

প্রমদার নিঃশ্বাস দ্রুত ওঠে পড়ে। কখনো কখনো মৃদু নাক ডাকার মতো আওয়াজ আসে। সুবোধ ডাক্তার একবার নিস্পৃহভাবে তাঁর ক্লান্ত স্ত্রী, খাট, আলনা, পটলের ঝুড়ি আর দেয়াল ভর্তি দেবদেবীর মূর্তির দিকে চেয়ে চেয়ে নিঃশ্বাস ফেলেন। হয়তো তাঁর স্ত্রীর মতো মেজাজ হলে মানসিক শান্তি পেতেন। তাঁর স্ত্রীকে বড়ো বেশী অভিভূত হতে দেখেন নি, সুখেও না দুঃখেও না। তাঁর মতে দেশের হালচাল ঈশ্বরের ইচ্ছায় এক রকম চলছিল এখন আর এক রকম চলছে। সবই ভগবানের হাত। মানুষ কি করতে পারে। একথা তিনি এতবার শুনেছেন কিন্তু এ সান্ত্বনায় তাঁর অস্থিরতা কমে নি। অন্তত দাদার মতো মানুষ শাঠ্যের আশ্রয় নিতে পারে, ব্যক্তিগত উচ্চাশার চরিতার্থতা লাভের জন্যে সবরকম শয়তানীর আশ্রয় নিতে পারে।

বলা বাহুল্য, দাদার এরকম রূঢ় সমালোচনায় শুধু পরেশই বিরক্ত নয়। প্রমদাদেবীও মাঝে মাঝে চটে ওঠেন, নির্মল মৃদু আপত্তি জানায়। নির্মল যুক্তি দেখায়, 'তোমরা বাবা স্বাধীনতার জন্যে আন্দোলন করছ আর জ্যাঠামণিকে সরকার চালাতে হয়। তোমাকে ঐ চেয়ারে বসালে তুমিও একই রকম হতে। তা না হলে থাকতে পারতে না।'

'আমি ও চেয়ারে…' অত্যন্ত অভদ্র কথা বলে ফেললেন সুবোধ ডাক্তার উত্তেজিত স্বরে।

নির্মল শান্তভাবে যুক্তি দেখায়, 'থিওরি আর প্র্যাকটিসে কিছু কিছু ফারাক থাকবেই। ভোটের জন্যে মানুষ যে সব প্রতিজ্ঞা করে তা মানতে গেলে সরকারকে দেউলে হতে হবে…তোমরা ভাবতে ইংরেজ তাড়ালেই দেশে স্বর্গ নেমে আসবে। দুশো বছরের জঞ্জাল তো একদিনেই সরানো যায় না।'

সুবোধ ডাক্তার ফুঁসে উঠেছিলেন, 'তুই যে তোর জ্যাঠামণির অ্যাসেমব্লি বক্তৃতা 'কোট' করছিস— সব হবে, আস্তে আস্তে হবে— একদিনে সব হয় না— সবই ঠিক আছে। গড ইজ ইন হেভেন অ্যাণ্ড অল থিংস্ রাইট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড।'

নির্মল আবার এতখানি যেতে পারে না। এতখানি যেতে তার নিজের বুদ্ধিবৃত্তি বিসর্জন দেওয়া বলে মনে হয়। আর পুরনো জামানার পিতা সংশয়ক্ষুব্ধ আধুনিক জামানার পুত্রকে ব্যঙ্গ করেন নির্মম ভাবে। 'আমার মনে হয় ভবেনের বদলে তুই তোর জ্যাঠামণির প্রাইভেট সেক্রেটারি হয়ে যা। তুই ইংরেজি-টিংরেজি শিখেছিস, সূক্ষ্ম বিচার করতে পারিস। আর ও ব্যাটার পেটে বোমা মারলেও কিছু বেরোবে না।'

'এটা তুমি বাবা আমার ওপর অন্যায় করছ।' নির্মল আহত স্বরে বলে।

'তুই যে-রাস্তায় যাচ্ছিস সে রাস্তা ঐদিকে।'

নির্মল চাপা উত্তেজনায় বললে, 'তোমার রাস্তায় যেতে গেলে আমার কমিউনিস্ট হতে হয়। আর কমিউনিস্টদের সঙ্গে আমার আউট-লাইনেই মিল। ভেতরে গেলে তাদের কথা আমি বুঝতে পারি না। তারা আমার কথা বুঝতে পারে না। বিশ্বাস করো, এই সুব্রত— একসঙ্গে খেলেছি

পড়েছি। বিপদে পড়লে তার কাছে পরামর্শ নিতে যাই। ওরকম সৎ ছেলে আমার চেনাজানার মধ্যে একটাও নেই। কিন্তু এক জায়গায় আমরা একেবারে আলাদা।'

'কারণ তুমি অপরচুনিস্ট। তোমার ব্যক্তিগত উচ্চাশা আছে, তার নেই।'

'অপরচুনিস্ট নই, তবে হয়তো হব।'

সুবোধ ডাক্তারের উত্তেজনা দপ্ করে নিভে যায়। গভীর বিষাদের সঙ্গে ছেলের দিকে তাকান। যখন সরকারি চাকরি ছেড়ে নিজের ডিসপেন্সারি খুলে বসলেন তখন নির্মল তিন-চার বছরের শিশু। আর সে যুগে বিবেকানন্দের লেখা লোকে খুব পড়ত। তাঁরও প্রায় মুখস্থ ছিল। তিনি মনে মনে আওড়াতেন, 'ইণ্ডিয়া নিড্স্ এ থাউজেণ্ড বিবেকানন্দ।' তিনি নিজে হয়তো আর পারবেন না, কিন্তু ছেলেকে সেই নিরবচ্ছিন্ন আপসহীন সত্যের সংগ্রামে এক অতন্দ্র সৈনিক হিসেবে কল্পনা করে আনন্দ পেতেন। এই এক হাজার বিবেকানন্দ কিরকমভাবে দেশ চালাবে, তাদের নিয়ন্ত্রিত কর্মপদ্ধতি কিরকম হবে সে সম্পর্কে তাঁর কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না। কিন্তু তিনি মানসলোকে প্রত্যক্ষ করতেন এবং এখনো করেন সেই এক আশ্চর্য ভারতবর্ষ যেখানে মানুষের সাধনায় সত্যই শেষ পর্যন্ত জয়ী।

তাঁর সেই স্বপ্নের সুদূরপ্রসারী অরণ্য অকস্মাৎ ন্যাড়া মাঠ হয়ে গেল যখন তাঁর দাদা রাজনীতিতে এলেন। প্রচুর অর্থব্যয়ে এক মায়াত্মক নির্বাচনী সংগঠন তৈরি করে নদীয়ার গ্রামাঞ্চল থেকে অ্যাসেমব্লিতে এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে এক ধূমকেতুর মতো আবির্ভূত হলেন। সুবোধ ডাক্তার চোখ রগড়ে সেই ন্যাড়া মাঠে শূন্য আকাশের নীচে ধড়মড় করে উঠে বসেছিলেন। তারপর নির্মলকে কেন্দ্র করে যেটুকু স্বপ্ন অবশিষ্ট ছিল তাও ক্রমশঃ ফিকে হয়ে আসছে।

'তোর স্বামিজীর কথা মনে আছে? স্বামিজী কি বলেছিলেন?' তিনি ছেলেমানুষের মতো বলে ওঠেন।

আর করুণামিশ্রিত হাসি আর সমবেদনায় নির্মলকেই বাপের মতো দেখাচ্ছিল। 'ওসব কথা আজকাল কেউ বলে না বাবা। ভোট পাবার সময় বলতে হয়, তারপর লোকে ভুলে যায়।' নির্মল শান্ত গলায় বলে।

'তাহলে…' সুবোধ ডাক্তার তাঁর হাতের কব্জি চোখের সামনে ঘুরিয়ে

ঘুরিয়ে বলেন, 'ইংরেজের হাতে এই মারের দাগগুলো মিথ্যে? আমরা অ্যাদ্দিন যা ভেবেছি করেছি সব আজগুবি? কতকগুলো গর্ভস্রাবকে সিংহাসনে বসাবার জন্যে নিজেদের সর্বস্ব দিয়েছি?'

'তুমি ভুল করছ বাবা। পাওয়ার করাপ্টস্। পাওয়ার নিলে তুমিও পালটে যেতে।'

'ডোণ্ট এপ্ ইওর জ্যাঠামণি,' একেবারে ফেটে পড়লেন সুবোধ ডাক্তার। 'এসব কথা স্বাধীনতা পাবার পর যে ব্যাঙের ছাতার মতো প্যাট্রিয়ট গজিয়েছে সারা দেশে তাদের বলো। আমরা অমন রাজনীতিতে বিশ্বেস করি নি, করব না।'

'সুব্রত ও বলে এ আজাদী ঝুঠা হ্যায়।'

'ঝুঠা তো বটেই। যে দেশে মিনিস্টারের চিঠিতে ছেলে ভর্তি হয় স্কুল-কলেজে, চাকরির প্রমোশন হয়, সে দেশের আজাদী ঝুঠা নয়?'

'সব দেশেই হয়। আমেরিকাতেও হয়, রাশিয়াতেও হয়, ব্রিটেনেও হয়।'

'নির্মল, এটা আর্ম-চেয়ার পলিটিক্স্ নয়। দেশটা খুব একটা সাংঘাতিক ব্যাপার। আমাদের সময় আমরা সবাই এ নিয়ে ভেবেছি, যাকে বলে আলোড়িত হয়েছি। আর তোরা কি করবি? খালি কেরিয়ার করবি, একে ওকে ধরে কয়েকশো টাকা ওপরে ওঠবার জন্যে প্রাণপাত করবি?'

'আমরা প্রোডাকশান করব, অর্গানাইজ করব, স্ট্যাণ্ডার্ড অফ লিভিং বাড়াব।'

সুবোধ ডাক্তার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন, 'ইউ আর লস্ট নির্মল। তোকে তোর জ্যাঠামণির মতো কথার ভূতে পেয়েছে, আমাকেও পেয়েছে।···আর কিরকম সব মজার কথা বেরিয়েছে বাজারে! রোজ খবরের কাগজের পাতায় পাতায় কিলবিল করে। তুই ফরেন এক্সচেঞ্জ সেভ করবি না?'

নির্মল বিহ্বলভাবে বিদ্রূপে বিস্ফারিত বাপের চোখের দিকে তাকায়। তারপর ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়ে বলে, 'তোমায় বুঝতে পারছি না।'

'শুধু কথায় চিড়ে ভেজে না রে, একবার দু-চোখ খুলে মানুষের দিকে তাকা।'

'তাকাচ্ছি তো, কিন্তু তোমার মতো ভাবতে পারছি না।···অবশ্য বাংলাদেশের অবস্থাটা একটু বেকায়দার। তার জন্যে পার্টিশন দায়ী।'

'তার জন্যে দেশের লোক দায়ী নয়।'

'তবে কে দায়ী বলো?'

সুবোধ ডাক্তার একটু চুপ করে থাকেন।

দেয়ালের দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বলেন, 'দেশের জন্যে মনের মধ্যে একটা স্বপ্নের দরকার আছে। শুধু এফিশিয়েন্সিতে তোর জ্যাঠামণি পর্যন্ত হওয়া যায়। আর বেশী কিছু হওয়া যায় না।'

তার বাপের এই শান্ত স্বর নির্মলের ভালো লাগে।

স্বামীর পাশে খাটের বাজুতে ঠেস দিয়ে প্রমদা তন্দ্রাচ্ছন্ন। কিন্তু তিনি ঘুমোচ্ছেন না। কিছুকাল হল সন্ধের সময় সারাদিনের খাটুনির পর তাঁর অবস্থাটা এরকম হয়। এক প্রবল ঝিমুনির মধ্যে অতীত আর বর্তমান মিলে যায়। তিনি এখন যেমন খাটের ওপর ঝিমুতে ঝিমুতে আসলে মাছ কুটছেন ফরিদপুরে, তাঁদের গ্রামে বাঁধাবাড়ির উঠোনে। বঁটির ওপর উবু হয়ে বসে বসে তাঁর মাজা ধরে গেছে। ঘোমটার ফাঁক দিয়ে তাঁর সুডোল কুড়ি বছর বয়সের ফর্সা হাত-দুখানার দিকে নিজেই মুগ্ধ হয়ে চেয়ে আছেন। পাশে দুই জা-ও মাছ কুটছে। আট-দশটা এক বিঘত কই একটার পর একটা আছাড় মারছে মাটিতে মেজো-জা, আর গাল পাড়ছে, 'মরণ হয় না মাছের, মরণ হয় না মাছের।' সামনে তিন-চারটে মাছের স্তূপ— রয়না, পাবতা, কালবাউস, ভেদা, কই, সরল পুঁটি ··আরো যেন কি কি মাছ ছিল প্রমদার বিস্মরণ হয়েছে।

'উল্টে পড়বি, উল্টে পড়বি' প্রমদা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন।

সুবোধ ডাক্তার বিরক্ত হন। 'আবার ঘুমের মধ্যে চেঁচাচ্ছ? আবার মাঝ রাত্তিরে দেখি উঠে বসে আছ। তুমি একটা ভিটামিন খাও। ঐ তাকের ওপর আছে, কদ্দিন থেকে বলছি।'

আসলে প্রমদা তার মেজো জাকে সাবধান করে দিলে। সে নৌকো নিয়ে চলেছে পায়খানায় কিন্তু এমন খেয়ালী— দাওয়া থেকে তার মোটা শরীর নিয়ে একেবারে ঝাঁপ খেয়ে পড়ল নৌকোয়। নৌকো টলমল করছে। সামলাতে গিয়ে একধারে কাত হয়ে পড়ল। দাওয়ার নীচেই একগলা জল। পড়লে কিছু না, মাছের মতো সাঁতরায় জা-টা, তবে এই ভোর-

বেলাতে তার অনেক কাজ, এখনি পুজোর জোগাড় দিতে হবে। 'উল্টে পড়বি, উল্টে পড়বি,' আবার চিৎকার দিল প্রমদা। না, সামলে নিয়েছে, বৈঠা বাইছে মেজো জা। তিরিশ চল্লিশ হাত দূরে জলের ওপর আমগাছ-গুলোর মাথা জেগে আছে। মেজো জা সেদিকে মিলিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ থেকে একটা মশা প্রমদার বাঁ গাল তাক করে ঘুরছিল। এবার কামড়াতেই চুলকোতে চুলকোতে উঠে বসলেন। জলে ভরা বাঁধাঘাট মিলিয়ে গেল। খাটের পাশে সুবোধ ডাক্তার তাঁর টাক আঁচড়াচ্ছেন সযত্নে। দু-গাছি চুলের জন্যে তাঁর প্রবল যত্ন।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। 'কে?' টাক-আঁচড়ানো বন্ধ মুহূর্তের জন্যে। শব্দ মিলিয়ে যায় ওপরের দিকে।

'নির্মল কি গাঁজায় দম দিচ্ছে বরানগরে?'

প্রমদার তন্দ্রা ছুটে যায় ঘড়িধরা নিয়মে। 'আলু নেই খেয়াল আছে?'

'নেই তো নেই।' দু-গাছি চুলেও ঢেউ দিয়েছেন সুবোধ ডাক্তার। তারপর দরজার ওপরেই বিবেকানন্দের ছবিখানার দিকে চেয়ে চোখ বুজলেন।

'কোথায় চললে?'

'সার্বজনীনে, বেটারা সেনগুপ্তকে বাদ দেবে।'

'তাতে কি হয়েছে?'

'তাতে কি হয়েছে? তুমিও আমার কম্পাউণ্ডারের মতো কথা বলছ? শোনো···স্টার থিয়েটারে নিভাননী প্লে করছে, আমরা রোজ যেতাম। এই যে এখন আর্ট করে খুব বিখ্যাত হয়েছে, যামিনী রায় গো। সবাই যেতাম একসঙ্গে। নিভাননীর প্লে করতে করতে হাতে-পায়ে খিল ধরেছে। আমরা গেলাম দলবলে গ্রীনরুমে। সেনগুপ্ত পা টিপে দিচ্ছে। আমাদের দেখল, একটু নড়ল না। একবার হাত উঠল না সেনগুপ্তর। একে বলে চরিত্রবল। এ কি অ্যাসেমব্লির বক্তিমা!'

সিঁড়ির ধোঁয়া ঠেলে একটা লোক উঠছে। 'মা, এলাম।' নির্মলের মুখখানা খুব তাজা। গঙ্গার ধারে তার এ-কদিনের স্বাস্থ্যসঞ্চয় যে মাঠে মারা যায় নি তা স্পষ্ট।

'কোনো মাতাজীর শিষ্যটিষ্য হোস নি তো?' সুবোধ ডাক্তার সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললেন।

প্রমদা চুপচাপ, মায়ের দিকে চেয়ে নির্মল হাসবার চেষ্টা করে। 'চুপ করে আছ যে?'

'তোমার মতো নেচে বেড়াব? বুড়ো বাপকে দিয়ে বাজার করাচ্ছি, খেয়াল আছে? একটু আলু নিয়ে এসো মোড় থেকে। এখনো খোলা আছে দোকান।'

নির্মল একবার বিহ্বলভাবে তাকায় মার দিকে, তারপর বাজারের থলিটা হাতে বেরিয়ে যায়।

॥ তিন ॥

সাহিত্য পড়ানোর ব্যাপারে নির্মলের সামনে সবসময়ে এক অদৃশ্য বাধা থেকে যায়। এক প্রাতঃস্মরণীয় ইংরেজী অধ্যাপকের বিখ্যাত উক্তি—'ছাত্রগণ কলাবউসদৃশ, তার পক্ষে মানা মুশকিল। যে যুগে এক-এক প্ল্যানে দেশ ক'হাত সামনে লাফ মারল তা গজ-ফিতে দিয়ে মাপা হয় প্রতি বছর, সে যুগে সাহিত্য পড়ানোর আরো কোনো দৃঢ় ভিতের প্রয়োজন। সাহিত্য চর্চার কি খুব প্রয়োজন? উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে, সাম্প্রতিক ইংল্যাণ্ড কিংবা রাশিয়ায় তার হয়তো মানে থাকতে পারে। কিন্তু গত দশ-পনেরো বছরে মন্ত্রীদের কণ্ঠে, খবরের কাগজে বিয়ের বিজ্ঞাপনে, চাকরির জগতে এত বেশী টেকনলজির জয়যাত্রা স্বাগত এবং এতবার সাহিত্যভাবনা মানসিক আলস্যের নামে চিহ্নিত যে ছেলেছোকরাদের বুক চিতিয়ে সাহিত্যপড়া কিংবা পড়ানোর ইচ্ছে না থাকাই স্বাভাবিক। তাদের কলেজে যাঁরা ইংরেজী সাহিত্য পড়ান পার্টি-কর্মী গৌতম সেন, বিদেশ-ব্যাকুল প্রদীপ্ত মিত্র, যে ঝুড়ি ঝুড়ি কাঁচা কবিতা লেখে বাংলা ত্রৈমাসিকে আর ভাবে বিষ্ণু দে সুধীন দত্তের পরেই আধুনিক বাংলা কবিতায় তার স্থান, তারা কেউই বুক চিতিয়ে সাহিত্য পড়ায় না। নির্মল পড়ায় মরিয়ার মতো। ডুবন্ত মানুষের চিৎকার তাই তার গলায় মাঝে মাঝে ধরা পড়ে।

বরানগর থেকে ফেরার কদিন পরেই নির্মলের এই 'ভালো করে পড়ানো'র সদিচ্ছার পরীক্ষা হয়ে যায়। কলেজের কালচে বাদামী দেয়ালগুলো চোখ নিচু করে পার হতে হতে তার কানে আসে ডেঁপো কণ্ঠস্বর: 'নির্মল খুব মাঞ্জা দিয়েছে দেখেছিস?' নির্মল সাঁৎ করে দেয়ালের কাছ থেকে সরে আসে। ছারপোকারা পরিবার পরিকল্পনায় বিশ্বাসী নয় তা কলেজের আবহমান কাল চুনহীন বর্ণহীন দেযালগুলোর গায়ে তাদের চাকবাঁধা বাসা দেখলেই মালুম হয়। ছেলেটা যে সোজাসুজি তাকে নাম ধরে ডাকে নি সে-জন্যে নির্মল মনে মনে তাকে ধন্যবাদ দেয়। তাছাড়া কাকেই বা সে দোষ দেবে। সেও তো একবার যখন বি. এ. ক্লাসের ছাত্র ছিল তখন বাংলা অধ্যাপকের চাদর সজোরে টেনে ধরে বলে নি 'আপনার চাদরটা স্যার ফাইন!' নির্মলের বাইবেলের একটা লাইন মনে পড়ে, 'দ্য সেম্ মেজার উইল বি মিটেড আন্টু ইউ।'

এটা ছোটে ক্লাস তাই বাঁচোয়া। সেই দুশো মাথা আর চারশো চোখের অপ্রতিহত দেয়ালে মাথা ঠোকা নয়। স্পেশ্যাল ক্লাস, যারা টেস্টে ভালো করেছে— কলেজের সেই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সামনে তার সদিচ্ছার যাচাই হয়ে যাক। পনেরোটা ছেলের নাম ডাকতে বেশী সময় লাগে না। 'কবিতা প্রসঙ্গে একটা সাধারণ আলোচনা করব, এর সঙ্গে তোমাদের পরীক্ষার হয়তো কোনো যোগ নেই···কিন্তু' (নির্মল একবার ঠোঁট কামড়ায। কি দরকার ছিল. শেলীর 'প্যানথিজম' কীট্সের 'হেলেনিজম' ওয়ার্ডসওয়ার্থের আর একটা ইজম এই তো বাঁধাধরা রাজপথ যা তার প্রাতঃস্মরণীয় অধ্যাপকেরা চওড়া ফাঁকা রেড রোডের মতো বিছিয়ে দিয়েছেন তাদের সামনে তার ওপর দিয়েই পঞ্চাশ মাইল বেগে তার অধ্যাপনার গাড়ি উড়িয়ে যাওয়াই ভালো ছিল নয় কি?) একবার গলা খাঁকারি দিয়ে বলে 'তবে হয়তো সাহিত্যের ব্যাপারটা বুঝলে কিছু কাজে লাগতে পারে' (যেখানে পরীক্ষার নম্বর একমাত্র ছাত্র-শিক্ষকের মাঝখানে সেতু সেখানে এ ধরনের আবেদন একটু অপ্রাসঙ্গিক নয়?)

নির্মল পেছন ফিরে বোর্ডে লিখতে থাকে:

O Rose, thou art sick:
The invisible worm

That flies in the night
In the howling storm

চকটা ভাঙে, একটা-দুটো মন্তব্য কানে আসে, 'শুধু ওয়েস্ট অফ টাইম, আমরা পণ্ডিত হতে চাই না, পরীক্ষায় পাস করতে চাই।' নির্মল থমকায়। প্রয়োজন আছে এসব কথা বলার? একবার মুখ তোলে, বিরক্তি অবসাদ বিমূঢ়তা যেন সব চোখ ছেয়ে আছে। ছাত্রগণ কলাবউসদৃশ একবার মনে মনে আওড়ায় সে। কবিডোরে যেন মহাশূন্যে গৌতম সেনেব মুখখানা ভাসতে ভাসতে চলে যায়। 'আবার সেই সাব্‌জেকটিভ ওয়ার্ল্ডে নিজেকে প্রোজেকশান? এ বোড দ্যাট্ লিড্‌স্ নোহোয্যার।' গৌতমের সেই স্বাভাবিক পরম পিতার কণ্ঠ নির্মলেব কানে বাজতে থাকে। নির্মল ঘুরে দাঁড়ায়। লোকাল ট্রেনে দাদেব মলম বিক্রেতাব গভীর স্থৈর্য ও বিনয় আয়ত্তে আনতে চেষ্টা কবে। ক্লাসেব প্রতিকূল অবস্থায় সে নিজেকে দাদের মলমওয়ালার পর্যায়ে দাঁড করিয়ে কবিয়ে বল পেয়েছে। কবিতার মলমের দর আজকাল পড়ে গেছে। বড়ো বড়ো বিজনেস হাউসেব মদৎ নেই তাব পেছনে। কিন্তু উইলিয়াম ব্লেক বা আণ্ড্ মার্ভেল সাহেবের কবিতার মলম ও হাতকাটা তেল অনেক মনেব রোগ সারাতে সক্ষম। তবে খুব সাবধান, নকলে বিশ্বাস করিবেন না। শেলীর প্যানথিজম, কীট্‌সের হেলেনিজম এইসব বাঁধা গত নকলি মাল। এ হল গৌতম সেনেব বাস্তা, হেড অব দ্য ডিপার্টমেণ্ট হবাব বাস্তা। এগুলো মুখস্থ কবলে পরীক্ষায় পাস করা যায় কিন্তু মনের রোগ সাবে না। কবিতা আর বাডন্ত গাছ থাকে না, হয় বাসি বেলফুলের মালা। নির্মল আব একবার বুকভরে নিঃশ্বাস নেয়, আর একবার চক ভেঙে লেখে:

Has found out thy bed
Of crimson joy,
And his dark secret love
Does thy life destroy.

নির্মল তাব কবিতার মলম বেচে, ইংরেজীতে নিচু গলায়। ছাত্রেরা প্রায় করুণায় তার কথা শোনে যেমন লোকাল ট্রেনেব যাত্রী নিজেদের কোনো রসাল গল্প বিপন্ন করেও ক্যানভাসারের কণ্ঠে আকৃষ্ট হয়। সামনের

বেঞ্চে কয়েকজন ছেলে নোট নেয়। একটি ছেলে হুমড়ি খেয়ে লিখছে যেন নির্মলের প্রত্যেকটা কথা চাবি দিয়ে বাক্সবন্দী করবে। সেদিকে চেয়ে একটু মুষড়ে গেলেও নির্মল থামে না। 'একটা খুব প্রাথমিক কথা, ভাষা ও ভাবের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের কথা আমরা আলোচনা করব। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ভাবের উদয়, আবার একই যুগে বিভিন্ন মেজাজের কবি। বিশেষ কবির ব্যক্তিত্ব বিশেষ গঠন আশ্রয় করেছে এবং বলতে গেলে বিশেষ ভাষার স্বষ্টি করেছে। কবিতার এই কারণে মৃত্যু নেই কারণ তা যখনই সার্থক তখনই তা নতুন ভাব ও ভাষার সংপৃক্ত সমন্বিত রূপ। একই প্রেম, একই মৃত্যু, একই ভগবদ্ ভক্তি— তার ওপরে উইলিয়াম সেক্সপীয়র, উইলিয়ম ব্লেক কিংবা আণ্ড্রু মার্ভেল। যেমন···নির্মল আবার বোর্ডের দিকে ফেরে। আবার পেছন থেকে চাপা গুঞ্জনের ঢেউ। নির্মল দেখেছে কথা বলা, হাত-পা নাড়ানো, চোখ তুলে চাওয়া এগুলো সব মিলে বোধ হয় মনের ওপর একটা চাপ স্বষ্টি করে, পিঠ ফিরলেই সে চাপ বেড়ে যায়। 'বড্ড বাড়াবাড়ি করছে রে···' বোধ হয় সেই সারা বছর গলায় মাফলার জড়ানো বয়স্ক ছেলেটার গলা। 'বড্ড ইনভলভ্ড্, ঠিক পিনপয়েন্ট করতে পারছে না,' এটা নিশ্চয় অমলের—এ ক্লাসের বোধ হয় সবচেয়ে ভালো ছেলে। নির্মল আবার হোঁচট খায়, পিনপয়েন্ট মানে কি? এটা কি বিজনেস হাউসের বোর্ড মিটিং যেখানে তিনটে কি চারটে ড্রিলিং মেশিন বসাবার টেণ্ডার ডাকতে হবে? আবার চক ভাঙে:

> O, lest the world should task you to recite
> ('আমাদের আর তিন মাস বাকি আছে স্যার!')
> What merit lived in me, that you should love,
> After my death, dear love, forget me quite,
> ('স্রেফ্ স্টান্ট!' 'চালাকি করে মহৎ কাজ হয় না!')
> For you in me can nothing worthy prove;
> Unless you would devise some virtuous lie,
> To do more for me than mine own desert,

নির্মল বরাহ বেগে ঘুরে দাঁড়ায়। গত তিন লাইন লিখবার সময় পেছনের বেঞ্চি দুটো ভেঙে যাবার জোগাড়। তালে তালে পা ঘষার

সাথে সাথে গা দোলানো যেন কবিতার যতির সঙ্গে সংগৎ। উইলিয়াম সেক্সপীয়র ভোঁ দৌড় দেয়। নির্মল স্থির। আহত জন্তুর কাতরতা তার চোখে নেই, বরং সে এক বিতৃষ্ণার পাহাড়। চোখে অবজ্ঞা, চিবুক আরো ছুঁচলো, ঠোঁটে বিদ্রূপ। এ অবজ্ঞা যেন সামনের অপ্রস্তুত ছেলেগুলোর দিকে চেয়ে নয়, যাদের পাগুলো এখনো ইতস্ততঃ নড়ছে, যারা নির্মলের অকস্মাৎ মুখ ফেরানোর সঙ্গে সঙ্গে তাদের অঙ্গসঞ্চালনে ব্রেক কষতে এখনো অপারক। এ অবজ্ঞা তার নিজের দিকে চেয়ে। এই পা-দাপানি গা-দোলানি আর এখন এই মুখতোলা মোসাহেবী—এগুলো যেন তার কবিতা পড়ানোর প্রকাণ্ড ব্যর্থতার প্রতিচ্ছবি। এরই দর্পণে নির্মল নিজেকে দেখে একজন ব্যর্থ মানুষ। এর চেয়ে···নির্মল ভাবে···এর চেয়ে ভবেন গাঙ্গুলী হতে আপত্তি কি?

নির্মল ঘড়ির দিকে দেখে আর মিনিট দশেক বাকি। আর মিনিট দশেক তানা-না-না করে কাটিয়ে দিলেই চলে। কিন্তু নির্মল আজকের পরাজয় ঠিক মেনে নিতে পারছে না। সে ক্ষেপে উঠেছে। হঠাৎ ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের ক্লাসিজম-এর ওপর বক্তৃতা সুরু করে। 'ওয়ার্ডসওয়ার্থ টিয়ার্স ওপন্ এ প্যাসেজ টু ইনফিনিটি বাই ট্রিভিয়াল মিনস্।' তারপর ইংরেজী শব্দের হীরক খণ্ড ছিটোতে থাকে যেমন 'স্পেকট্রাল ফিগার্স থ্রবিং উইথ ট্রেমুলাস্ ভাইটালিটি, মেটাফিজিকাল পার্সেপশান অফ ইউনিটি ইন ডাই-ভারসিটি বা ইন্টুইটিভ্‌নেস অফ ডিসকভারি গিভিং কমনপ্লেস্ এ টাচ অফ রোম্যান্টিক গ্ল্যামার।'

নির্মল মাতালের মতো বলে যেতে থাকে আর ক্লাসের মধ্যে একটা বিপ্লব ঘটে যায়। ছাত্রেরা মাতালের মতো তার বাক্যসুধা পান করে। চারপাশ নিস্তব্ধ, শুধু খস খস করে লিখবার শব্দ। ছেলেবেলায় বাগবাজারে গঙ্গার পাড়ে এক ভাঁটিখানার স্মৃতি নির্মলের মনে অস্পষ্টভাবে ভেসে ওঠে। যে সব শব্দের আসলে কোনো প্রতিধ্বনি নেই, যেগুলো ঠাসা কবিতার কুঁড়ি নয়, রাত-জাগা বাসি ফুলের মালা, যা অনেক হাত-ফেরতা হয়ে আসছে, দশ বছর আগে যা তার মাস্টারমশাই বলেছেন তার তিরিশ বছর আগে কোনো ইংরেজ সমালোচক বলেছেন, সেই কাগজের গোলাপ অনেকের মতো নির্মল সাজায় তার ক্লাসে। আর চমকপ্রদ ফল ফলে। ছেলেরা দুর্ধর্ষ

গতিতে লেখে, সশ্রদ্ধভাবে তাকায়। নির্মল ঘড়ির দিকে চেয়ে বিদ্রূপের হাসি হাসে। তিন বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্রের এটা অন্যতম প্রশ্ন। আবার নোংবা দেয়ালগুলোর দিকে তার দৃষ্টি পড়ে। শব্দের ভাঁটিখানায় বসে আছে তারা সবাই।

টিচার্স রুমে এসে নির্মল হাঁফায় পরিশ্রমের জন্যে নয়, ব্যর্থতায়। যেন তার সারাদেহ জুড়ে হাই ওঠে। গা এলাতে গিয়ে চেয়ারটার নড়বড়ে পায়া সম্পর্কে সজাগ হবার সঙ্গে সঙ্গে গৌতম সেনের মুখখানা তার কাঁধের ওপর নেমে আসে, 'কি ব্রাদার ডনকুইকসোট, কি রকম রাজ্যজয় করছ?'

তারপর শিক্ষিত ভারতীয় মধ্যবিত্ত আজকাল তাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপাব যে রকম দো-আঁশলা ভাষায় ব্যক্ত করে তেমনিভাবে গৌতম বলে যায়। 'এসব পিস্-মিল সলিউশান হয় না ব্রাদার। দ্য ফোবমোস্ট থিং ইজ রেভল্যুশান, আর বাকি যা সব তা হল ব্রতচারীব 'চল্ কোদাল চালাই'। সাহেবদেব সময়ে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটবা যে রকম হাফপ্যাট পরে কচুরীপানা তুলতে নামতেন সেই রকম আনবীয়াল।'

নির্মল আগেও তর্ক করেছে, কিন্তু তাব ফলে দু-তিন দিন কথা বন্ধ হয়ে গেছে। গৌতমেব ফসা ধারাল মুখেব বাঁকা বিদ্রূপেব ধার তাতে কমে নি। বিপ্লবের অজুহাতে মাস্টাবমশাই ভালো করে পড়াবেন না বা গতানুগতিক ধারাই কেবল অনুসরণ করবেন এ যুক্তি নির্মল কোনো কালেই মানতে পারবে না যদিও তাব স্বাভাবিক মেজাজেব ধাবে এই অসত্যটা গৌতম আরো অনেক সত্য আব অর্ধসত্যের সঙ্গে বেশ মানানসই ভাবে মিলিয়ে দিতে পাবে। সাম্যবাদ আর কাজে ফাঁকি দেওয়া এ-দুটো পাশাপাশি এতই বেমানান যে এ রূপটা নির্মলের কাছে দাঁড়ায় যেন দামী স্যুট-টাই-পরা আগাগোড়া তিলক-লেপা-কপাল কোনো তামিল ব্রাহ্মণ যে তুবঙ্গ গতিতে ইংরেজী বলে অথচ যার কথা ইংরেজের কাছে প্রায় দুর্বোধ্য। অথবা নির্মল গৌতমের কথায় সাড়া না দিয়ে সিগারেটে টান দিয়ে ভাবে সাম্যবাদ আর মানসিক আলস্যেব যেভাবে মিল তেমনি কি মিলে নেই তার সাহিত্য পড়ানোর অভিলাষ আর কলেজের পারিপার্শ্বিক?

'এসব না করে ব্রাদার কলেজে একটা কালচারাল সাব-কমিটি করো', গৌতম বললে।

এটা তার নতুন কথা। নির্মল চোখ তুললে, 'সাব-কমিটি ?'

'হ্যাঁ, কলকাতায় গত ইলেকশানে ছাব্বিশটা সীটের মধ্যে এতগুলো সীট পেলে বামপন্থীরা যারা ভেগ্‌লি হলেও সাম্যবাদে বিশ্বাসী। কিন্তু আমাদের ভ্যালুজের দিক থেকে সেই সুচিত্রা সেন আর উত্তমকুমার, সাহিত্যেও সেই ইন্‌ফ্যান্টাইল ন্যাকামি। বাংলা বই মানে সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তির বিসর্জন, ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে তো প্রসঙ্গই ওঠে না, এ ডেড্‌ হোয়েল ওয়াশ্‌ড অ্যাশোর— আমরা কাকের মতো তার গা খুঁটছি।'

গৌতম যখন কথা বলে তখন নির্মল টের পায় তার রাজনৈতিক মতবাদের ঘোরতর বিরোধী হয়েও তাকে কেন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল এত খাতির করেন, ক্লাসে সম্পূর্ণ ফাঁকি দিয়েও সে কেন ছাত্রদের আর সহকর্মীদের এত প্রিয়।

'আচ্ছা গৌতম, তুমি এখানে পড়ে আছ কেন ?' নির্মল গৌতমের লম্বা ফর্সা আঙুলগুলোর নাচানির দিকে চেয়ে চেয়ে বলে, 'তুমি যে দিকেই যাবে 'শাইন' করবে···'

'বিকজ্‌ আই বিলিভ্‌ ইন্‌ রেভলিউশ্যান', এমনভাবে গৌতম বললে যেন সে 'ইন্টারভিউ' দিচ্ছে সাংবাদিকদের।

নির্মলের উৎসাহ দপ্‌ করে নিভে যায়। ক্লান্ত গলায় বলে, 'রেভলিউশান মানে তো কালচারাল সাব-কমিটি, ক্লাসে ফাঁকি'···

'তুমি সেভাবে দেখতে পার, কিন্তু আমরা দেখছি আমরাই পুরনো জঞ্জাল সরাচ্ছি, আমরাই দায়িত্ব নিচ্ছি দেশের ভবিষ্যৎ গড়বার সমস্ত স্তরে, শিক্ষক ছাত্র মধ্যবিত্ত শ্রমিক চাষী ; — সমস্ত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি পাল্টে গেছে—'হিস্ট্রি ইজ অন আওয়ার সাইড··· ।'

'আওয়ার' মানে ?'

'মানে আমরা, আমাদের পার্টি আমাদের ফ্রন্ট, সমস্ত ডেমোক্র্যাটিক পিপলস্‌ অফ্‌ দ্য ওয়ার্ল্ড···।'

নির্মল যেন বুঝতে চেষ্টা করে। তারপর আস্তে আস্তে বলে, 'এ রকম জ্যাঠামণিও বলেন। বিশ্বেস করো, একদম এক কথা— খালি তোমাদের ডেমোক্র্যাসিতে আমেরিকান সরকার পড়ে না আর জ্যাঠামণির ডেমোক্র্যাসিতে রুশ সরকার পড়ে না। কিন্তু তোমাদের বক্তব্য অবিকল

এক। তোমরা দুজনেই সারা পৃথিবীর লোককে দুই বেহেস্তে নিয়ে যাচ্ছ।'

গৌতম হঠাৎ জলে ওঠে, 'তোমার জ্যাঠামণির কথা বোলো না। হি ইজ অ্যান ইডিয়ট।'

নির্মলের মুখখানা কঠিন দেখায়। তারপর ধীরে ধীরে বলে, 'হতে পারেন। তবে তাঁদের তোমাদের বক্তব্য এক।...আর সত্যিই তো,... আবাদী কংগ্রেস সেশনের প্রস্তাব আর তোমাদের পার্টি কংগ্রেসের প্রস্তাব অনেক জায়গাতেই প্রায় একটু কথার অদল বদল।...আমার কি মনে হয় জানো— তুমি হয়তো হাসবে— কথার মানেগুলো সব হারিয়ে গেছে, শুধু তার আওয়াজ আছে।'

গৌতম আবার চেঁচিয়ে উঠল, তোমার এসব হেঁয়ালী ফিলজফিকাল অ্যাব্‌স্ট্রাকশানে কিচ্ছু এসে যায় না। হিস্‌ট্রি ইজ ডিটারমিন্‌ড বাই কংক্রীট অ্যাক্‌শান।'

'সে অ্যাকশানটা কি?'

'অ্যাকশান মানে...'গৌতম একমুহূর্ত ইতস্ততঃ করে। নির্মল বললে, 'অ্যাকশান মানে জ্যাঠামণি বলবেন জনজাগরণ, তোমরা বলবে গণ-আন্দোলন।'

'তুমি কি সত্যিই বলছ নির্মল, কংগ্রেস আর কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে, কংগ্রেস আর সমস্ত বামপন্থী পার্টির কোনো পার্থক্য নেই?'

'হয়তো কোথাও আছে, কিন্তু তাদের বক্তব্যে কোনো অমিল নেই। দুজনেই ল্যাণ্ড রিফর্ম চায়। দুজনেই শিল্পের জাতীয়করণ চায়।'

'তারা চায় না, আমরা চাই।'

নির্মল সজোরে নিঃশ্বাস নিয়ে বলে 'তা হয়তো বোঝা যাবে পরে— আজি হতে শতবর্ষ পরে। ইতিমধ্যে তোমরা দুই পক্ষ সারা ভারতবর্ষ জুড়ে একই কথা বলে যাচ্ছ। আমার কাছে তাই একটা কথাই মনে হয়।' নির্মলের ক্লান্ত মুখখানা উজ্জ্বল দেখায়। এতক্ষণ পর যেন সে কোথাও আশ্রয় পেয়েছে।

গৌতম বেজারভাবে বলে, 'কি কথা?'

'কথার মানেগুলো সব হারিয়ে গেছে। শুধু তার আওয়াজ আছে।'

॥ চার ॥

যদি বলা যায় চিঠির মধ্যে দিয়ে কোনো মানুষকে পাওয়া যায় তাহলে কথাটা বড়ো সৌখীন লাগে। কারণ এমনিতেই পাশাপাশি বাস করেও মানুষ কি পারে পরস্পরের মাঝখানে দুর্মর দেয়াল ডিঙোতে? সব সময়েই কি সে পাঁয়তারা কষে না সে দেয়াল ডিঙোতে কিন্তু ঠিক যেন ডিঙোনো হয় না। শরীরেব কোনো অঙ্গের বৈকল্যে পাশাপাশি ঠিক আসা যায় না। অনেক ডনকুইক্সোট চেষ্টা করে যায়, সহস্র সহস্র সংগম কিংবা লক্ষাধিক চুম্বনের মারফত, পাতার পর পাতা চিঠি লেখা কিংবা কাঁদাকাঁদি করে বাঁচাব মারফত। কেউ কেউ আঁচড়ে কামড়ে হাঁই হাঁই করে মিলিত হতে চায়। কিন্তু এ যেন একটার পর একটা বাধার ঢেউ সামনে। কবিতায় বেশ ম্যানেজ দেওয়া যায়। লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু— আহা যেন খবরেব কাগজের ঝলমলে হেডলাইন, বগলে করে এখনি চায়েব দোকানে গিয়ে উদ্দীপ্ত হয়ে পড়ি। কিন্তু লাখো কেন এক যুগেব মধ্যেই কি টানাপোড়েন, কি অন্তহীন পাঁয়তারা, কি অবিশ্রান্ত মানসিক কুচকাওয়াজ। হিয়ে কি হিয়ার ওপর থাকে? থাকে না। যৌবনের তপ্ত রক্তের হাওয়া পাল্টায় প্রতি দশকে দশকে কিংবা তারও আগে। শুধু কি বিতৃষ্ণা অবসাদেই হিয়ে বিরূপ হয় হিয়ার ওপর? বরং হিয়া আকর্ষিত হয় ত্রিভুবনের নতুন নতুন প্রসাদে। যারা শব্দের কোনো লৌহপাত্রে সত্যকে আবদ্ধ রাখতে প্রয়াসী তাঁরা বলবেন অস্তিত্বের এই কমিক কিংবা ট্র্যাজিক রূপের জন্যেই মানুষ আসলে একলা। কিন্তু একলা কি দোকলা বা হাজার লোক-লা তা ঠিক সমাজতাত্ত্বিকের অভ্রান্ত যুক্তিতে বলা না গেলেও একথাটা বলতে বোধ হয় কোনো বাধা নেই যে মানুষের মাঝখানে পরস্পর বাধা দূর করা খুব বেকায়দার ব্যাপার।

বস্তুত এসব কথা এমন কিছু আহা মরি নয় যে নির্মলের অজানা। চিঠিতে কাব্যি করায় তার ছেলেবেলা থেকে বিরাগ। এমনকি বোধ হয় করাচী কিংবা ঢাকা না হয়ে মেয়েটির চিঠি যদি দিল্লী কিংবা পাটনা থেকে আসত তাহলে বোধ হয় তার প্রতিক্রিয়া অন্য রকম হত। যে বিধানে

অকস্মাৎ একদিন রেডিয়োতে সে শুনলে আরো অনেকের সঙ্গে যে দেশের লোকের রান্নাঘর আর শোয়ার ঘরের মাঝখান দিয়ে প্রায় দড়ি টেনে দুটো দেশ বানানো হচ্ছে, আর কেউ লুঙ্গি পরে কিংবা ধুতি পরে, কেউ গোরু খায় কেউ খায় না। এই ভিত্তিতে একটা দেশ হঠাৎ দুভাগ হয়ে গেল, কতগুলো লোক হঠাৎ পাগলের মতো ভাবতে আরম্ভ করল যে দেশের আর কতগুলো লোকই সমস্ত অনিষ্টের কারণ তখন থেকেই দেশভাগের বিরুদ্ধে, প্রকৃতপক্ষে অশিক্ষিত মানুষের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে একটা রাগ ছিল তার মনে। মেয়েটার চিঠি প্রথম থেকে তাকে টেনেছিল কারণ বাংলা দেশ সম্পর্কে মমতায় আচ্ছন্ন চিঠিগুলোর মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন জ্বালা ছিল যা খুব ফ্যালনা নয়। সে জ্বালার হয়তো কোনো অবয়ব নেই কিন্তু আরো অনেকের মতোই নির্মল ভাবত এই জ্বালা হয়তো একদিন অবয়ব পাবে।

তাই যাকে বলে একটা 'হ্যাণ্ডিক্যাপ' রাজু পেয়েছিল। এই সুবিধেটা না থাকলে তার প্রথম দিককার আট-দশ পাতার বিরাট বিরাট চিঠি বোধ হয় নির্মল ঠিক দাড়ি কামাবার জন্যে ব্যবহার না করলেও বিশেষ পাত্তা দিত না। তবে একথা সত্যি একেবারে মামুলী কমবয়সী ভাবালুতায় আচ্ছন্ন হয়ে প্রায় প্যানপেনে চিঠির মধ্যেও মেয়েটার হঠাৎ হঠাৎ সাবালকত্বের ছাপ পাওয়া যেত। যেমন, 'আর এই লেখার বদ-অভ্যেস— এ যে কি অভিশাপ তা জানি আমি একা। লেখকেরা লেখে সৃষ্টির তাগিদে। আমার মতো বেহায়ার মতো লেখে কে? অর্থ নেই, উদ্দেশ্য নেই, কতগুলো অক্ষরের মধ্যে সান্ত্বনা হাতড়ে বেড়ানো।...আচ্ছা নির্মলদা, দার্শনিকেরা স্মরণাতীত কাল থেকে দেহ থেকে আত্মার মুক্তি কামনা কেন করেছেন? আমি যে প্রতিটি মুহূর্ত বলি, হেই ভগবান, আত্মার কাছ থেকে মুক্তি চাই আমি। ওটার কাছ থেকে 'ফ্রেঞ্চ লীভ' নেবার চেষ্টা হয় বই-কি—যেমন নিজের অজান্তে লোকের কুৎসা করছি, যা বুঝছিনে তার ওপর আলোকপাত করার চেষ্টা করছি কিন্তু কোথায় ভেতরে ঝিমিয়ে আসা চোখ পরমুহূর্তে ড্যাব ড্যাব করে তাকায় কেন?...মানুষে এমন বাজে বাজে কথা বলেছে কেন জনমভর— বলছে আঁধার থেকে আলো, ভুল থেকে সত্য— আমার মুণ্ডু — আমি দেখছি, ইলিউশন-এর মধ্যে, মনগড়া স্বপ্নের মধ্যেই ছিল বেঁচে থাকবার, লড়াই করবার প্রেরণা।'

আর একটা কথা চিঠির মধ্যে দিয়েও স্পষ্ট, মেয়েটা রুগ্ণ। তার অসুখটা খানিকটা কমবয়সী মনের ফোঁপানি হলেও বেশ কিছুটা শারীরিক। মেয়েটা যে মনেপ্রাণে স্বাস্থ্য কামনা করে সেটাও স্পষ্ট। দৈহিক স্বাস্থ্য লাভের জন্যে এ রকম ছটফটানি নির্মলকে স্পর্শ করে। ঠিক প্রেমিকা নয়, অনেক সময় কোনো অসুস্থ বোনের মতো লাগে মেয়েটিকে যে বিনিদ্র রাত জ্বরো চোখ মেলে কাটায়। আর এই স্বাস্থ্যের জন্যে তার আকৃতি মাঝে মাঝে তাকে বেশ একটা আটপৌরে চেহারা দান করে যেটা নির্মলের কাছে আকর্ষণীয়। যেমন সাম্প্রতিক কোনো চিঠিতে সে লিখেছে—'আমাকে শক্ত হয়ে দাঁড়াতেই হবে। যন্ত্রণাহীন মাথা নিয়ে জ্বরহীন রাতে ঘুমিয়ে উঠে পৃথিবীর দিকে চেয়ে দেখা যে কতখানি, তোমাকে বোঝাতে পারব না। আর কিছু না থাকুক ওটুকুই যথেষ্ট। নির্মল, দুটো মানুষের বিরতিহীন ভালবাসার টানাহেঁচড়ায় কত জীবনীশক্তি, কত অমূল্য তেজ ক্ষয় হয়, একে বাদ দিয়ে যদি আমি সুস্থ বোধ করি, আমাকে ঠাণ্ডা মৃত মানুষ বলবে তুমি? আমার বাচার পথ যদি হয় খবরের পাতা আলোচনা বই আর নিয়মানুবর্তিতা, আমাকে জড় বলবে তুমি?

'তোমাকে আর অচেনা বা দূরের মনে হয় না। আর আমাকে বুঝেছ তো? আমরা নির্মল ওদের মতো হব না যারা শুধু একটু নীড় বাঁধে, অবশিষ্ট স্বল্প জীবনীশক্তি খরচ করে ঘরকন্নার জন্য প্রয়োজনীয় শান্তির ক্ষয়ে। বন্ধুত্বের জন্যও ঝকৃকি পোয়াব আমরা। কষ্ট পাব তৃপ্তি পাবার জন্যে। রাজি?'

বস্তুত নির্মল গত দু-তিন বছরে যেন মেয়েটির প্রতি বিদ্রূপের ভঙ্গী থেকে এমন এক মনোভাবের মাঝখানে দাঁড়িয়েছে তাকে ঠিক ভালবাসা টালবাসা হয়তো বলা যায় না। কিন্তু এক প্রবল কৌতূহলে সে আবিষ্ট। আর তার এই আবিষ্টের ভাব তাকে কিছুদিন থেকে প্রায় অসামাজিক করে তুলেছে। বালীগঞ্জ প্লেসে গিয়ে খুকুমণির সঙ্গে গল্প, তার বরের টাক পড়েছে কেন এই দুঃখের শরিক হওয়ার চেষ্টা, জ্যাঠামণির তাকে বিলেতে পাঠানোর আগ্রহ, তার বাবার হঠাৎ পূর্ববঙ্গের রেফিউজিদের জন্যে ক্ষেপে ওঠা, তাদের ক্যাম্প কলোনীতে গিয়ে বিনে পয়সায় চিকিৎসা, এমনকি তার বাবার গত কয়েক মাসের হার্টের অসুখ, নিঃশ্বাসের কষ্ট, কলেজে গৌতম সেনের

কালচারাল সাব-কমিটিতে 'ধনতান্ত্রিক জগতের সংস্কৃতিচর্চা বনাম সমাজতন্ত্রে সংস্কৃতি বিকাশ' নিয়ে আলোচনা এর কোনোটাই ঠিক নির্মলকে ধরে রাখতে পারে নি। এমনকি গ্রাম থেকে ফেরার পর সুব্রতর সঙ্গেও বিশেষ কথাবার্তা হয় নি। সুব্রতর উৎসুক চোখের দিকে চেয়ে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে। খালি ক্লাসে সে পাগলের মতো প্রায় চোখ বুঁজে 'মেটাফিজিকাল পারসেপশান্ অফ ইউনিটি' 'ইন্টিগ্রেটেড হোল', 'কো-রিলেশন অফ টাইম অ্যাণ্ড স্পেস', এইসব যে বাহারে কথাবার্তা প্রচুর ইংরেজী লেখক সমালোচকের দৌলতে বাজারে বেরিয়েছে, সেগুলো আউড়ে যায়। সেইসব কথাগুলো ভার জিভ থকে বার হয়ে মাঝে মাঝে হাত-পা মুখ বার করে শূন্যে নেচে নেচে তার দিকে চেয়ে চেয়ে ভেঙ্‌চি কাটে। মুহূর্তের জন্যে নির্মল থমকে দাঁড়ায়, চোখ বন্ধ করে, আবার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের অন্তর্নিহিত গতির চাপ বা মোমেনটামে ঠোঁট খুলে একটার পর একটা শব্দ ছিটকাতে থাকে। বাড়িতে ফিরে আসে একটা অভুক্ত লোকের মতো। তারপর বাপ ডিসপেনসারীতে বেরোবার পর নির্মল সেই চিঠির তাড়া নিয়ে বসে। আর সেই সব চিঠিগুলো পড়তে পড়তে তার চার পাশের নিরেট সত্য পরিস্থিতি এবং সেখানে সঞ্চারমান মানুষগুলো লাগে বায়বীয় আর যে অশরীরী অস্তিত্ব চিঠির লাইনে লাইনে নিজেকে জানান দিচ্ছে তাকে ধরা যায় ছোঁয়া যায়।

রাজু একটা ছবি পাঠিয়েছে, 'বড্ড সেজেগুজে তুলেছি'— ফোটোগ্রাফের পেছনে লেখা। মাথার গড়ন ছোটো মানানসই, সেইজন্যে বোধ হয় চোখ দুটো খুব বড়ো লাগে। আরো বড়ো লাগে মুখের হাঁ। মুখের হাঁখানা একটু বড়োই। পাতলা হালকা চেহারা, একটু বেশী হালকা, সমস্ত শরীরটা দেখা না গেলেও ঠিক স্বাস্থ্যবতী যুবতী ভাবা মুশকিল। সিল্কের শাড়ি না পরে একটা সাদা হাফ শার্ট পরলে বোধ হয় তাকে আরো মানাতো। কারণ তার ঘাড়, উৎসুক চোখে তাকানোর মধ্যে এমন এক পরিপাটির অভাব আছে যা তরুণী-সদৃশ নয়। মেয়েটি যেন নিজেকে দেখতে বলছে না নিজেই দেখতে চায়। সেই জানলার বাইরে তাকানোর চোখ নির্মলকে যেমন একদিকে আকর্ষণ করে তেমনি একটু অবাকও করে। যেমন ধরা যাক, এয়ার হস্টেসদের চেহারা। তাদের পোশাকে চালচলনে একটা কেজো ছন্দ দেবার চেষ্টা। কিন্তু তাদের

আলাদা চেহারা বেশ নিরীক্ষণ করেই নির্মলের মনে হয়েছে যে সেই করিতকর্মা ভাবখানা ছাপিয়ে 'আমাকে দেখো' ভাবখানাই প্রবল। এ ভাবটা নারীত্বের এত অঙ্গাঙ্গী যে এর অভাবে নির্মলের একটু যে খারাপ লাগে না তা নয়। বা এর চিঠিগুলো অবলম্বন করে তার মনের মাঝখানে যে একটা স্বপ্ন জমে উঠেছিল তা চোট খায়। মেয়েটার চেহারা এমন যে তাকে নিয়ে যেন বিশেষ স্বপ্ন দেখা যায় না। সে যা নয় এমন কোনো ভূষণে তাকে ভূষিত করা যায় না অথবা তাকে নিয়ে কোনো বাড়াবাড়ি করা চলবে না।

কিন্তু মাঝে মাঝে এই নিরবয়ব চিঠি আর ফোটোগ্রাফের বিরুদ্ধে নির্মলের অন্তরাত্মা প্রবল বিদ্রোহ করে। সে চিঠি লেখা বন্ধ করেছে। তখন তার নীরবতায় ঠাট্টা করে চিঠি এসেছে ওদিক থেকে। সে যে রাজুকে নিয়ে একটা স্বপ্ন দেখতে ভালবাসে তা বুঝি ধরা পড়ে গিয়েছে আর সেজন্য তাকে ঘন ঘন পরিহাস। আবার পরিহাসটা বোধ হয় অসুখের চাপে কিছু পরিমাণ সিরিয়াস হয়ে যায়। 'আমার বাঁচার পথ যদি হয় ঘাসপাতা আলোছায়া বই আর নিয়মানুবর্তিতা, আমাকে জড় বলবে তুমি?' তাহলে থাকো না চুপ করে। এই উদ্ভিদসদৃশ জীবন নিয়ে (উদ্ভিদসদৃশ কথাটা নির্মলের নয়, বোধহয় মার্কসের কোনো চিঠি থেকে সে ব্যবহার করে)। নির্মলকে কেন মিছিমিছি জ্বালাতন করা বছরের পর বছর তার অশরীরী উপস্থিতি দিয়ে—নির্মল মনে মনে যুক্তি দেখায়। সে প্রেত চায় না পরীও চায় না, সে চায় মানুষ। আর মানুষের যে বন্ধুত্বের প্যাটার্ন, যে ঘরসংসারের প্যাটার্ন তৈরি করেছে তার মাঝখানে সে চায় দাঁড়াতে। রাজু ঠিকই লিখেছে, দুটো মানুষের মাঝখানে বিরতিহীন প্রেমের টানাহ্যাঁচড়া…' কিন্তু তার আপত্তি তো এইখানে, এই অশরীরী যোগাযোগের সঙ্গে প্রেমেরও কোনো যোগা-যোগ নেই। রাজু একবার কলকাতায় আসুক। একবার তারা পরস্পর ভালভাবে কথা বলুক। তখনই বোঝা যাবে তারা পস্পরের কাছে প্রয়োজনীয় কিনা। নইলে এভাবে দুজনের সময় নষ্ট করে লাভ? মহাপুরুষ হতে না পারুক সাধারণ মানুষের কাছেও জীবনের দাম সাংঘাতিক। নির্মল চায় তারা এভাবে নিজেদের শুধু ক্ষয় না করে। ঠিক এভাবে না হলেও সে তার মনের কথাটা জানাবার চেষ্টা করেছে তার চিঠিতে কিন্তু ঠিক সাড়া আসে নি ওদিক থেকে। 'এই যে তোমার চিঠির মারফত আমি বুকভরে

নিঃশ্বাস নেবার ভরসা পাচ্ছি, আবার একটু একটু করে পৃথিবীর দিকে তাকাচ্ছি, তার কি কোনো দাম নেই ?' তার নিশ্চয় দাম আছে কিন্তু·· যাই হোক নির্মল নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচে। যেন তার জীবনের একটা মস্ত বড়ো সমস্যার শেষ পর্যন্ত হিল্লে হল। রাজু আসছে। দিদিকে কলকাতায় আসবার জন্যে পটিয়ে তারই সঙ্গে আসছে। নির্মল উৎসুক ভাবে চেয়ে থাকে সামনের শনিবারের দিকে। অ্যাদ্দিনে সে বুঝতে পারবে যে তাদের চিঠিগুলোর শব্দগুলো কি তার ক্লাসের প্রত্যহ সাজানো শব্দগুলোর মতোই মৃত নিরর্থক না সে শব্দগুলো সত্যিই কথা বলে।

॥ পাঁচ ॥

ইস্টবেঙ্গল মেল প্রত্যেক দিনই লেট। এটা অবধারিত কারণ এ ট্রেনের যাতায়াত সাধারণ ট্রেন চলাচল নিয়মের বহির্ভূত। এতে যাঁরা চড়বেন তাঁরা ধরেই নেবেন রেলযাত্রীর সাধারণ মর্যাদাটুকু তাঁরা পাবেন না। চেকপোস্ট কাস্টমস্ কিংবা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের যে-কোনো তকমা-আঁটা লোককে পান সিগারেট খাওয়ানো, ট্রেন থেকে যে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে না এই অবর্ণনীয় সুযোগটুকু দেবার দরুণ টিকিট ছাড়াও চা খাবার টাকা দেবার জন্যে প্রস্তুতি এ তো মামুলী ব্যাপার যেমন মামুলী ব্যাপার বাপ্রতোরঙ্গ হাঁকডানো। কান থেকে যদি মেয়েদের মাকড়ি তুলে নেওয়া হয় কিংবা 'আপনার পেনটা তো বেশ' বলে জনৈক কর্মচারী কোনো যাত্রীর পকেট থেকে পেন উঠিয়ে নিজের পকেটে পোরেন তবু প্রতিবাদের কিছু নেই। এ সমস্তই বিন্দুমাত্র অস্বাভাবিক নয়, কারণ শোওয়ার ঘর আর রান্নাঘরের মাঝখানে পাঁচিল তুলে দেশভাগটাই দেশের নেতাদের কাছে অস্বাভাবিক নয়।

এসব কথা নির্মল অনেকবার শুনেছে কিন্তু শেয়ালদা স্টেশনের নোংরা পরিবেশে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে এই সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা সান্ত্বনা দেয় না। নির্মল নাকে রুমাল দেয়। প্ল্যাটফর্ম জুড়ে পূর্ব বাংলার বাস্তুহারা পুরুষ নারী ও শিশু। সম্প্রতি তাদের মধ্যে বসন্তের প্রকোপ বেড়েছে। সেজন্যে অথবা নানা জাতীয় দুর্গন্ধ চাপা দেবার জন্যে এন্তার ব্লিচিং পাউডার ছিটানো হয়েছে সর্বত্র। আর সেই সব মিলে এমন একটা চাপা ভারী ধাতব

গন্ধ সমস্ত প্ল্যাটফর্মে যে নির্মলের প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। সেই অসহ্য ভিড়ে হঠাৎ 'হটকে হটকে' চিৎকার করতে করতে গর্জমান ইঞ্জিনের মতোই কুলিরা ঘাড়ের ওপর এসে পড়ে মাঝে মাঝে। শীত যাব যাব শুরু করেছে কিন্তু এরই মধ্যে অপেক্ষমান জনতার আবো অনেকেব মতো নির্মল গল্‌গল্‌ করে ঘামতে থাকে। এক সিগাবেট কোম্পানিব বিজ্ঞাপন ভেসে ওঠে নির্মলের চোখেব সামনে। চোঙ্গা প্যান্ট পরনে প্রেমিক তার অস্বাভাবিক লম্বা পাদুখানা জুড়ে দাঁড়িয়ে প্রেমিকার সামনে, এক হাতে ফুলের তোড়া, আব-এক হাতের আঙুলে আলগোছে ধবা সিগাবেট। নির্মল সিগাবেট ধরায়।

গতকাল তার সঙ্গে সুব্রতর আলাপ হয়েছে। নির্মলেব মনে হয় সে যেমন এক বায়বীয় অস্তিত্বেব পেছনে ধাওয়া কবেছে সুব্রতও কি তেমনি ছুটছে না এক অদৃশ্য অবাস্তব ভবিষ্যতের পেছনে পেছনে? তার ছোটার তবু এক অর্থ আছে। একটা রক্ত-মাংসের সন্ধানে। কিন্তু সুব্রতর এই পথচলা তো প্রায় অ্যাডভেঞ্চার। সুব্রত রাজনৈতিক পার্টিতে এসেছে কারণ দেশেব মানুষেব চেহাবাটা সে বুঝতে চায় এবং সাধ্যমতো সাহায্য করতে চায়। নির্মলেব মনে হয তারা দুজনে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে। তার সীমাবদ্ধ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় সে যেমন খুঁজছে শব্দের বেড়াজাল ভাঙতে তেমনি সুব্রতবও চেষ্টা তাদেব পার্টির কতগুলো লৌহসদৃশ নিরেট সমাজ-তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় নাড়া দিতে। অন্তত সুব্রত তার গ্রামেব অভিজ্ঞতা ঠিক এইভাবেই বলেছিল নির্মলকে। গ্রামের 'পিপ্‌ল' ঠিক গৌতম সেনের 'পিপ্‌ল' নয়। সুব্রত যে গ্রামের অধিবাসী হয়েছিল তাদের অগ্রপশ্চাৎ আছে, তাদের সুখ-দুঃখ তাপ-অতাপ বোধ আছে। কিন্তু গৌতম সেনের গ্রাম বা দেশের অধিবাসী কতগুলো কথার পুতুল। তারা গৌতমের পকেট থেকে বেরিয়ে নাচানাচি কবে আবার গৌতমের পকেটেই ফিরে যায়।

আর যে-কারণে সুব্রতর আচরণ নির্মলকে বিস্মিত করে তা হল তার এই অ্যাডভেঞ্চার সম্পর্কে সে মুখচোরা নয়। সুব্রতকে শুধু রূঢ় ভাষায় নয় প্রায় ওপরওয়ালার কর্তৃত্বে গৌতম ভর্ৎসনা করেছে এই সব 'পিপ্‌ল নিয়ে অ্যাবস্ট্রাকশন' করার জন্যে, কিন্তু তাতে তার হুঁশ নেই। নির্মল তাকে খোঁচা দিতে সুব্রত একবার খালি বলেছিল, 'আমার হাজার রকম যুক্তি

আছে আর্থার কোয়েস্‌লার হবার স্বপক্ষে, হাজার রকম যুক্তি পাটিবাজি করার বিরুদ্ধে। কিন্তু ভারতবর্ষ এত গরিব। এই দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। আমাদের বাপরা পারেন নি। আমাদের চেষ্টা করতে হবে।'

ঘামে শার্টের কলার ভিজে গেছে নির্মলের। মাজা ব্যথা করছে ঠায় দাঁড়িয়ে। পায়চারি করলে বোধহয় আরাম পাওয়া যেত। কিন্তু এই নরকে পায়চারি সৌখীন লাগে নির্মলের। হঠাৎ আপাদমস্তক অবসাদে সে আচ্ছন্ন হয়। এই অনিশ্চিত প্রায় অপরিচিত একটা মানুষের জন্যে তার এই অপেক্ষা কি বালকসুলভ নয়? যে সমালোচকের বাঁকা দৃষ্টি সে সর্বক্ষণ সজাগ রাখতে সচেষ্ট সে দৃষ্টিতে নিজের দিকে তাকালে এই তিরিশ বছর বয়সে এক 'পেন ফ্রেণ্ডের' জন্যে এতখানি উতলা হওয়া কি সাজে? তাছাড়া মেয়েটিকে সে যতদূর চিঠির মারফত জানে তাতে কোনো প্যাটার্নে ফেলতে পারা মুশকিল। তাকে নিউরটিক্ বলে ফেলতে পারবে না, ভাবালু ভেবে নেকনজরে দেখতে পারবে না, মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যসম্পন্ন কোনো উৎসুক তরুণী ভেবেও কাছে টানতে পারবে না। বস্তুত রাজুকে সে যতবারই চিঠির মারফত শায়েস্তা করবার চেষ্টা করেছে ততবারই হার হয়েছে, ততবারই সে পিছলে বেরিয়ে গেছে। পাশাপাশি তারা দাঁড়ালেই কি সে ধরতে পারবে, কিংবা একেবারে সাদা বাংলায় বলতে গেলে, ধরে রাখতে পারবে? তাদের মাঝখানের বাধা কি শুধু পাকিস্তান-হিন্দুস্তানের? আরো কি কোনো দুর্লঙ্ঘ্য বাধা নেই?

তাছাড়া···এক বালকসুলভ আতঙ্ক নির্মলকে বিহ্বল করে। যেন এতক্ষণ সে মনের আনন্দে জল ঘাঁটছিল, এখনই কেউ আসবে তার ঘেঁটি ধরতে। মেয়েটার চেহারা কিরকম? ছেলেবেলার সেই অস্পষ্ট স্মৃতি বাদ দিলে একমাত্র সেই ফোটোগ্রাফ। সেই ফোটোগ্রাফখানাই তাদের এই নিরবয়ব সম্পর্কের মাঝখানে একমাত্র সেতু। কিন্তু এই প্রচণ্ড ভিড়ে যেখানে প্রায় প্রত্যেক মুখই একরকম, একই রকম ক্লান্ত, ঘর্মাক্ত, বিহ্বল, সে ক্ষেত্রে একটি কমবয়সী মেয়েকে সে চিনে নেবে কি করে? বরঞ্চ এই প্ল্যাটফর্মে একটা নতুন পুলিস কেস ঘটাবার সে সুযোগ দেবে না কোনো অপরিচিত মেয়ের পেছনে ধাওয়া করে? উদ্‌ভ্রান্তভাবে নির্মল ফোটোগ্রাফখানার কথা ভাবতে

চেষ্টা করে। কিন্তু সে মুখখানা মার্লিন ডিয়েট্রিচ কিংবা গ্রেটা গার্বোর হলেও এই ভিড়ে একইরকম লাগত। এই প্রকাণ্ড ভিড়ের প্রবল চাপে সমস্ত মানুষই উদ্‌বিগ্ন। এক ধূসর বিবর্ণ চাদরে মুখ ঢেকে যেন লোকগুলো চলেছে কিংবা দাঁড়িয়ে আছে। আর সে তো গোয়েন্দা-বিভাগের কর্মচারী নয়— যারা ফোটোগ্রাফ পকেটে রেলস্টেশনে এয়ারপোর্টে বন্দরে অপেক্ষা করে, গৃধিনী-নয়নে টেনে বার করে ফোটোগ্রাফের সঙ্গে অপরিচিত মানুষের মুখের আদলের মিল। একটা ট্রেন থেকে একদল মেয়ে আর ছেলে নামল। ছেলেগুলোর পরনে ছুঁচলো পেন্টুলুন আর টেরেলিনের শার্ট। মেয়েগুলো হ্যাংলাটে, লম্বা লম্বা ঠ্যাঙের ওপর একরত্তি পাছা জর্জেটের শাড়ি ঠেলে নিজেদের জানান দিচ্ছে। সেদিকে চেয়ে চেয়ে নির্মল উদ্‌বিগ্নভাবে চিন্তা করে এরই মধ্যে বোধহয় একজন তার মানসী। প্রাণপণ গোয়েন্দাসুলভ অভিনিবেশে দলটিকে দেখতে থাকে নির্মল। হঠাৎ 'হট্‌কে হট্‌কে হট্‌কে' করতে করতে মালপত্র মাথায় একটা গর্জমান ইঞ্জিন তার প্রায় ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল। নির্মল নিজেকে সরিয়ে নিয়ে আর দাঁড়ায় না। ভিড় ঠেলতে ঠেলতে গেটের কাছে এসে পড়ে। যে রেলকর্মচারিটি এতক্ষণ ইস্টবেঙ্গল মেলের খবরাখবর দিচ্ছিল সে অন্যমনস্ক নির্মলের দিকে চেয়ে বললে, 'এখনো চল্লিশ মিনিট স্যার।'

নির্মল দাঁড়ায় না। স্টেশনের বাইরে এসেই সে দক্ষিণমুখী একটা বাসে উঠে পড়ল।

'কি রাজকুমার, কোথায় ডুব দিয়েছিলে?' খুকুমণিকে আরো ফর্সা লাগছে, আরো গোল দেখাচ্ছে তার চেহারা।

'রাত্তিরে রুটি খাচ্ছ?' নির্মলের গলায় তার স্বাভাবিক বিদ্রূপ ফিরে আসে। সে যেন আবার চারপাশের বালকসুলভ আচরণে মোড়লি করবার সুযোগ পেয়ে ভেতরে ভেতরে ধন্য হয়ে গেছে। খুকুমণির সঙ্গে কথা বলতে বলতে তার আত্মপ্রত্যয় ফিরে আসে। কিছুক্ষণ আগে শেয়ালদার ভিড়ের মধ্যে যে তরুণ উদ্‌বিগ্ন বিহ্বলতায় অপেক্ষা করছিল তার চিঠির বান্ধবীর জন্যে সে এক ভিন্ দেশের লোক। তার সঙ্গে নির্মলের যোগ নেই।

খুকুমণি তার স্বভাবসিদ্ধ কেঁদো-আহ্লাদী গলায় কথা বলে, জিভ চাটে, মাঝে মাঝে দুর্দান্ত ইংরেজী বলে ফেলে। আর নির্মল তার পাশে

বসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে। এতক্ষণ পর তার চেনাজগতে সে ফিরে এসেছে।

'বোম্বাইয়ের এক কোম্পানি একটা ফুড বার করেছে, এই যেমন বেবিফুড তেমনি। এক মাসে তোকে তন্বী করে দেবে,' নির্মল কথা বলে আরাম পায়।

খুকুমণি উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে, 'তোমরা একটা কিছু করো বাপু। এ আর পারি না। দিনের পর দিন রুটি খাচ্ছি দোবেলা। দুপুরে চোখ ঠেলে ঘুম আসে। অনুরোধের আসর, শুনতে শুনতে চোখের পাতা জুড়ে আসে। খোকনটার বেশী বায়না নেই। এক পেট খাইয়ে দাও। তারপর নিজের মনে খেলতে খেলতে ঘুমোয়। আর এই বাড়ি করেছে বাবা, যেন হাওয়াখানা। সারা দুপুবটা ঘুমের সঙ্গে লড়াই কবি। কি শাস্তি! তারপর আয়নাতে মুখ দেখি। গালটা আরো ফোলাফোলা, চোখের পাতা ভাবী। একটা কিছু ব্যবস্থা কবো বাপু!' একটুক্ষণ চুপ করেই খুকুমণি আবাব উৎসাহে চেঁচিয়ে উঠল, 'ওমা, তোমাকে আসল খবরটাই দেওয়া হয় নি!'

'বরের ট্রান্সফার?'

'বাবা বলেছে বুঝি?'

'জ্যাঠামণি বলবেন কেন? তোর মুখ দেখেই বুঝতে পারছি। আহ্লাদে যেরকম ফুলছিস।'

'ওমা সে কি কথা। কাঁদলেও ফুলব গো।...আর ভাল লাগে না ভেবে ভেবে। ওঁকেও বলেছি। মোটারা কি মানুষ না? মোটা হয়েছি, হয়েছে কি? তোমার কিসে কমতি হচ্ছে?'

'বিলেতে আজকাল কাকে বিউটি বলে জানিস তো?' নির্মলের গলায় আবার স্বাভাবিক বিদ্রূপ। 'যেসব মেয়েদেব সামনেও কিছু নেই, পেছনেও কিছু নেই।'

'ওমা। সে কি কথা গো। সে কি কথা!' খুকুমণি উপুড় হয়ে লুটিয়ে লুটিয়ে হাসে। আর সেই চোখ মুখ লাল করা হাসিতে নির্মলও যোগ দেয়।

'এত হাসি কিসের?' প্রবোধ সেন ঘরে ঢোকেন। নির্মলের ফুর্তিবাজ চটুল মেজাজ তাঁর পছন্দ। আস্তে আস্তে দেয়ালের গায়ে লাগানো আরাম-চেয়ারে গা এলিয়ে দেন।

'তোমার অ্যাসেম্‌ব্লির ঝামেলা চুকল?'

'হ্যাঃ! সব এক কথা। এটা হয় নি, সেটা হয় নি। এই বারো-তেরোবছর এক কথা! বেশ কথা বাপু। সামনের নির্বাচনে দাঁড়িয়ে জেতো। তারপর দেশে স্বর্গরাজ্য বানাও। কে তোমাদের বাধা দিচ্ছে?' প্রবোধ সেন দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়েন।

'সুবোধের বুকের ব্যথাটা সেরেছে?' চোখ বন্ধ করে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দেন। তারপর নির্মলের জবাবের অপেক্ষায় না থেকেই বলেন, 'সব পাগলামি। ওরকম এঁদো পচা ঘরে সাধ করে কেউ থাকে!'

আবার নির্মল তার বাবা-জ্যাঠার দুই প্রতিদ্বন্দ্বী জগতের সামনে দাঁড়ায়। সম্প্রতি জ্যাঠামণির তরফ থেকে আক্রমণ লক্ষণীয়। তিনি কি কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে ল্যাং খেয়েছেন উঁচু মহলে, অভিষ্ট সিদ্ধ না হওয়ায় স্বাভাবিক হাসি হারাতে বসেছেন। গত কয়েকদিন যে কাগজ দেখা হয় নি সে কথাটা নির্মলের মনে আসে।

প্রবোধ সেন চোখ খোলেন। তাঁর মোটা জোড়া ভুরু তুলে ভাইপোর দিকে চেয়ে বলেন, 'আমাদের এই বাংলাদেশে আদর্শ আদর্শ করেই আমরা গেলাম। এই সব রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ, এগুলো না হলেই আমাদের ভাল ছিল। আমরা এত পড়ে পড়ে মার খেতাম না চারপাশ থেকে। এর চেয়ে যদি আমরা গুঁড়ো সাবান, পেরেক, সুতোর কল—একটা যে-কোনো জিনিস যা লোকে দৈনন্দিন ব্যবহার করে, যা বেঁচে থাকতে লাগে— এমনি কোনো জিনিস তৈরী করে বিক্রি করার কায়দাটা আয়ত্ত করতাম তাহলে এত দেউলে হতাম না। বাংলাদেশের কী হবে? যাদের দিয়ে কিছু হত সেই সব ছেলে-ছোকরারা দিনরাত 'চলবে না চলবে না' করছে আর অন্য জায়গার লোকেরা ধীরে ধীরে আমাদের উৎখাত করে নিজেরা গেড়ে বসছে।'

'আপনি যে বাবার মতো বলছেন!' নির্মল অবাক হয়ে বললে।

'মোটেই না।' প্রবোধবাবু ভুরু নাচালেন, চোখ কুঁচকালেন। গলা চড়িয়ে বললেন, 'আমি যাদের কথা বললাম তাদের ফোটো টাঙিয়ে রেখেছে সুবোধ দেয়ালভর্তি করে। সভাসমিতিতে যখন বক্তৃতা করি তখন তাদের সম্পর্কে আমিও অনেক কথা বলি। তোমার বাবার চেয়েও ভাল বলি,

কারণ ওগুলো আগে থেকেই তৈরী থাকে। কিন্তু ওর একটা কথাও আমি বিশ্বাস করি না।'

নির্মল চুপ করে থাকে। তাকে সামান্য বিহ্বলও দেখায়। কোনো লোক সম্পর্কে তার মনে মনে একটা দৃঢ় নকশা থাকে। তার জ্যাঠামণি তার মনের নকশা থেকে বেরিয়ে আসছেন। কথাগুলো কি সত্যিই জ্যাঠামণি বিশ্বাস করেন?

প্রবোধ সেন আবার নির্মলের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, 'সত্যিই আমি বিশ্বাস করি না। কাল একটা পার্টিতে···ঐ যে নতুন ইরিগেশানের সেণ্ট্রাল মিনিস্টার···বেঁটে কালো···কি নাম?···তাকে বলছিলাম— আই কন্‌সিডার ইট এ মিস্‌ফর্চুন ছাট্‌ বেঙ্গল ইজ টু বার্ডণ্ড্‌ উইথ্‌ দ্য হেরিটেজ অফ্‌ নাইনটিন্থ্‌ সেঞ্চুরী। পশ্চিম বাংলা জুবুথুবু হয়ে বসে আছে আর সব প্রদেশ মেরে বেরিয়ে যাচ্ছে। সব ব্যাপারে···কি গভর্নমেণ্ট, কি বিজনেস্‌, কি পড়াশোনায়! দিল্লী ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছিলাম, ছেলেমেয়েগুলো দেখে প্রাণে বল এল। একেবারে সাহেব-মেমের মতো ইংরেজী বলছে।'

জ্যাঠামণির শেষ কথাটায় নির্মলের সামান্য হাসি পেলেও তাঁর বক্তব্যের দৃঢ়তা তাকে স্পর্শ করে। আবার তার মনে হয় এ বক্তব্যের সঙ্গে তার একাত্মতা অনেকখানি। এ পথে চিন্তা করলে বোধহয় সুরাহার পথ ধরা যায়। এ বক্তব্যের পেছনে যে জ্বালা তা নিষ্ফল আক্রোশেই নিঃশেষিত নয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার ভেতর থেকে সুবোধ ডাক্তার কথা বলে ওঠে, 'বাংলাদেশের ওপর দিয়ে তো কম ঝড় গেল না!'

'পাঞ্জাবের ওপর দিয়েও গেছে। দিল্লীর আশেপাশে পাঞ্জাবী রিফিউ-জিদের দিকে তাকাও আর শেয়ালদা স্টেশনে পড়ে-থাকা আধমরা লোক-গুলো দেখো। একদিকে আত্মবিশ্বাস আর-একদিকে ভিখিরীপনা।'

'এর জন্যে তো সরকারও দায়ী,' ফস্‌ করে বেরিয়ে পড়ে কথাটা।

প্রবোধবাবু আবার জোড়াভুরু কুঁচকালেন, 'বাবার কথা রিপিট কোরো না নির্মল। তুমি নাবালক নও। নিজে যা ভাবো সেটা বলো। সরকারের হাজার রকম দোষ আছে। কিন্তু আমাদেরও নিজেদের দোষ নেই? সমস্ত রাজনৈতিক পার্টি রিফিউজি নিয়ে ব্যাবসা করছে, করছে না?'

'কেউ কেউ করছে।'

'সমস্ত পার্টি, সমস্ত পার্টি! প্রবোধ সেন কাউকে পরোয়া করে না। আজ ক্যাবিনেটে আছি। কাল দরকার হলে ছেড়ে দেব। ক্যালকাটা বার উইল্ ওয়েল্‌কাম মি উইথ্ ওপন্ আর্মস্।'

নির্মল চুপ করে থাকে। খুকুমণি উঠে গিয়েছিল। পাথরের গেলাসে এক গেলাস দুধ নিয়ে বাবার সামনে রেখে বললে, 'অত চেঁচামেচি কোরো না বাবা। ছোড়দা এলেই তুমি বক্তৃতা আরম্ভ করো।'

'আমরা আর কটা বছর! ওরাই তো ফিউচার।' দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'সুবোধ আর আমাদের সুব্রত চন্দর—একেবারে এক টাইপ। সেই পুরনো আদর্শবাদের এপিঠ ওপিঠ। ওর ঐ সখের গাঁয়ে ঘোরার আগে আমি ওকে বলেছিলাম, কমিউনিস্ট যদি হতে চাও বাবা, অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজে যাও। সেখান থেকে কমিউনিস্ট হয়ে এলে লোকে মানবে। এখানে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরলে তোমায় কে পুঁছবে? আর তোমার বাপ···আমার কাছে সব খবর আসে নির্মল। ওকে বোলো, অত রিফিউজিদের সঙ্গে মাখামাখি না করতে। শুনলাম বাগজোলা ক্যাম্পে তোমার বাবাকে নিয়ে গিয়েছিল। তুমি জানো?'

নির্মল অস্পষ্টভাবে বললে, 'কি জানি, ঠিক জানি না। বাবার ডিস্‌পেন্সারীতে অনেক ধরনের লোকই তো আসে।'

'মাঝে মাঝে যখন তোমার কথা ভাবি তখন মনে হয় তুমিও নিজেকে ওয়েস্ট করছো। ওঁরা সজ্ঞানে করছেন, তুমি নিজের অজান্তে করছ··· আমি বলছি না তোমার নিজের বাছবিচার নেই। তোমার সে ক্ষমতা আছে বলেই আমার দুঃখ হয়।'

ভাইপোকে এক নজর দেখে নিয়ে বললেন, 'একটা বড়ো অ্যাডভার্টাইজিং ফার্মে চাকরি আছে। করবে?'

নির্মল চোখ তুলে চায় তার জ্যাঠামণির দিকে। একবার ইতস্ততঃ করে কি বলবে ভেবে। সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে প্রবোধবাবু বললেন, 'এখনই তোমায় কিছু বলতে হবে না। থিঙ্ক ওভার ইট। মাসখানেকের মধ্যে বললেই হবে। ওরা বোধহয় বছরখানেক পরে একবার বিলেত ঘুরিয়ে আনবে। তারপর একটা হায়ার পোস্টিং-এ দেবে। এখনই তোমার কাছ থেকে জবাব চাচ্ছি না।'

প্রবোধ সেন উঠতে উঠতে বললেন, 'কাল আবার সকালে এয়ারপোর্ট। বার্মার নু আসছে। খাবার দিতে বলো, খুকুমণি। দুদিন হল একটু অম্বলের ভাব হয়েছে। খালি ভাত আর একটু মাছের ঝোল। ব্যস্!'

নির্মলও উঠে পড়ল। খুকুমণি বললে, 'বাঃ! তুমি বোসো। আমি এখনই আসছি।' কিন্তু নির্মল সেদিন আর বসল না।

॥ ছয় ॥

দোতলা বাসের সিঁড়িতে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয় নির্মলকে। শেয়ালদার সেই ঘাম আর ভিড়ের স্মৃতি বাসে চারপাশের মানুষের চাপে আবার জেগে ওঠে তার মনে। গোয়েন্দা-বিভাগে যেরকম মুখে রুমাল চেপে বা ঐ ধরনের কোনো সংকেত মারফত দুই অপরিচিত লোকের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা হয় তেমনি কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করলে কিরকম হত? তার চিঠির বান্ধবী মুখে রুমাল চেপে বা খোঁপা বাঁধতে বাঁধতে ট্রেন থেকে নামত আর অমনি সে ছুটে যেত অকুতোভয়ে। আসলে আত্মগ্লানিতে নিজেকে আরো করুণ বেকায়দাজনক দেখতে নির্মলের ইচ্ছে হচ্ছিল। রাজুর চিঠির সেইসব লাইনগুলো যা তার কাছে অত্যন্ত জীবন্ত বলে মনে হয়েছিল সেগুলো তাকে ভেংচাতে থাকে। অনেকক্ষণ পর জানালার পাশে একটা সীট পেয়ে ধপ্ করে বসে পড়ে নির্মল। ফুরফুরে হাওয়ায় চোখ জড়িয়ে আসে। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় নির্মল স্বপ্ন দেখে রাজু ট্রেন থেকে নামছে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে। নির্মল এগিয়ে গিয়ে তার হাত ধরতে গেল আর অমনি ভাঙা প্লাস্টিকের পুতুলের মতো রাজুর হাতখানা খুলে এল তার হাতে, প্লাস্টিকের মাথাটা ঘাড় থেকে আলগা হয়ে গড়াতে গড়াতে চলল। আর একটা রেফিউজি ছেলে কোথা থেকে দৌড়ে এসে ধাঁই করে তাতে এক সট লাগিয়ে দিলে। সেই মাথার বলটা শূন্যে উঠে নির্মলের মুখে আচম্কা লাগতেই নির্মলের চট্কা ভেঙে যায়। বাসটা হঠাৎ ঝাঁকি দিয়ে থেমে গেল। আর দুটো স্টপ পরেই পাঁচমাথার মোড়।

বাড়ির সামনে একটা ছোটো ভিড। নির্মল সেদিকে খেয়াল না করেই এগোয়। পরেশ কম্পাউণ্ডার তার দিকে শুকনো মুখে তাকাল। পাড়ার

কতগুলো ছেলে যারা নিজেদের মধ্যে জটলা করছিল তারাও হঠাৎ কথা থামিয়ে দেয়। কেউ কেউ উৎসুকভাবে তার দিকে চেয়ে থাকে। নিশ্চয় মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলা নিয়ে বিতর্ক চলছে, নির্মল ভাবলে। পাশ কাটিয়ে ভেতরের দিক এগোচ্ছিল এমন সময় পাড়ার রতন পেছন থেকে বললে, 'দাদু অ্যারেস্টেড হয়েছে।'

'কে ?' নির্মল চমকে ওঠে।

পরেশ সামনে এসে বললে, 'ডাক্তারবাবুকে পুলিশ নিয়ে গেছে।'

'তার মানে ?'

'আজ সকালে বাগজোলা ক্যাম্পে ফায়ারিং হয়েছে। চারজন লোক মারা গেছে। ডাক্তারবাবু গিয়েছিলেন ক্যাম্পে। ওখান থেকেই নিয়ে গেছে ওঁকে।'

নির্মল হতভম্ব হয়ে থাকে কয়েক মুহূর্ত। পরেশ বলে যায়, 'পুলিশ ডাক্তারবাবুর নামে রায়টিং কেস্ ঠুকে দিয়েছে। ক্যাম্পে রেফিউজিদের গ্রেপ্তার করতে এলে ডাক্তারবাবু পুলিশকে বাধা দেন। সেই শ্রীদাম বেটা গুলিতে মরেছে।'

'জ্যাঠামণিকে জানানো হয়েছে ?'

'না না, উনি মানা করে দিয়েছেন। আমি দেখা করেছি হাজতে। আমাকে বললেন, জেলখানায় তাঁর অভ্যেস আছে। কিন্তু ওঁর দাদাকে জানাতে বারবার নিষেধ করেছেন।'

পরেশের কাছ থেকে চাবির ঝোপাটা নিয়ে নির্মল সোজা ডিস্-পেনসারীতে এল। ফোন তুলতে খুকুমণি ধরল, 'কিগো, এত রাত্তিরে কেন ? ··বাবাকে ?···কেন ? আমি তো আছি। আমি কি কিচ্ছু বুঝি না ? বাবার যত ফোন আসে আমাকেই ধরতে হয় স্যার।'

'জ্যাঠামণিকে বল্ বাবা অ্যারেস্টেড হয়েছেন।'

'সে কি গো ! কি হবে ?'

'কিছু হবে না। তুই বল্। আমি ফোন ধরে আছি।'

অনেকক্ষণ কেটে যায়। ফোন কানে দিয়ে নির্মল দেখতে থাকে দেয়াল মেঝের ফোকর আনাচকানাচ থেকে বেরিয়ে কীটজগৎ কেমন মহোৎসবে মেতেছে। দেয়ালের উপর ফর্ ফর্ করে আরশোলা উড়ছে। দুটো লম্বা

বাদামী পোকা এতক্ষণ খুব মনোযোগের সঙ্গে একখানা খোলা ইংরেজী বিবেকানন্দের বইয়ের ওপর দাঁড়িয়ে দাড়া নাড়ছিল। হঠাৎ আলোয় আর শব্দে তারা স্থির হয়ে থাকে। তড়বড় করে এক জাঁদরেল টিকটিকি দৌড় মারে একটা মাঝারী সাইজের টিকটিকির পেছনে।

'কে, নির্মল ?' একবার গলা খাঁকারী দেওয়ার পর ভারী গলার স্বর এল টেলিফোনে।

'কোথায় ? বাগজোলায় ? বেঙ্গল পোলিস ?···বড্ড রাত হয়ে গেছে। আচ্ছা, আমি আই-জি'কে ফোন করছি। ছোটো বউকে বোলো ভাবনা না করতে।'

'পুলিশ রায়টিং কেস্ ঠুকেছে,' নির্মল একটু উত্তেজিতভাবেই বললে।

'তা তো করবেই, যার যা কাজ।···সকালের মধ্যেই এসে যাবে।' প্রবোধ সেন ছেড়ে দিলেন। ঠং ঠং ঠং করে অযত্নে রিসিভার রাখার আওয়াজ আর তাঁর নিস্পৃহ গলায় নির্মলের খেয়াল হয় তার উত্তেজনা না দেখালেই ভাল ছিল। সত্যিই কি দরকার ছিল বাবার এই বৃদ্ধ বয়সে রেফিউজিদের নিয়ে মাতামাতি করার ?

'কেন গিয়েছিলি ফোন করতে ?' বাড়ি ফিরলেই মা বললেন।

'বেশ করেছি, খাবার দাও।'

নির্মল সে রাত্তিরে রাজুকে আবার স্বপ্ন দেখে। তারা দুজনে বসে আছে মাঠের মধ্যে অন্ধকারে। এদিকে সেদিকে আগুন জ্বলছে। গুলির আওয়াজও শোনা যায়। কিন্তু সে সব কিছু তারা শুনছে না, দেখছে না। পাশ ফিরতে চৌকিটা মচ্ মচ্ করে ওঠে। ঘাড় ফিরিয়ে টাইম পিসের দিকে চায়। সাড়ে তিনটে।

'বাবা কি ফিরেছে ?' ঘুমের মধ্যে নির্মল জিজ্ঞাসা করে।

'না।' ও ঘর থেকে জবাব আসে। প্রমদা দেবী ঘুমান নি।

খুব ভোরে সুবোধ ডাক্তার ছাড়া পেলেন। সারা রাত্তিরে ঘুম হয় নি। আর সেইসঙ্গে ঘুমোয় নি থানার ছোকরা ও.সি. নিবারণ মজুমদার।

নিবারণ তুখোড় ছেলে। পরীক্ষায় কখনো ফেল করে নি। তারপর কোন দেশবরেণ্য ফুটবল ক্লাবের বি. টিমে একটা জোরাল সেণ্টার ফরোয়ার্ড। খেলা খেলা করে বাইশটা বছর কাটিয়ে যখন ক্লাবের এ. টিমে যাবার আজীবন স্বপ্ন

প্রায় সফল হতে চলেছে তখন সহসা বাপের মৃত্যু তাকে ছুটন্ত বলের গতিতে ধাঁ করে ছুঁড়ে দিল পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টরের লাইনে। সেখানে একটা পুলিশী বিপ্লব ঘটিয়ে সে প্রথম রিক্রুটমেণ্ট পরীক্ষায় তাক্-লাগানো নম্বর পেয়ে ইন্সপেক্টর হয়ে বেরিয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি তারও উৎসাহে ভাটা পড়েছে। নিবারণ উপলব্ধি করছে, চাকররি এক বিশেষ স্তরে উঠতে যে ঘাঁতঘোঁত আয়ত্তের প্রয়োজন তা তার নাগালের বাইরে।

কাল রাত্তির বারোটায় একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর ছুটতে ছুটতে গিয়ে তার ঘুম ভাঙিয়েছে, 'স্যার, এস্.পি. ডাকছেন আপনাকে।' আর পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের কর্কশ উদ্‌বিগ্ন গলায় নিবারণের কাছে চাপা থাকে না—যে-বুড়োটাকে তারা কাল সন্ধেবেলা খুব দাবড়েছিল সে বেটা একটা ভি.আই.পি.।

নিবারণ রাত্তির থাকতে থাকতে নিজের আলমারীতে তুলে রাখা কাপে চা পাঠিযেছে। মোড়ের দোকান থেকে কিনে বাসি নিম্‌কি আর লেডিকেনি পাঠিয়েছে গাঁটের পয়সা খরচ করে।

রাত্তিরে আবার জেঠিয়া মিলের সামনে দুটো স্ট্যাবিং কেস্ ছিল। সে সব চুকিয়ে রাত বারোটায় শুয়েছে। গা ম্যাজ ম্যাজ করছিল। কোনো রকমে ভোরে শরীরটা টানতে টানতে নিবারণ নিজেই চাবির গোছা হাতে নিয়ে হাজতের সামনে এসে দাঁড়াল। লোকটা রাত্তিরে যেমন বসে ছিল তেমনি ঠায় বসে আছে। না-খাওয়া-চা আর মিষ্টি পড়ে আছে সামনে। প্রচণ্ড বিরক্তিতে নিবারণের মেজাজ আরো খারাপ হয়ে যায়।

চাবির শব্দে সুবোধ ডাক্তার মুখ তুলে তাকান। হাজতের দরজা খুলে নিবারণ হাঁক দিল, 'আসুন স্যার।'

রাত জাগার দরুন সুবোধ ডাক্তারের মুখখানা আরো ছুঁচলো দেখায়। টাকের ওপর কয়েক গাছা সাদা চুল খাড়া হয়ে আছে। 'কোথায় যেতে হবে?' বসা গলায় বলেন।

'আপনার বাড়িতে স্যার। আমাদের ভ্যান আনতে বলেছি। আমি দিয়ে আসব আপনাকে।'

'আমার বিরুদ্ধে যে রায়টিং কেস্'।

'ও সব কিছু নেই, বাইরে আসুন।'

সুবোধ ডাক্তার বাইরে এলে নিবারণ সামনের চেয়ারটা তাঁকে এগিয়ে দেয়। তারপর একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সিগারেট ধরায়।

'আমাদের স্যার ইন্টেলিজেন্সের রিপোর্টটা একটু ভুল ছিল। আপনার কষ্ট হল। আর আমাদেরও এই মিছিমিছি ঝক্কি।...এবারে এক কাপ চা খান।'

সুবোধ ডাক্তারের আপত্তি না শুনেই নিবারণ চেঁচিয়ে চায়ের অর্ডার দেয়, 'বেশ ভাল করে গরম জলে কাপগুলো ধুয়ে দিতে বলবি।' তারপর আস্তে আস্তে ক্লান্ত স্বরে বললে, 'এখন স্যার জামানা পাল্টে গেছে। এখন হাতে ছুরিসুদ্ধ খুনীকে ধরলেও তাকে চেয়ারে বসিযে চা খাওয়াতে হয়। হয়তো কোনো ডি.আই. পি'র ভাইপো বেরিয়ে পড়বে। কি দরকার ঝামেলায় বলুন। আবার মাঝরাত্তিরে ফোন, দৌড়োদৌড়ি।'

'আপনারা ভুল করেছেন। আমার কোন আত্মীয়স্বজন নেই।'

নিবারণ হেসে বললে, 'আমি সবই জানতে পারব।...তবে স্যার একথাটা জানবেন, এই ভি.আই.পি-দের জন্যে দেশটার সর্বনাশ হচ্ছে। আপনি চোর-ডাকাত ধরবেন না রাজনীতি করবেন?'

'আমি বলছি তো আমার কেউ নেই। কেন এসব কথা শোনাচ্ছেন?'

নিবারণ গম্ভীর হয়ে বললে, 'কেন বৃদ্ধ বয়সে মিথ্যে বলছেন? এই সেদিন, আমার এক বন্ধুর কথা শুনুন। বেচারা হাওড়ায় মদ চোলাইয়ের কারবারে হাত দিতে গিয়েছিল। চাকরি যায় যায় আর কি। কি করবেন বলুন আপনি? এখানে যে-কটা মিল আছে সব কটার ম্যানেজমেন্ট গুণ্ডা পোষে। আমাদের একেবারে পাকা খবর। থানার চার্জ নেবার পর গত বছর দুটো গুম্ খুন হয়ে গেল। ধরলাম ঠিক। কেসে টিকল না। হাইকোর্ট থেকে জাদরেল সব ব্যারিস্টার নিয়ে এল মিল মালিক। মাঝখান থেকে ম্যাজিস্ট্রেটের কড়া স্ট্রিক্চার খেলাম।...নিন, চা খান।'

নিবারণের কথা শুনতে শুনতে এতক্ষণ একটা চাপা রাগে সুবোধ ডাক্তার জ্বলছিলেন। রাগটা তাঁর ছেলের ওপর। এই যে হঠাৎ রুলের গুঁতো আর 'তুই' সম্বোধন সহসা নিটোল চায়ের কাপ আর 'স্যারে' রূপান্তরিত হল এই ম্যাজিকের পেছনের নির্মলের মারফত তাঁর দাদার হাত তিনি টের পেলেন। তবে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে একটু প্রকৃতিস্থও হলেন। গত চব্বিশ

ঘণ্টায় তাঁর চারপাশে যে ঝড়ের মতো ঘটনা ঘটে গেল সেগুলো অনেকটা ধরতে পারেন এখন। কিন্তু বারে বারে হোগলার বনের মধ্যে শ্রীদামের বিরাট লম্বা দেহখানার স্মৃতি তাঁকে বিভ্রান্ত করে দেয়। কাল পুলিশের সঙ্গে রেফিউজিদের খণ্ডযুদ্ধের সমস্তটাই তাঁর আজগুবি লাগে। সেই প্রচণ্ড চীৎকার, টিয়ার গ্যাসের ধোঁয়া, খোলা মাঠের মধ্যে ইতস্তত ছাউনিগুলোর এদিক ওদিক থেকে উদ্‌ভ্রান্ত চীৎকার আর্তনাদ, তার দু-তিন ঘণ্টা আগে রেফিউজি নেতাদের আস্ফালন আর ঠিক ধীর গতিতে বাঁধের ওপর থেকে রাইফেল কাঁধে আস্তে আস্তে পুলিশ বাহিনীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নানা ছুতোয় তাঁদের সেখান থেকে কেটে পড়া— এ সমস্তটাই তাঁর কাছে স্বপ্নের মতো মনে হয়।

'আমরা স্যার সব সময় আছি— কংগ্রেসেও আছি, কমিউনিস্ট হলেও আছি। আমরাই স্যার পিপ্‌ল। আমাদের গাল দিয়ে কি হবে। লোক যদি চুরি করে, ডাকাতি করে, আইন ভাঙে, ছুরি মারে, মাতলামি করে, সোডার বোতল ওড়ায়, অন্যের স্ত্রী নিয়ে ভাগে— আপনি কি করবেন? গায়ে হাত বুলোবেন? গান্ধীজীর বাণী শোনাবেন, লেনিন আওড়াবেন? মানুষের স্বভাব পাল্টাতে পারেন?'

'দেশ কোথায়?' হঠাৎ চায়ের কাপ থেকে মুখ তুলে সুবোধ ডাক্তার প্রশ্ন করেন।

'দেশ? হ্যাঁ, আমিও রেফিউজি স্যার। দেশ ফরিদপুর। তবে এখন তো পাকিস্তান মানে তুরস্ক।'

'পাকিস্তান মানে তুরস্ক?' সুবোধ ডাক্তার আশ্চর্য হয়ে তাকালেন।

'তাছাড়া আর কি! ও দেশের সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক বলুন? ওসব কথা ভেবে কি লাভ!'

'এখনকার ছেলেছোকরারা তাই বলে নাকি?'

'হ্যাঁ স্যার, বলতে বাধে কারুর। কিন্তু ঘটনাটা তাই।···আমাদের পক্ষে— যারা বয়সে কিছুটা বড়ো— তাদের পক্ষে একটু কষ্ট হয় বৈ কি! ছেলেবেলায় শশ্মানঘাটে নৌকো চুরি করে ও-পারে যেতাম ফুটবল খেলতে। চাঁদনি রাত্তিরে মধুমতী পার হওয়া! সঙ্গে একটা ছেলে ছিল— ফার্স্ট ক্লাস বাঁশী বাজায়···সে অন্য জিনিস।'

'ও কথাগুলো সব ভুলে যেতে পারবে?' সুবোধ ডাক্তারের ক্লান্ত মুখ সামান্য উত্তেজিত দেখায়।

নিবারণ যেন এতক্ষণ বড্ড বেশী কথা বলছিল সেই অনুশোচনায় নিজেকেই ধমকে ওঠে, 'লোককে তো খেয়েপরে বাঁচতে হবে।...ওসব কথা ভুলে গেছি।...আমাদের ছেলেরা একদিক থেকে অনেক ভাল হবে। এইসব দেশ ফেশ নিয়ে মাথা ঘামাবে না।'

তারপর গত রাত্তিরে যে রকম কর্কশভাবে প্রশ্ন করছিল সেই রকম প্রশ্ন করে, 'আপনি ঐসব ক্রিমিনালদের মধ্যে গিয়েছিলেন কেন?'

'ডাক্তারি করতে?'

'আর কোথাও...' নিবারণ সামলিয়ে নেয় নিজেকে। 'যাক্ যাক্... বাগজোলা ক্যাম্পের রেফিউজিরা একেবারে ক্রিমিনাল টাইপ। অনেক গুলোর নামে কেস আছে। ওদিকে আর যাবেন না।'

সুবোধ ডাক্তার রেগে উঠে বললেন, 'ফায়ারিং-এর কোনো দরকার ছিল না। একেবারে পয়েন্টলেস্। পুলিশ অনেক দেখেছি। কিন্তু এ রকম ভড়কে গিয়ে এলোপাথাড়ি গুলি চালানো প্রথম দেখলাম।'

'এ ব্যাপারে আর জ্ঞান দেবেন না।...মনে রাখবেন, ভি.আই.পি. দাদা না থাকলে এ কেসে আপনাকে ছ'টি মাস জেল ঠুকে দিত ম্যাজিস্ট্রেট। ...এখন চলুন। ভ্যান এসে গেছে।'

খোলা ভ্যানের কোনে ঝিমোতে ঝিমোতে সুবোধ ডাক্তার যখন বাড়ির দিকে চলেন তখন ভোরের আলো ভাল করে ফোটে নি। সারা রাত্তির অবসাদে, প্রায় গোটা দিনের অনাহারে তাঁর চিন্তাগুলো তালগোল পাকিয়ে যায়। মাঝে মাঝে কয়েকটা মুখ ভাসতে থাকে তার চোখের সামনে। গাড়িতে ঢুলতে ঢুলতে এক-একবার তাঁর ভ্রম হয় তিনি বাগজোলা ক্যাম্পে রেফিউজিদের ত্রিপলের ডেরায় পাটক্ষেতের সামনে বসে আছেন কি না। একটা ছবি মনের মধ্যে ভেসে উঠতে সুবোধ ডাক্তার এই গভীর অবসাদের মধ্যে নিজের মনে হাসেন। গতকাল ফায়ারিং-এর পর সদ্যবিধবা মহিলাটি যখন কোনো স্থানীয় নেতার পায়ে আছড়ে পড়ল তখন তিনি অদূরে তাক-করা ফোটোগ্রাফারের দিকে চেয়ে আর মেয়েটিকে পা থেকে তোলেন না। ফোটোগ্রাফার ছোকরাও সেয়ানা, সে আর ক্যামেরার শাটার টেপে না।

আর সেই রোরুদ্যমানা নারীকে পায়ে রেখে ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে থাকেন ঠায় দু মিনিট। কি অবস্থা! গত চব্বিশ ঘণ্টার অভিজ্ঞতায় সুবোধ ডাক্তারের কাছে এ কথাটা একেবারে জলন্ত যে মন্ত্রী, খবরের কাগজ, রাজনৈতিক পার্টির নেতা— সকলের কাছেই অক্ষম বিহ্বল এই মানুষগুলো আসলে পণ্য, নিজেদের সাফল্য আরো এঁটে বসানোর জন্যে এরা এক-একটি নাট বল্টু।

'মাড্ল মাড্ল, আগাগোড়া মাড্ল,' সুবোধ ডাক্তার বিড়বিড় করেন।

'পড়ে যাবেন মিস্টার সেন, পড়ে যাবেন। শক্ত করে বসুন।' আরো কি সব বললে নিবারণ। সুবোধ ডাক্তার বুঝতে পারেন, ছোকরা তাঁকে আপ্যায়িত করতে চায়।

শ্রীদাম পরশু এসেছিল তাঁর ডিস্‌পেনসারীতে। তাঁর মেয়ের কুড়ি দিন হল জ্বর ছাড়ছে না, একবার তাঁকে যেতে হবে। একটু উদ্‌বিগ্নভাবে জানিয়েছিল তাদের দণ্ডকারণ্য পাঠানো নিয়ে একটা কি ব্যাপার চলেছে। 'আমরা কি কাগজ পড়ি। আমরা জানব?' শ্রীদামরা কাগজ পড়ে না, পড়লেও বুঝতে পারে না। দণ্ডকারণ্য পাঠানোর জন্যে সরকার চাপ দিচ্ছে। আর রেফিউজি নেতারা— তাদের মধ্যেও আবার দু-দল, বামপন্থী আর নমশূদ্র সমাজের এক মোড়লের দল। শ্রীদামের কথা শুনে মনে হয়েছে এরা দু-দল দণ্ডকারণ্য যেতে বাগড়া দিচ্ছে অথচ সোজাসুজি সরকারকে তাদের মতামত জানাচ্ছে না। এই তক্কে মোড়ল ভাবছে সে মন্ত্রীসভায় সেঁধিয়ে যাবে আর বামপন্থীরা ভাবছে এ এলাকা থেকে আগামী নির্বাচনে জিতেই নতুন সরকার স্থাপন করবে। গুলী চলবার পর অবস্থা শান্ত হলে একটা ঢ্যাঙা বুড়োর কথা মনে আসে তাঁর। যখন নমশূদ্র মোড়ল বলছেন, 'আমরা দণ্ডকারণ্যে যেতেও বলব না, বাধাও দেব না,' তখন সেই ঢ্যাঙা বুড়ো উবু হয়ে বসে থাকা মানুষগুলোর ভেতর থেকে লাফিয়ে উঠে বলেছিল, 'আপনারা একটা কথা বলেন স্যার। এত কথা বলবেন না। বলেন দণ্ডকারণ্য যাব কি যাব না, পুলিশ এলে রুখব কি রুখব না। এত কথা বললে সব ঘুলিয়ে যায়। বলুন, আমরা সার সার দাঁড়াই। আপনারা আমাদের গুলি করে মারুন।'

খোলা ট্রাকে হাওয়ায় টাকের ওপর ডাক্তারের লম্বা সাদা চুলের গুচ্ছি সোজা খাড়া হয়ে দাঁড়ায়। ভোরের হাওয়ায় তিনি একটু ঘুমিয়ে নিতে

চান, কিন্তু পারেন না। সম্পূর্ণ নেতাহীন, রাজনৈতিক পার্টি, সমাজ-সচেতন কর্মী বা সরকারের কর্মচারীর সংস্রবমুক্ত সেই ব্রাত্য হাজার দু-তিনেক মানুষের ক্ষোভ হতাশা আর অশ্রুশুষ্ক নিষ্পলক আক্রোশ সুবোধ ডাক্তারের বুকের ওপর চাপ হয়ে থাকে। যাদের আশ্চর্য সাহস আর আত্মবিশ্বাসের কথা ছেলেবেলা থেকে তাঁকে মুগ্ধ করে এসেছে— পূর্ব বাংলার সেই নমশূদ্র সমাজের মাত্র দশ-বারো বছরের মধ্যেই এই ভূতুড়ে পরিণতি তাঁকে হতবুদ্ধি করে দিয়েছে। কাল সকালবেলা যখন ক্যাম্পে ঘুরছিলেন, পাটের ক্ষেতের পাশ দিয়ে ওষুধের ব্যাগ হাতে উঁচুনিচু ত্রিপলঘেরা ডেরাগুলোয় ঘুরে ঘুরে চিকিৎসা করছিলেন তখনো বিরাট লম্বা চওড়া খাঁচাওয়ালা কয়েকটা লোক দেখে তাঁর ছেলেবেলা ভেসে উঠেছিল মনের মধ্যে। লোকগুলোর চওড়া কব্জি, কাঁধ, চামড়া গায়ের ওপর ঢল ঢল করছে। কয়েক বছরের ক্যাম্প-জীবনের গ্লানি তাদের মুখে চোখে, কিন্তু একটা গোঁ বোধ হয় এখনো তারা ছাড়ে নি। লাসগুলো একটার পর একটা হিন্দু সৎকার সমিতির গাড়িতে উঠছিল তখন একটা কান্নার আওয়াজ তিনি শোনেন নি। গাড়িটা চলে যাবার পর ত্রিপলের গলামানুষ সমান উচু তাঁবুতে তাদের স্ত্রী আর ছেলে-মেয়েগুলো গড়াগড়ি যায় ধুলোয়। একটা লোক হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'পুলিশকে আমরা হটাইয়া দিছি, এই আমরা— এই বাঁশের চটা,' বলে লোকটা তার বুক চাপড়াল। সুবোধ ডাক্তার গভীর অবসাদের মধ্যে জেগে উঠলেন। এই ক্ষোভ আর প্রতিরোধের ভবিষ্যৎ কি ?

হঠাৎ তিনি গভীর আত্মগ্লানি বোধ করেন। তাঁর ভাইয়ের একটা চালু বক্তব্য— পাঞ্জাবী রেফিউজি আর বাঙালী রেফিউজির তুলনামূলক সমালোচনা মনে পড়ে তাঁর বাগজোলা ক্যাম্পের নিঃসঙ্গ লোকটার মতো চীৎকার দিতে ইচ্ছে করে, 'কি করেছ সরকারের বুড়ো খোকারা এই লোক গুলোর জন্যে ?'—সুবোধ ডাক্তার সত্যিই চেঁচিয়ে ওঠেন।

নিবারণ ঝুঁকে পড়ে বললে, 'আমাকে বলছেন স্যার ?··· আর দশ মিনিট। এই এসে পড়লাম।'

সুবোধ ডাক্তার ঝিম্ মেরে বসে থাকেন। আর ভাবেন, লোকগুলো শুধু গুলির খোরাক, খবরের কাগজের খোরাক, আর প্যান্‌পেনে সহানুভূতির খোরাক হয়েই থাকল। যেমন তারা ব্রাত্য ছিল তেমনিই থাকল।

নিবারণের গলা কানে এল, 'বাগবাজার স্ট্রীট এসে গেছে স্যার। এবারে কোন্ দিক?'

সুবোধ ডাক্তার তন্দ্রা আর অবসাদের মাঝখানে জেগে উঠলেন, আস্তে আস্তে বললেন, 'বাঁয়ের গলি।'

গলির মুখেই নির্মলকে দেখা গেল। নির্মল, পরেশ কম্পাউণ্ডার, রতন, আরো পাড়ার দু-চারজন ছেলে দাঁড়িয়ে। ট্রাক থামতে নিবারণ হাত বাড়িয়ে সুবোধ ডাক্তারকে নামতে সাহায্য করে। কিন্তু তিনি নিজে নিজেই উঁচু পা-দানি থেকে প্রায় লাফিয়ে নামেন। নির্মল এগিয়ে এলে চেঁচিয়ে ওঠেন, 'তুই একটা…', বলতে যাচ্ছিলেন অকালকুষ্মাণ্ড। কিন্তু বোঁ করে মাথাটা ঘুরে যায়। পা টলে ওঠে। নির্মল বাপকে শক্ত হাতে জড়িয়ে ধরে।

যা ভয় করেছিলেন সুবোধ ডাক্তার তাই সত্যে পরিণত হল। কিছু-দিন হল ডিস্পেনসারিতে সন্ধের দিকে তাঁর নিঃশ্বাসের কষ্ট হত, বুক ধড়ফড়ানি বেড়ে যেত। মাঝে মাঝে কার্ডিওগ্রাফ করার কথা মনে যে হয় নি তা নয়। কিন্তু যে অসুখের চিকিৎসা নেই সে অসুখ নির্ধারণ করেই বা কি লাভ? বরং আজীবন যে গতিতে জীবনটা চালিয়ে এসেছেন তাতে হঠাৎ ছেদ পড়বে। আস্তে আস্তে হাঁটতে হবে। আর তাঁর স্ত্রীর জীবনাদর্শ অর্থাৎ এ পৃথিবীর সমস্ত ক্রিয়াকর্মই এক অমোঘ নিয়মে পরিচালিত এবং মানুষ নিমিত্তমাত্র— গীতার এই প্রাচীন ও লোভনীয় মতবাদ মেনে নিয়ে টুক্ টুক্ করে বাকি কটা দিন কাটিয়ে দিতে হবে।

তাঁরই বন্ধুপুত্র ঘোঁতু হার্ট স্পেশালিস্ট হয়ে বিদেশ থেকে ফিরে খুব পশার করেছে। নির্মল তাকে ডাকে। এ ক্ষেত্রে ডাক্তারেরা যা করে থাকে ঘোঁতুও তাই করলে। বললে, 'নুন খাবেন না, হাঁটাচলা এখন একদম বারণ।'

বিলেত থেকে ফেরার পর ঘোঁতু ফিডেল কাস্ট্রোর মতো দাড়ি রেখেছে। লম্বা চেহারা, দাড়ি আর রিম্‌লেস চশমায় সে যখন খুব আস্তে আস্তে কথা বলছিল তখন প্রমদা দেবী তাঁর স্বাভাবিক সন্তান-বাৎসল্যে সেই ঝকঝকে কয়েক হাজারী ব্যক্তিত্বের দিকে স্নেহের চোখে তাকিয়ে ছিলেন। 'কিছু ভাববেন না। জ্যাঠামশাইকে ছোটাছুটি করতে বারণ করুন। দেশে এত

লোক আছে। নেতারা আছেন। তাঁরা দেশ ঠিক চালিয়ে নেবেন। অত ভাবনার কি!'

চশমাটা নাকের ওপর তুলে একটা ইন্‌জেকশান দিয়ে বললে, 'জ্যাঠামশাই, ইউ লুক্‌টেন ইয়ার্স ইয়াঙ্গার।'

বুকের যন্ত্রণা সত্ত্বেও সুবোধ ডাক্তারের হাসি আসে। পশার জমাবার সমস্ত বিদ্যাই ছোকরা আয়ত্ত করেছে।

ঘোঁতু নির্মলের দিকে চেয়ে বললে, 'একটা দিন বাদ দিয়ে আমায় ফোন করলেই হবে। আমি এসে দেখে যাব।'

তারপর চোখবোঁজা সুবোধ ডাক্তারের দিকে চেয়ে বললে, 'আপনার সম্পর্কে ছেলেবেলা থেকে কত গল্প শুনে এসেছি বাবার কাছে। মেসোপটেমিয়ার কোন্ ক্যাম্পে সাহেব পিটিয়েছিলেন। ইট্ সাউণ্ডস্ লাইক্ এ ফেয়ারী টেল্।'

সিঁড়ি দিয়ে তড়বড় করে নামতে নামতে বললে নির্মলকে, 'মনে হচ্ছে স্ট্রোক। তবে আগের জামানার লোক। এখন তো চল্লিশেই টেঁসে যায়। তুমি তোমার আড্ডাগুলো কমিয়ে এখন কদিন বাপের সেবা করো।'

সারা দুপুর সুবোধ ডাক্তার মড়ার মতো পড়ে থাকলেন। ঘুমের ওষুধ খেয়েছিলেন, বোধ হয় তার ঘোর। সেই ঘুমের মধ্যেই তিনি বাগজোলা ক্যাম্পের কোলাহল শুনতে পান। গুলি চলার পর সেই নিষ্পলক আক্রোশ চাপ হয়ে তার বুকের ওপর এঁটে থাকে। তার ভারে তিনি ধুঁকতে থাকেন। বিকেলের দিকে একবার চোখ খুললেন। স্ত্রী খাটের পাশে পুজোয় বসেছেন। নির্মল এগিয়ে এসে এক ডোজ ওষুধ খাওয়াল।

স্ত্রীকে বললেন, 'তোমারই জয় প্রমোদ। মনে হচ্ছে আমাদের কিছু করবার নেই।'

প্রমদা দেবী স্বামীর পাশে বসে তাঁর একখানা হাত ধরে থাকেন। আস্তে আস্তে বলেন, 'যিনি করবার তিনি করবেন।'

'সে তো তুমি ইংরেজ আমলেও বলতে,' হাঁফিয়ে হাঁফিয়ে বলেন সুবোধ ডাক্তার।

'তুমি এখন কথা বোলো না। কষ্ট বাড়বে।' প্রমাদ দেবী স্বামীর টাকের ওপর চুলগুলো সমান করে পেতে দেন।

এপাশ ওপাশ করতে করতে সুবোধ ডাক্তারের ঘুম আসে। বোধ হয় বিপদ কাটল। কিন্তু এমন স্থির হয়ে শুয়ে আছেন যে পাশের ঘর থেকে সেদিকে চেয়ে নির্মলের ভয় করে। আড়ে নাক আর কপাল আরো ধারাল লাগে যেন তা রক্তমাংসের কিছু নয়। রাত্তিরে মধ্যে মধ্যে উঠে কয়েকবার নির্মল এ ঘরে আসে। প্রমদা দেবী স্বামীর এক হাত ধরে অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। নির্মল আরো কাছে আসে। খুব ধীরে ধীরে রুগীর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে।

॥ সাত ॥

পরদিন সকালে ডাক্তারকে সুস্থ দেখায়। তিনি সেদিনই ডিস্‌পেন্সারীতে যাওয়া মনস্থ করেছিলেন তবে নির্মলের ঘোর আপত্তিতে আর কোথাও বেরোলেন না। নির্মলের বইয়ের তাক থেকে মলাট-ছেঁড়া "পিক্‌উইক পেপার্স" পড়তে লাগলেন। নির্মলের দেরিতে ক্লাস। কলেজ কামাই করবে কি না ভাবছিল, সুবোধ ডাক্তার বললেন, 'ঘোঁতু আর কি বলবে! আমি বলছি, আই অ্যাম্ অল্ রাইট।' একটু থেমে বললেন, 'যদি কিছু হয় কেউ কিছু করতে পারবে না, তুই যা।'

দুপুরেও আজকাল ট্রাম খালি থাকে না। তবে সেদিন দৈবাৎ একটা সীট পাওয়া গেল। নির্মল বসে পড়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। যদিও হৃদ্‌যন্ত্রের প্রক্রিয়া দুর্জ্ঞেয় তবু সকালে তার বাপের চেহারা দেখে তার চিন্তাটা একটু কেটেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে গত কয়েকদিন ধরে সে যে একজনের হঠাৎ আবির্ভাবের অপেক্ষায় ছিল ভাবতে আশ্চর্য লাগে। চারপাশের বাস্তবটা এত জীবন্ত যে তার চিঠির মানসী সম্পর্কে তার অনুভূতিগুলো সৌখীন ঠেকে বৈ কি। তার বাপের দেশ সম্পর্কে যে বিরাট হতাশা এবং তার জ্যাঠামণির প্রবল উচ্চাকাঙ্ক্ষা তার পাশে তার অশরীরী মানসীর জন্যে প্রতীক্ষা জোলো লাগে না? নির্মল আত্মগ্লানিতে অধীর হয়ে ভাবে এই প্রতীক্ষার চেয়ে গৌতমের কাল্‌চারাল সাব-কমিটিতে মেতে থাকাও ভাল।

মন্থরগতিতে ট্রাম থেকে নামে নির্মল। আবার সে কথার ভাঁটিখানা

খুলে বসে। এক এক ভাঁড় করে শেলীর প্যান্থিজম্, কীটসের হেলেনিজম্ ছেলেদের সামনে রাখে আবার উইলিয়াম সেক্সপীয়রের বাণীও বিতরণ করতে হয়। বাংলাদেশ কেন সেক্সপীয়র নিয়ে মাতামাতি করেছিল নির্মলের আজকাল এ প্রশ্নটা বড্ড বেশী খোঁচা দেয়। সাহিত্য কিংবা ইংরেজী সাহিত্য মানেই যেন সেক্সপীয়রের কতকগুলো নাটকীয় লাইন। তারপর লাফ দিয়ে বাঙালী পাঠক চলে আসে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থে, কিছুটা শেলীতে, আর যারা ভীষণ আধুনিক তারা ইয়েটস্-এলিয়টে। এই অসংলগ্নভাবে সাহিত্য পড়া এবং পড়ানোর ব্যবস্থা ভীষণ ফোতো লাগে নির্মলের কাছে। এমন যোগ-সূত্র মনের মধ্যে গেঁথে তোলার কোনো চেষ্টা নেই যাতে বিভিন্ন মেজাজের লেখকদের বুঝতে সুবিধে হয়।

তবে মির্মলের সুমতি হয়েছে। এসব বিপজ্জনক কথাবার্তার ইঙ্গিত সে আর লেকচারে দেয় না। সেদিনও পর পর দুটো ক্লাসে কথার তুবড়ি ফুটিয়ে নিরবচ্ছিন্ন অবসাদে গুম্ হয়ে বসেছিল টিচার্স রুমে। আবার গৌতমের ধারাল বিদ্রূপমাখা মুখখানা ভেসে ওঠে। 'ফোনে ফেমিনিন্ ভয়েস্।···এর আগেও করেছিল। নাম বললে না।' আবার সেই ওপরওয়ালার হাসি হাসলে গৌতম।

আর নির্মল এতক্ষণ ট্রামে আসতে আসতে যে আত্মগ্লানিতে ভরে উঠেছিল, যে গ্লানিতে হঠাৎ শেয়ালদা থেকে সটকেছিল, সে গ্লানি কোথায় উড়ে যায়। গৌতমের চাহনি ভ্রূক্ষেপ না করেই সে পাশের ঘরে প্রায় দৌড়ে যায়।

'হ্যালো কে?'

'আমি রাজু', খুব চাঁছা গলা।

নির্মল চুপ করে থাকে। চিঠিতে অশরীরী মনে হত কিন্তু এবার আরো অস্বাভাবিক লাগে এত বেশী পরিষ্কার গলা।

'আমি সেদিন···' নির্মল শেয়ালদা থেকে তার পালানোর বৃত্তান্ত বলতে চায় কিন্তু নিজের কাছেই হাস্যকর লাগে।

'বলতে হবে না···বুঝতে পারছি। তবে না এলে বোধ হয় বুঝতে পারতাম না কি অ্যাব্সার্ড ব্যাপারটা।···আমরা পরশু সকালে চলে যাচ্ছি।'

'কোথায় উঠেছ?'

'হোটেলে।' রাজু শেয়ালদার একটা হোটেলের নাম করে। নামটা শুনে নির্মল একটু চম্‌কে যায়। নারীঘটিত মাতলামির ব্যাপারে কয়েকদিন আগে খবরের কাগজে আইন-আদালতের কলমে নামটা বেশ কয়েকবার দেখেছে।

'ওখানে কেন?'

'গ্র্যাণ্ডে উঠবার পয়সা নেই।'

নির্মল আবার চুপ করে থাকে। একবার ভাবে সামনাসামনি বসে থাকলে কি রাজু এমনভাবে বলতে পারত।

তারপর লোকে যেমন কিছু বলার না থাকলে বলে, 'কি খবর?' তেমনি ভাবে জিজ্ঞেস করে, 'আজ সকালে কোথায় গিয়েছিলে?'

'থানায়।'

'সে কী?'

'জানা ছিল না বুঝি? আমারও অনেক কিছু জানা ছিল না।...এটা বেশ গল্প লেখার মতো হল। এত কাণ্ডকারখানা করে এলাম। এসে দেখি ফক্কা!'

নির্মলের এতক্ষণ যা মনে হচ্ছিল এবার তা ঠিক বুঝতে পারে। এটা যে তাদের প্রথম পরিচয় তা তার মনে হচ্ছিল না। ফোনের মারফত থাকায় এ যেন তাদের চিঠিরই আর একখানা চিঠি। সেজন্যে অন্তত রাজুর তরফ থেকে প্রথম পরিচয়ের জড়তা একেবারেই নেই। সে তাকে মনের আনন্দে আর একখানা চিঠি লিখছে, আত্মবিশ্লেষণ করছে।

'এখন আমার ক্লাস নেই। এখন থাকবে?'

'এখন? না না, আমরা এখনই ব্যাঙ্কে যাচ্ছি।'

নির্মল বিহ্বল হয়ে চুপ করে থাকে।

'থানা, ব্যাঙ্ক— খুব হেঁয়ালী লাগছে, না? থানায় গিয়েছিলাম হাজিরা দিতে। হিন্দুস্থানের লোকেরা আমাদের ওখানে গেলেও এমনি হাজিরা দেয়। আর মাত্র পঞ্চাশ টাকা সঙ্গে আনতে দিয়েছে। ব্যাঙ্কে নিয়ে যাচ্ছে দিদির এক বন্ধু। যদি আর কয়েকটা টাকা পাওয়া যায়।'

'সন্ধেবেলা?'

'থাক্ না। চিঠি আর ফোন— এই করেই ফিরে গেলে হয় না?'

ওদিক থেকে কট্ কট্ আওয়াজ আসে। একটা অচেনা গলাও শোনা যায়। নির্মলের সন্দেহ হয়, কেউ আড়ি পাতছে। তাড়াতাড়ি বলে, 'আচ্ছা ঠিক আছে। আমি সন্ধে ছটায় যাব। থেকো কিন্তু।' ওদিক থেকে সম্মতির অপেক্ষা না করেই রিসিভার নামিয়ে রাখে।

ফোন ছেড়ে চুপ করে বসে থাকে নির্মল। রাজু যেন ধাপে ধাপে তার দিকে এগিয়ে আসছে। এখনো সে বায়বীয, অদৃশ্য। কিন্তু তার কথা কানে এসে বাজছে। আর চিঠিতেও তার যে দু-রকমের মেজাজ সে পরিচয় ফোনেও এল। রাজুর শেষ কথা, 'চিঠি আর ফোন— এই করেই ফিরে গেলে হয় না?' নির্মলের কানে বাজতে থাকে। আর কিছুক্ষণ আগে তার আশেপাশের পরিবেশ যেরকম প্রত্যক্ষ জীবন্ত মনে হচ্ছিল তা আর লাগে না। বস্তুত আরো একটা প্রত্যক্ষ জীবন্ত সত্য শেয়ালদার সেই কুখ্যাত হোটেলে আরো দুটো দিনের জন্যে আছে।

ছটা বাজবার আগে নির্মল যে সেদিন কি কি করেছিল তা তার খেয়াল নেই। একটা ক্লাসে সে প্রায় চোখ বুঁজে উইলিয়াম সেক্সপীয়রের সর্বগামী প্রতিভার ওপর অনবদ্য বক্তৃতা করে ফেলে কারণ আত্মসচেতনতার দংশন ছিল না তার মধ্যে। সে তখন সেক্সপীয়র সমালোচকদের প্রদর্শিত সমস্ত অলিগলিতে স্বচ্ছন্দ বিচরণে অভ্যস্ত। এমনকি দু-তিনজন ওস্তাদ ছোকরা যারা সে পেছন ফিরলেই 'নির্মল কিরকম মাঞ্জা দিয়েছে ছাখ' এরকম মন্তব্য করতে অভ্যস্ত তাদের মনোযোগও আকর্ষণ করে। প্রায় গৌতমের আত্ম-বিশ্বাসে সে ক্লাস নেয়। খুব কিছু পরিশ্রম বোধও হয় না। আসলে নির্মল তার আর-একটা সত্তাকে এখন বিশ্রাম দিতে চায়। পাহাড় ডিঙোতে হবে বলে লোকে যেমন সমতলভূমিতে আস্তে আস্তে হালকাভাবে হাঁটে তেমনি নির্মলও বাঁধা সড়ক থেকে বেরোবার পরিশ্রম করে না। তার ফলে তার লেকচার হয় সুবোধ্য, সর্বজনপ্রিয়।

ক্লাস নেবার পর টিচার্স রুমে খানিকক্ষণ বসেছিল। সেখানে গৌতম আর সুব্রতর মধ্যে একটা তর্কাতর্কি বেধে যায়। কতগুলো কথা বারবার ঘুরে ফিরে আসেই সেই উত্তেজিত চিৎকারে। 'ক্লাস কোলাবরেশন', 'ডগ্‌ম্যাটিক অ্যাপ্রোচ্', 'রিভিশানিস্ট মেণ্টালিটি' অথবা 'পার্লিয়ামেণ্টারী

সোসাইটি কি ট্যাকটিক্যাল ?' বা 'স্ট্রাগ্ল উইদিন্, স্ট্রাগ্ল উইদাউট', 'ইম্পিরিয়ালিজম ইন্ নিউ শেপ্,' 'বুর্জোয়া এথিক্স'— এই ধরনের ইংরেজী কথা কখনো রাগত ভাবে কখনো বিরক্তিতে, কখনো অবসাদে বলা হতে থাকে। সেই উৎক্ষিপ্ত কথার ঘূর্ণী নির্মলকে এক-একবার স্পর্শ করে আবার চলে যায়। তখন নির্মল কান খাড়া করে তার এই দুই বন্ধুর সান্ধ্যভাষা শুনতে থাকে। কিছু কিছু যে বোঝে না তা নয়, তারপর তার মনে হতে থাকে এ কথাগুলো, যা সমস্ত প্রাণহীন কথার লক্ষণ, অর্থাৎ 'থিং ইন্ ইট্‌সেল্‌ফ' বা এমন এক স্বয়ম্ভূরূপে রূপান্তরিত হয়েছে যে সেগুলো প্রস্তর যুগের মানুষদের কুঠার কিংবা ছুরির মতো সাজিয়ে রাখার যোগ্য, ব্যবহার করা যায় না।

আবার কখনো কখনো এ ধারণা হতে থাকে যে বোধহয় তাদের গোটা সাম্প্রতিক কালই এইসব কথার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ। সেজন্যে যারাই কিছু ভাবতে চেষ্টা করে তাদেরই এইসব শব্দকে আশ্রয়। তারপর ধীরে ধীরে এইসব শব্দের ঘাসে আগাছায় নিজেরাই জড়িয়ে পড়ে। ঠিক যেমন সুব্রতর কথা শুনে মনে হয় সে এই কথার আবর্ত থেকে বাঁচবার চেষ্টা করছে, যেন গৌতমের সঙ্গে কতগুলো ক্ষেত্রে তার তাত্ত্বিক মিল থাকলেও খুঁটিনাটিতে তাদের অনেক ফারাক। এই ভাবখানা সুব্রত যতবারই সামনে রাখতে চেষ্টা করে গৌতমের আক্রমণ রুখবার জন্যে ততবার নিজেই ভেসে যায় জমকাল শব্দের ঘূর্ণীতে। তাদের বিরোধের এবং উত্তেজনার অনেকখানি বুঝতে না পারলেও নির্মল প্রত্যেকবার যে উপসংহার লক্ষ করে এসেছে তারই পুনরাবৃত্তি ঘটে অর্থাৎ গৌতম অনুপ্রাণিত কণ্ঠে জ্ঞান দিতে থাকে এবং সুব্রত বেজারভাবে শুনে যায়।

নির্মলের এক-একবার সন্দেহ হতে থাকে তার সঙ্গে রাজুর পত্রালাপও হয়তো এই রকম কোনো শব্দের ঘূর্ণী যার সঙ্গে রোজকার সকাল-সন্ধে-রাত্রির জীবনের অনেক ফারাক। কথায় অনেক চমক সৃষ্টি করা যায় কিন্তু মানুষের জীবন যে অনেকখানিই চমকহীন এবং এই চমকহীন গল্পের উপসংহারহীন নিরবচ্ছিন্নতার জন্যেই না সেটা এত অদ্ভুত, এতখানি চ্যালেঞ্জের প্রয়োজন তার সামনে দাঁড়াতে। আর যত সময় যায় ততই দুর্নিবার আকর্ষণ বোধ করে শেয়ালদার সেই বাজে হোটেলটার জন্যে। এ যেন শুধু তার ব্যক্তিগত

ব্যাপার না, প্রায় একটা তাত্ত্বিক চ্যালেঞ্জ। যেখানে কথার এত বাহার সেখানে বাস্তবের চেহারা কেমন ?'

সন্ধে ছটা শেষ পর্যন্ত বাজল আর ঠিক সেই সময় কিংবা তার দু-চার মিনিট আগে নির্মল শেয়ালদায় সেই হোটেলের সিঁড়িতে থমকে দাঁড়িয়ে থাকে। এমন সড়িঙ্গে ভাবে বাড়িখানা উঠেছে যে একনজরেই বোঝা যায়, একবারে নয়, থেকে থেকে কোনো ঠিক প্ল্যান না করে বাড়িটা তোলা হয়েছে। ওপরের দিকগুলো ক্রমশঃ সংকীর্ণ পায়রার খোপ। বাড়িটায় আবার দু-তিনটে সিঁড়ি। একটা ভুল সিঁড়ি থেকে নেমে এসে ঘামতে ঘামতে নির্মল দ্বিতীয়টির দোতলায় উঠবার বাঁকে পা বাড়িয়েই থমকে দাঁড়ায়। একগাদা পানের পিকে টক্‌টকে লাল দেয়ালের কোণ। কোণের মুখে জমাদার দাঁড়িয়ে, বাঁ হাতের কেনেস্তারাতে ছাই ডিমের খোলা আর ডান হাতের ঝাঁটা থেকে টপ্ টপ্ করে ময়লা জল গড়াচ্ছে।

নির্মল ওপরে চোখ তুলে চাইতেই দেখে সিঁড়ির মুখে দুটি মহিলা। বোধহয় তাঁরাও তার মতো থমকে দাঁড়িয়ে আছেন সিঁড়িতে নামবার জন্যে। দু-জন মহিলা একেবারে দুরকম। প্রথমটি বছর তিরিশেক, মোটা শ্যামলা রঙ, বয়সের তুলনায় বেশী ভারিক্কী চেহারা। আর দ্বিতীয়টির বয়স কম, পাতলা ফ্যাক্‌ফেকে ফর্সা, একটু রুগ্‌ণ ফসা—পেঁয়াজী তাঁতের শাড়ির ওপর বাদামী চুলের বেণী। চোখ দুটো বেশ বড়োই কিন্তু নির্মলকে দেখে সে দুটো চোখ আতঙ্কে আরো বড়ো দেখায়। মেয়েটি সাঁ করে ঘরের মধ্যে চলে গেল। দেয়াল ঘষে পিঠে দেয়ালের চুন মেখে নির্মল ওপরে উঠে আসে। সামনে দরজার মাথায় আলকাতরায় লেখা ঘরের নম্বরটা দেখে ভাঙা গলায় প্রায় আত্মগতভাবে সুব্রত বলে, 'রাজু এখানে আছে ?'

মহিলাটি অপ্রসন্নভাবে তাকালেন নির্মলের দিকে। 'ও আপনি··· নির্মলবাবু···আসুন'। ঘর থেকে মেয়েটির গলা পাওয়া যায়, 'কোথায় আসবেন, আমরা এখন বেরোচ্ছি।' ভদ্রমহিলা খানিকটা ধমকের ভঙ্গীতেই মেয়েটিকে কি যেন বললেন। নির্মল ক্যাবলার মতো দাঁড়িয়ে থাকে সিঁড়িতে। মিনিটখানেক পরে ঘর থেকে মহিলাটি ডাকলেন, 'কই, এলেন না ?'

নির্মল ঘরে ঢোকে। দরজাটা নিচু। মাথা হেলিয়ে আসতে হয়। ঘরের মধ্যে একটা তক্তাপোষ ছাড়া বলতে গেলে আর কিছুই নেই। আম-

কাঠের ধুলোভর্তি একটা টেবিলে আরো ধুলোভর্তি এক ফুলদানিতে ছুছড়া আধ-শুকনো রজনীগন্ধা। এক দেয়ালে রামকৃষ্ণ আর-এক দেয়ালে স্নানরতা সুন্দরী জাতীয় প্রায়-বিবস্ত্র এক নারী, নীচে আ-ধোয়া কাপ-ডিশ, প্লেটে ডিম চ্যাড়চ্যাড় করছে।

নির্মল তক্তাপোষের এক কোণে বসে পড়ে। চোখ নিচু হতেই দেখলে মাঝে মাঝে ফাটা তেলচিটে সতরঞ্চি পায়ের নীচে। মহিলাটি বললেন, 'যা অপরিষ্কার চার দিক, তাড়াতাড়িতে আর কোথাও জায়গা পেলাম না।'

নির্মল গত কয়েক বছর ধরে যার চিঠি পড়ে আলোড়িত হয়েছিল সে মাথা নিচু করে জানলার নিচু কার্নিশে বসে থাকে। গভীর অভিনিবেশে তার জুতোর ফাঁসের বকলশ নিয়ে নাড়াচাড়া করে।

'আমি সেদিন স্টেশনে গিয়েছিলাম। কিন্তু এত লেট ছিল ট্রেনটা…'

'ওঃ সেদিন! প্রায় পাঁচঘণ্টা লেট। কলকাতা আর আসেই না।' একটু চুপ করে মহিলাটি বললেন, 'না এলেই পারতাম। বুঝেছেন? মাত্র কয়েকদিনের জন্যে। টাকাকড়ি আনতে দেবে না। বলুন, এসে কি লাভ?'

নির্মল এটা বুঝতে পারে যে এই মহিলাটিই তার অকূলে কূল। একবার আড়চোখে কার্নিশে-বসা মেয়েটির দিকে চায়। বোধহয় মাটিতে মিশে যেতে পারলে তার পক্ষে ভাল হত।

মহিলাটি বললেন, 'আরো খারাপ লাগে কি জানেন— যেসব জায়গায় ছেলেবেলায় থেকেছি সেসব জায়গা কি দারুণ পাল্টে গেছে। আজ সকালে পার্ক সার্কাসে গিয়েছিলাম; এক আত্মীয় থাকেন। গিয়ে দেখলাম সেই ভদ্রলোকই আছেন, আর কেউ নেই।' তারপর হঠাৎ রাজুর দিকে চেয়ে বললেন, 'তুই যে আমাকে এত জোর করে নিয়ে এলি। এখন কি? কথাটথা বল্।'

ওদিক থেকে মেয়েটি বললে, 'আজ না গেলে তোমার আর দোকানে যাওয়া হবে না বলে দিচ্ছি।'

'আর দোকান! এ-কটা টাকায় কিছু হয়? যা ধরতে যাচ্ছি তাই এত দাম!'

মেয়েটি শূন্যে চেয়ে বললে, 'আর-একটা দিন পরে এলে হত না?'

নির্মল কি বলবে বুঝতে পারে না। হাসবার চেষ্টা করে। এমন সময়

পাতলা ছিপ্‌ছিপে শ্যামলা এক যুবক ঘরে এসে ঢোকে। চশমার ভেতর থেকে একবার নির্মলের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে নমস্কার করে। বেশ ঠাণ্ডা চেহারা। নির্মলকে বলে, 'আপনার কথা অনেক শুনেছি।'

নির্মল বুঝতে পারে রাজু ও তার ভেতরের সম্পর্ক যতই বায়বীয় হোক তাকে একটা ভিত দেবার চেষ্টা করতে হয়েছে রাজুকে কলকাতায় আসবার জন্যে।

রাজুব দিদি বললেন, 'তোমার বেড়ানো হয়ে গেল এর মধ্যে? কোথায় গেলে?'

'চিংড়ির কাটলেট। সাঙ্গুভেলী, যেখানে আমরা খেতাম। অবিকল এক টেস্ট,' তরুণটি বললে।

দিদি বললেন, 'তুমি তাহলে আমার সঙ্গে চলো। কমলালয় স্টোর্সে যাব···আর···'

'আমিও যাব,' আর্তনাদ রাজুব গলায়।

বয়সটা এমনিতেই কম। তার ওপর আরো কম লাগে। এখনো কৈশোরের সেই চোখা ছেলেছেলে ভাবখানা যৌবনেব লালিত্যে ধসে যায় নি। অথবা এ তার রুগ্‌ণতায় বাড়ের অভাব। ঠিক বুঝতে না পারলেও নির্মল এক প্রবল মমতাবোধ করে প্রায় এই অপরিচিত মেয়েটির জন্যে। দাঁড়িয়ে উঠে বলে, 'আচ্ছা, আপনারা যান। আমি নাহয় কাল সকালে আসব।'

রাজুর দিদি আশ্চর্য হয়ে তাকান তাঁর বোন আর নির্মলেব দিকে। রাজু এতক্ষণ পর চোখে তোলে। চোখ তুলে একবার নির্মলকে খুঁটিয়ে দেখে। আর তার ফোটো থেকে সম্পূর্ণ আলাদা একটা পাগ্‌লাটে আলো তার চোখে ঝিলিক মারে। তার দিদির দিকে চেয়ে বললে, 'আচ্ছা, তোমরা যাও। এত তোড়জোড় করে এলাম নির্মলবাবুর সঙ্গে দেখা করার জন্যে।'

রাজুর দিদি যাবার আগেও একবার ইতস্তত: করলেন, 'কি রাজু, যাব? না তুইও যাবি?'

'না, না, তোমরা যাও,' অসহিষ্ণুভাবে রাজু মাথা নাড়ায়।

আর দিদি ছোকরাটি বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি কেমন মনমরা হয়ে বসে থাকে। জোর করে কথা বলার ভঙ্গীতে বললে, 'দিদির আর

শাড়ীর পাড় পছন্দ হয় না। আজও ঠিক ফিরে আসবে। আমি গেলে জবরদস্তি করে একটা কিনিয়ে দিতাম।'

'খুব খারাপ লাগছে, না ?' নির্মল প্রথম আলাপের অনেকগুলো ধাপ পার হয়ে আলাপ করতে চায়। আজ আর কাল দুটো দিন। অপ্রাসঙ্গিক কথায় এ দুটো দিন নষ্ট করতে সে রাজী নয়।

রাজু সেদিকে কান না দিয়ে বলল, 'খোকাবাবুটা যা খেতে ভালবাসে।'

—'খোকাবাবু কে ?'

'ঐ যে গেল দিদির সঙ্গে। চিংড়িব কাটলেট, মাংসের কারী, দই মাছ, কাবাব, হেন তেন—একেবারে রাক্ষস।' রাজু এবার অনেকটা স্বচ্ছন্দে হেসে ওঠে।

'আমি যখন তোমাব কলকাতায় আসাব কথায় উৎসাহ দেখিয়েছিলাম তখন ভাবি নি তোমায় এত হুজ্জুত পোয়াতে হবে।'

'গানটান জানা আছে ? এই রবীন্দ্রনাথ ?' এমন হাল্কাভাবে ভাববাচ্যে রাজু প্রশ্নটা রাখে যে তার উদ্দেশ্য কি নির্মল ঠিক ধরতে পারে না। একটু অপ্রস্তুতভাবে বলে, 'বাথরুমে গান গাই।'

'হোক-না—হোক-না', রাজুর সারা মুখে চাপা বিদ্রূপ।

সুচিত্রা মিত্র না রাজেশ্বরী দত্ত কিংবা ঐ রকম কারুর বেকর্ডে গাওয়া গান গাইবার চেষ্টা করে নির্মল। খুব একটা ভাল কিছু শোনাচ্ছিল না আবার একেবারে অখাদ্যও নয়। কিন্তু মাঝপথে এসে নির্মল বুঝতে পারে গান শোনায় রাজুব কোনো ইচ্ছে নেই। আসলে যে বিষয় তাকে টানে, যে ভাবনা নিয়ে সে আলোড়িত তা ঢাকবার জন্যে কোনো রকমে তা-না-না-না করে সময় কাটিয়ে দিতে চায়। একবার ঘড়িও দেখে। নির্মল মরিয়ার মতো গান গেয়ে যায় যেমন মরিযাভাবে কলেজের ক্লাস নেয়। তারপর গান থামিয়ে বলে, 'এবার আমরা স্বাভাবিকভাবে আলাপ করতে পারি, কি বলো রাজু ?···তারপর যেন রাজুকে ঝাঁকি দিয়ে ঘুম ভাঙাবার জন্যে বলে, 'তুমি বার বার চিঠিতে যার দিকে হাত বাড়িয়েছ আমি সেই লোকটা তোমার সামনে দাঁড়িয়ে। কেন পালাচ্ছ ?'

নির্মলের কথার মধ্যেই মেয়েটির চাহনি কোমল হয়ে ওঠে। স্থির

দৃষ্টিতে সে যখন নির্মলের দিকে চায় তখন নির্মল লক্ষ করে ফোটোগ্রাফের সেই সাদামাটা কৌতূহলী চাহনি যা তাকে আকর্ষণ করেছিল।

নির্মল আবার বাঁধ ভাঙবার বেগে বলতে থাকে, 'আমাদের হাতে সময় কম। এর মাঝখানে আমাদের দুজনের দুজনকে চিনে নেওয়া দরকার।'

'কেন?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে রাজু প্রশ্ন করে।

'দরকার নেই?'

'না, কোনো দরকার নেই।...আমি একটু শান্তি চাই। ছেলেবেলা থেকে চারপাশে শুধু অশান্তি দেখে এসেছি।'

নির্মল ব্যগ্রভাবে বললে, 'তাহলে মিছিমিছি কেন এলে রাজু?'

'তোমার সময় নষ্ট হচ্ছে।'

নির্মল দমে না। বলে, 'তোমারও।...আর তুমি যে এই কষ্ট সহ্য করেছ সেই জন্যেই আমাদের দায় আরো বেড়ে যায় না?'

রাজু কপালে হাত দিয়ে বলে, 'আজ দুপুর থেকে মাথাটা ধরেছে। একটু চা আনতে বলি।

ফাটা মোটা পেয়ালায় চা খেতে খেতে নির্মল তাকায় মেয়েটির দিকে। চা-টা বোধ হয় তাদের জন্যেই বিশেষভাবে করা। এমন গোবরগোলা কালচে কড়া চা সে অনেক দিন খায় নি।

আধ-খাওয়া পেয়ালাটা সরিয়ে রাজু বলে, 'আমার এক বন্ধু আছে—ফুলু। সে আমার আইডিয়াল।'

'তাই নাকি? কিন্তু চিঠিতে...' নির্মলের স্পষ্ট মনে পড়ে চিঠির লাইনগুলো।

'চিঠিতে তো মানুষ কত কিছু লেখে।' আবার পাগলাটে পাগলাটে ভাবে তাকায় নির্মলের দিকে।

'আমি কিন্তু যা লিখেছি তা বিশ্বাস করি।'

'আমি মহৎ লোকদের ভয় পাই।

নির্মল অপ্রসন্নভাবে বললে, 'ব্যঙ্গ করছ?'

'ফুলু খুব সাধারণ, সাধারণভাবে সংসারযাত্রা করে জীবনটা কাটিয়ে দেয়। আমি ভেবে দেখছি, তাই ভাল। যার যে রকম ক্ষমতা। অসাধারণ

হবার ক্ষমতা আমার নেই।...আমার দিদিকে যে জন্যে ভাল লাগে। আমি ওর মতো হতে পারলে খুশি হব।'

আর চিঠি পড়তে পড়তে নির্মলের যেমন মনে হয়েছে কথার আড়ালে সে নিজেকে ঢাকছে তেমনি এই মুহূর্তে সে বুঝতে পারে না এটাই তার ঠিক মনের কথা কি না। বলে, 'তোমার চিঠির কথা আমার এক বন্ধুকে বলেছিলাম।'

'বাঃ!'

"সে কি বললে জানো?'

'পাগল বলেছে তো?'

'নিউরটিক'

রাজু হাততালি দিয়ে বলে উঠল, 'ওয়াণ্ডারফুল! আমার এ কথাগুলো এমন ভাল লাগে! নিউরটিক, সেন্টিমেন্টাল, এক্সেন্ট্রিক!—এ সব ক'টা লেবেল আমি কপালে আঁটব।'

'আমি লেবেলে বিশ্বাস করি না।'

'সে কি! আশ্চর্য কাণ্ড! তা কি কখনও মানুষ পারে? মানুষের কতটুকু শক্তি!'

'সত্যি রাজু। এটাই তোমার সবচেয়ে আকর্ষণের ব্যাপার। তোমার ঐ চিঠির জোরাল কথাগুলোর পেছনে কি আছে সেইটাই জানবার ইচ্ছে।'

'বাঃ, বেশ নায়কের মতো কথা। আমি কিন্তু নায়িকার মতো কথা বলতে পারি না। একেবারে মিস্‌ফিট। আমার ভীষণ হাসি পেয়ে যায়।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অন্যমনস্কভাবে হঠাৎ রাজু বললে, 'তুমি তো হিন্দু, আমি তো মুসলমান না?'

'হ্যাঁ। তোমরা কাছা না দিয়ে ধুতি পরো, আমরা কাছা দিয়ে পরি। তোমরা দাড়ি রাখো, আমরা দাড়ি কামাই। তোমরা··'

'হয়েছে, হয়েছে!' কৌতুকে রাজুর চোখ উজ্জ্বল দেখায়। তার পরই দপ্‌ করে নিভে যায়। আস্তে আস্তে বলে, 'মতিনকে জানা ছিল? একই স্কুলের না যশোরে? মাঝখানে খুব কমিউনিস্ট হয়ে গেল। বাংলা ভাষা আন্দোলনে ক্ষেপে উঠল।'

নির্মলের মনের মধ্যে একটা আবছা চেহারা ভেসে ওঠে। ফর্সা হ্যাংলা

চেহারা। একটা স্মৃতি এখনও মরে যায় নি ভেবে অবাক হয়। মতিন রোজ হাফপ্যান্টের পকেট ভর্তি করে তাদের বাগানের নারকেলি কুল আনত।

'নিউজ এজেন্সিতে ছিল না?' এ রকম একটা অস্পষ্ট খবর শুনেছিল নির্মল।

'এখন সে জার্মানীতে সেটল করেছে।'

'সেট্‌ল করেছে?'

'বুঝতে খুব কষ্ট হয়, না?' রাজুর গলায় বিদ্রূপ ছিল না। আড়ষ্ট গলায় আস্তে আস্তে বললে, 'আমাদের আর দেশ টেশ বলতে কিছু নেই। সেই ছেলেবেলার হিন্দু-মুসলমানের বিরাট ভারতবর্ষটা কোথায় মিলিয়ে গেল! এখনও আমার একটা ক্লাস ফোরের ভূগোল আছে। ম্যাপটার দিকে মাঝে মাঝে তাকাই।'

নির্মল টের পায় রাজু এখন আর কথার পেছনে নিজেকে ঢাকছে না। কিন্তু বাংলা দেশ ভাগের পেছনে যেমন একটা দুঃখ আছে তেমনি এক তীব্র হতাশাও আছে। সেই হতাশা আর সেই হতাশা থেকে একেবারে মরীয়া হয়ে মাথাকোটা তার বাবার ক্ষেত্রে দেখেছে। আরও ভাল করে দেখেছে গত দু-তিন দিনের ঘটনায়। সেই হতাশা নির্মল পছন্দ করে না। আর সে চায় না রাজুকে অবলম্বন করে তার মনের মধ্যে যে স্বপ্ন গড়ে উঠেছে তার ওপর এই হতাশার ছায়া পড়ে। সাবধানে বলে, 'ও নিযে আর ভেবে কি লাভ? যা হবার তা হয়েছে।'

নির্মলের কথা রাজুর কানে পৌঁছল না। আত্মগত স্বরে বললে, 'আরও এই কলকাতায় পা দিযে মনে হচ্ছে আমাদের কোন দেশ নেই। কোথাও না! শেষ পর্যন্ত মতিনের মতই আমাদের দেশছাড়া হতে হবে।'

আবার সেই প্রবল অবসাদ যা তার চিঠির সজীবতার পাশাপাশি বয়ে চলেছে সেই অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে বসে থাকে মেয়েটা।

'আমরা যদি নিজের মন শক্ত করে পাশাপাশি দাঁড়াই...'

'আর একটা গান হলে কি রকম হয়?'

আবার পালাচ্ছে রাজু। আবার তা-না-না-না করে সময় কাটিয়ে দেবার তালে আছে। আবার সেই অচেনা পাগলাটে আলো তার চোখে খেলতে

থাকে। বলে, 'ঢাকায় কয়েকটা হিন্দু-মুসলমানে বিয়ে হল। এ নিয়ে আবার সাহিত্যও হচ্ছে।'

রাজুর চাহনির সামনে কুঁকড়ে যায় নির্মল। 'তোমার চিঠি পড়ে কিন্তু মনে হয়েছিল…' বলতে গিয়ে থেমে যায়।

আবার স্বাভাবিক দেখায় রাজুর চেহারা। কোমল দৃষ্টি মেলে তাকায় নির্মলের দিকে। 'খুব খারাপ লাগছে, না? যেমনটি ভাবা গিয়েছিল তেমনটি নয়— ঠিক বলি নি?…কি জানি, হয়তো আমি বড্ড তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে গেছি। এত ভালো ভালো কথা শুনলাম, এত ঘর ভাঙতে দেখলাম।… এত তোড়জোড় করে না এলেই ভাল ছিল।'

তারপর নির্মলকে একটা কন্‌সোলেশান প্রাইজ দেবার ভঙ্গীতে বলে, 'সেই সাইকেলটা এখনো আছে?'

আসলে ছেলেবেলায় প্রতিবেশিনী মেয়েটিকে সাইকেলে দু-একবার চড়ানো এতই অপ্রাসঙ্গিক যে নির্মল অপ্রস্তুত বোধ করে। বলে, 'না, ওটা চুরি হয়ে গেছে অনেকদিন।'

রাজু একটু চুপ করে থেকে বললে, 'এর পরও যদি কাল ইচ্ছে থাকে আসাব…'

'আমার কাল সকালের দিকে ক্লাস নেই। আসব।' নির্মল কথাটা লুফে নিয়ে বললে। তারপর উঠে পড়ে। উঠবার সময় মনে হচ্ছিল সে এক অপটু নট যে কোনো রকমে রঙ্গমঞ্চে ঢুকে পড়েছে কিন্তু কেমনভাবে বেরোবে জানে না।

পরদিন সকাল সকাল চান করে ফিটফাট্ হয়ে বেরোয় নির্মল। ন'টার মধ্যেই শেয়ালদার হোটেলে পৌঁছায়। মোট্‌কা তালা ঝুলছে দোতলার মুখে দরজায়। নির্মল নেমে আসে। রোদ্দুর চড়ে গেছে। চানের পর বলেই বোধহয় আরো চড়চড়ে লাগে। একটা অখ্যাত রেস্তোঁরায় ঢুকে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে নির্মল নিজেকে প্রশ্ন করে—এটা কী ব্যাপার? তাদের পরস্পারের সম্পর্ক কি প্রেম না কৌতূহল যে কৌতূহলে লোকে ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস পড়ে?

সেদিন দুপুরে আবার তার চিঠির মানসীকে খুঁজবার অভিযানে নির্মল ক্লান্ত বোধ করে। ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস পড়ার কৌতুহল মিটে যাচ্ছে।

একেবারে জলের মতো কে আসামী আর কিভাবে সে ধরা পড়বে; একেবারে স্পষ্ট তারা দুজনা আর দুটো সন্ধে কথার ফুলঝুরি জ্বালিয়ে আবার যে যার অন্ধকারে বাসা করবে। কথা কখনো অব্যর্থ সন্ধানের সহায়ক হবে না। বুঝতে দেবে না মেয়েটি তার সম্পর্কে কি চায় এবং মেয়েটির সম্পর্কেই তার কৌতূহলের কারণ কি। মেয়েটির চোখে কামনার বিশেষ ছাপ নেই, বক্ষদেশও মোটেই মার্লিন মনরো-সদৃশ নয়। প্রায় বলা যায় যৌবন আসে নি এমনি এক মেয়ে তার মেজাজের স্বাভাবিক সজীবতায় তাকে আকর্ষণ করেছে আর কলকাতায় এসে তার স্বাভাবিক বিতৃষ্ণায় কুঁকড়ে গেছে। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

কিন্তু বিকেল হতে না হতেই অস্থিরতা বোধ করে নির্মল। একটা ভবিতব্যের মতো সেই নোংরা হোটেল তাকে টানে। সিঁড়ির মুখেই রাজুর দিদির গলা শোনা যায়, 'সেই পাতা-পাতা জংলাটা কোথাও পেলাম না।'

'ঐ পেল্ হলদের ওপর খয়রীটা তো?' রাজুর গলা আসে।

'আর একটা পছন্দ হয়েছিল। নীলের ওপর ব্রাইট ইয়লো। কিন্তু যা দাম!'

'সব জায়গায় দাম!'

নির্মল ঘরে ঢুকবে কি ঢুকবে না ভাবছিল। দিদি বললেন, 'খোকা আবার বেরিয়েছে?'

'হ্যাঁ, পাগলের মতো ঘুরছে। পার্কসার্কাস, বালিগঞ্জ, শ্যামবাজার, মানিকতলা। এসে এক লম্বা ফিরিস্তি দেবে! আমার বড্ড ক্লান্ত লাগে শুনতে।'

'নির্মল?'

'জানি না, হয়তো আর আসবে না।' একটু চুপ করে থাকার পর আরো নিচু গলায় রাজু বললে, 'না এলেই ভাল।'

নির্মল দুবার কাশে। দিদি বেরিয়ে এসে বলেন, 'ওমা, আসুন, আসুন। আপনার কথাই আমরা বলছিলাম।'

'কিরকম নাছোড়বান্দা দেখেছেন তো!' নির্মল হাসবার চেষ্টা করে।

'না না, কি বলছেন! চা আনতে বল্ রাজু।'

'আজ সকালে··· ?'

'টাকার ধান্ধায়,' কর্কশ গলায় রাজু জবাব দেয়।

চায়ের কথা বলতে রাজু উঠে গেলে দিদি দুঃখ করেন, 'আমরা সবকটা বোনই এক রকম। ও একেবারে আলাদা। কি ভাবে, কি করে বুঝি না। ওর জন্যে আমাদের সব সময় ভাবনা।'

রাজু ফিরে এসে ভাববাচ্যে বলে, 'জীবন পাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছ দান— গানটা জানা আছে?'

'আমি তো গান জানি না।'

'সে কি, খোকাবাবুটা থাকলে কিরকম গান শোনা যেত।'

নির্মল স্পষ্ট বোঝে তার আজকের অভিযান ব্যর্থ। গতকাল এক-একবার মনে হয়েছিল, মেয়েটি তার খোলস ছাড়ছে। কিন্তু আজ সে রকম ভাববার কারণ নেই। বোধহয় সামনের চব্বিশটা ঘণ্টা এইভাবেই চালাবে।

'করিম আর বিয়ে থাওয়া করলে না?' নির্মল মরিয়ার মতো চেষ্টা করে রাজুর নিস্পৃহতার কঠিন আবরণ ফুঁড়তে।

'কই, লিলি বা'টলারের সঙ্গে তো বিয়েটা হল না।' তারপর নির্মলের জিজ্ঞাসু চোখের দিকে চেয়ে বললে, 'অস্ট্রেলিয়ান। দাদা কলম্বো প্ল্যানে সীড্‌নি ঘুরে এল না? ওখানে টেনিস খেলতে আলাপ। তারপর আর বিয়ে করে নি।...সবই বাজে, না? পলিটিক্‌স্‌, প্রেম, কোনো কিছুরই কোনো মানে হয় না।'

নির্মলের মনে হতে থাকে একটা ন্যাড়া অনাবাদী মাঠে সে জমি নিড়োবার চেষ্টা করছে। চিংড়ির কাটলেটের গন্ধ আসে। তার সঙ্গে ভেসে আসে শেয়ালদা থেকে ইঞ্জিনে একটানা হুইসিল। বোধহয় ছাড়ছে। রাস্তা থেকে প্রচুর লোকের গলার আওয়াজ হঠাৎ একসঙ্গে আসতে থাকে। বোধহয় একটা লোকাল ট্রেন এল। নির্মল স্থাণু হয়ে বসে থাকে। রাজুর দিদি কি সব বলতে থাকেন। বোধহয় জিনিসপত্রের দাম বাড়ার কথা, অথবা তার বোনের মাথায় যে একটু ছিট আছে সে সম্পর্কে দু-একটা ঘটনা—এরই মধ্যে তাদের সেই জ্যাঠতুতো ভাই খোকাবাবু দড়াম করে দরজা খুলে ঢোকে। কলকাতার দর্শনীয় বিষয়গুলির কতগুলো সে দেখে ফেলেছে তার বর্ণনা দিতে থাকে।

তক্তাপোষ থেকে নির্মল উঠে পড়ে বললে, 'আজ আসি।'

রাজু সচকিত চোখে তাকায়। তারপর বলে, 'খোকাবাবুর গানটা শোনা হবে না? ওর আবার তাল ভুল হয় না।'

পাশের পাতলা পার্টিশানের ওপাশ থেকে একটা ভারী মদালস নারীকণ্ঠ হঠাৎ ভেসে আসে, 'অমন রাগ করে তাকিয়ে থেকো না।'

নির্মল চমকে উঠে রাজুর দিদিকে একটা অর্ধসমাপ্ত নমস্কার ঠুকে বেরিয়ে পড়ে।

॥ আট ॥

অদ্য শেষ রজনী। তারা দুজনেই ভাবে নি এ রকম একলা দুজনে মুখোমুখি বসবার সুযোগ হবে। কলকাতায় রাজুদের তিন দিন থাকার মধ্যে দুটো দিন যেভাবে কেটেছে, আর-একটা দিনও তেমনি কেটে যাবে। অর্থাৎ অজস্র পাতাকাটা যে মুর্শিদাবাদী জংলা সিল্কের শাড়ী উঠেছে তার স্টক নিঃশেষ বলে দিদি ক্রমাগত আক্ষেপ করবেন আর রাজু বলবে, যেন নির্মলকে উৎসাহ দেবার জন্যেই, 'আমার জীবন পাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছ দান' করো না। তারপর রাজুর দাদা করিমের কথা উঠবে। সেই অস্ট্রেলীয় রমণীকে হৃদয় দানের গল্প তৃতীয় বার শুনবে। আবার সেই লম্বাপানা জ্যাঠতুতো দাদা যার জার্নালিজ্‌ম পড়বার জন্যে আমেরিকা যাওয়া ঠিকঠাক সে এসে কলকাতায় কোন্ কোন্ পাড়া ঘুরে এল তার ফিরিস্তি দেবে। সিঁড়িতে পায়ের ওঠা-নামার শব্দ বাড়বে। পার্টিশানের ওপাশেই এক সন্দেহজনক প্রেমিকযুগলের কখনো বাষ্পাকুল কখনো আহ্লাদে সঘন গলা ভেসে আসবে। তার সঙ্গে আসবে চিংড়ির কাটলেটের গন্ধ, হোটেলের বয়কে বারবার ডাকবার পর ফাটা মোটা পেয়ালায় কয়েক কাপ চা, ইঞ্জিনের ভোঁ।

এরই মাঝখানে মাঝখানে রাজুর সচকিত চাহনি, সে-চোখে একটাই অনুরোধ—এই মায়াবী অবাস্তব অবস্থার ছেদ টেনো না, এইরকম চলুক আর-একটা দিন; তারপর আবার শব্দের মায়াজালে আশ্রয় নেব, শব্দের নরম লেপে গা ঢেকে নির্মল তোমার দিকে তাকাব। শব্দ বাদ দিয়ে তোমার পাশে এসে দাঁড়াতে আরো সাহস লাগে। এই বেশ কাটছে বছরের পর

বছর। এরই মাঝখানে আমি ডন্ কুইক্‌সোটের মতো বাড়ির সঙ্গে ঝগড়া করে দিদিকে পটিয়ে ঢাকা থেকে কলকাতা আসব আর তুমি তখন তোমার উদ্‌গ্রীব মুখখানা তুলে সিগারেট খাবে আর এক-আধটা রবীন্দ্রসংগীত গাইবে। এই চলুক। চিঠিতে আমি বলেছি অন্য রকম হবে, অন্য রকম স্বপ্নের ইঙ্গিত আমি চিঠিতে দিয়েছি। কিন্তু দেখতে পারছ তো এরই মধ্যে থানায় হাজিরা দিয়ে, এই নোংরা হোটেলের ভাত খেয়ে, শেয়ালদার অগণিত মানুষের ভিড় ঠেলে কদিনেই হাঁফিয়ে উঠেছি। বামুন হয়ে চাঁদে হাত দেওয়া যায়? আর হঠকারিতায় আমরা পাশাপাশি দাঁড়াতে পারি চিঠির মতো, কিন্তু কয়েকটি আলোড়িত মুহূর্তের জন্যে নয়, সত্যিই কি বছরের পর বছরে মোড়া ক্লান্তি-অবসাদ-কাপট্যের মাঝখানে আমরা দাঁড়াতে পারব ঠাণ্ডা মাথায়, পরস্পরের প্রতি গভীর মমতায়?

আর নির্মল? নির্মল সেদিন হোটেলের ঠিক নীচেই ক্রমাগত ভিড়ের ধাক্কা খেতে খেতে করাচী থেকে লেখা রাজুর একটা সাম্প্রতিক চিঠি মনে মনে আওড়াচ্ছিল। এ চিঠিটা তার মুখস্থ হয়ে গেছে। আর তার মনে হচ্ছিল শব্দের খোলস থেকে মেয়েটা বেরিয়ে আসছে তার স্বরূপ নিয়ে।

> 'জানি ঠিক এখন আমার লেখা উচিত নয়, কারণ এখন আমি পৃথিবীতে নেই, কারণ এখন আমি স্বর্গে। তুমি আমায় স্বর্গে তুলে দিয়েছ! বুঝেছি তোমার তুলে-দেওয়া জায়গা থেকে জীবন আমায় বেশ চমৎকার একটা আছাড় দেবে। আমার ভেতর প্রাণসঞ্চার হচ্ছে। রাগ কোরো না ছেলেমানুষীতে। কথা দিচ্ছি, তোমার ওপর কোনো ভার চাপিযে দেব না। শুধু না জানিয়ে পারি না যে আবার যেন বেঁচে উঠছি আমি। কি বোকা বোকা লাগে এই বাঁচাটা! জানি তোমার ভ্রূ কুঁচকে গেছে, জানি জীবনকে অপমান করলে তোমার সইবে না। এ মুহূর্তে সব মাপ করতে হবে। আমার ওপর রাগ করলে অন্যায় হবে।
>
> তোমার চিঠিটা যে অসহ্য আনন্দ বয়ে এনেছে তা বোঝাতে চাই, বুঝলে?
>
> দেশে যেতে খুব উৎসাহ পাচ্ছি না। পরীক্ষা সামনে। তোমায় দেখতে ইচ্ছে করে— ভয়ও পাই। নানা কারণে। বলব

সব, আস্তে আস্তে। ভয় হচ্ছে, দেশে ফিরে যদি কলকাতায় যেতে না পারি। আবার কলকাতায় যেতেও ভয় করছে।

অতীতের অনেক আগাছা আমার শরীর জড়িয়ে, তোমার গায়ে তা কাঁটার মতো ফুটতে পারে। আমায় প্রশ্রয় দেওয়া সমীচীন কিনা সে বিচারের ভার তোমার ওপর রইল। আমার লোভ থেকে আমায় তুমি বাঁচাও।

তোমার কাছ থেকে এতটা পাওয়া যাবে আশা করি নি। স্বতঃস্ফূর্ত সাড়াও পাঠিয়েছি ওদিকে স্বার্থপরের মতো। এটা ভাবিনি তোমার ওপর অন্যায় হল কি না। নতুন করে জীবন গড়ার সাধ আছে। পারব কি তোমার মাথায় কুড়ল না মেরে?

তোমায় তো পেয়েছি খুব কাছে— রাখতে পারব তো? পোড়ারমুখী জীবনটা রাখতে দেবে তো? বড্ড ভয় করছে। মনে হচ্ছে লাভটা আমার অতিরিক্ত। কিছুই ছাড়তে পারছি না। একশোটা হাত বাড়িয়ে জীবনের পাত্র চেটেপুটে খাচ্ছি, আবার তাকে দুষছিও, গালও দিচ্ছি।

তোমার মতো মানসিক স্বাস্থ্য আমার নেই, এইটে মনে রাখলে আমার বকবকানি ক্ষমা করতে পারবে।

—রা

পুঃ— তুমি এমন অল্প কথায় বক্তব্য শেষ করো কেমন করে আমায় শেখাবে?'

ঘরে ঢুকে নির্মল চমকে যায়। রাজু এমন চেটালভাবে লিপস্টিক মেখেছে, চুলে সাবান দিয়ে ফাঁপিয়েছে আর তীব্রভাবে চেয়ে আছে তার দিকে যে এই মূর্তির সঙ্গে তার চিঠির সেই ঘরোয়া দিলখোলা স্বচ্ছবুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল মেয়েটির কোনো মিল নেই। এ সাজটা বোধহয় স্বেচ্ছাকৃত, যাতে নির্মল চটে যায়, যাতে তাকে হাল্কা দেখায় এ জন্যে সে তৎপর, যাতে চিঠির রাজুর অবয়ব একেবারে লেপেমুছে যায় নির্মলের মন থেকে আর তা-না-না-না করে আরো চব্বিশটা ঘণ্টা কাটিয়ে দেওয়া যায়।

'তোমার একটা গোল্ড ফ্লেক দাও তো,' ভাঙা গলায় রাজু বললে।

'কেন?'

'কেন আবার ?'

প্রায় ছিনিয়ে নেয় রাজু সিগারেটের বাক্সটা নির্মলের হাত থেকে তারপর অনভ্যস্ত হাতে তুলতে গিয়ে দু-তিনটে সিগারেট মচকে দেয়। তারই একটা তুলে নিয়ে বলে, 'আগুন দাও।' ফোঁ ফোঁ করে জ্বলন্ত সিগারেটে টান দিয়ে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে কাশতে থাকে। কাশতে কাশতে বলে, 'আমার কিন্তু অভ্যাস আছে। করিমের কাছ থেকে কত খেয়েছি। মাথাটা পরিষ্কার থাকে।'

'দিদি কোথায় ?'

'দিদি মুর্শিদাবাদী, কাঞ্জীভরম্…'

'আর তুমি ?'

'আর আমি ?' রাজু হঠাৎ চোখ তুলে তাকায় নির্মলের দিকে। আর নির্মল লক্ষ করে সে চোখের তীব্রতা হঠাৎ নিভে গেল। নির্মলের দিকে উদ্‌গ্রীবভাবে চেয়ে আছে দুই চোখ, কিছুটা মমতা মাখানো, কিছুটা অবসাদভরা।

'আমি ভাবছি দিদির সঙ্গে গেলেই ভাল হত,' আবার ধোঁয়া ছাড়ে। …'এই তো বেশ আছি…কেন মিথ্যে স্বর্গ রচনা করব নির্মল ?'

নির্মল আহত বিস্ময়ে চেয়ে থাকে। রাজু বলে, 'এই বেশ আছি। এই হিন্দুস্থান-পাকিস্তান। এই ধর্মের নামে দু-দেশের বুড়ো বুড়ো লোকগুলোর বাঁদরনাচ।…কাল দিদি আমার নামে কী বলছিল ? বলছিল না, আমার মাথায় ছিট আছে ?' কিরকম একটা অস্বস্তিকর পাগলাটে চোখে রাজু তাকায় নির্মলের দিকে। আর নির্মল ঠিক বুঝতে পারে না তার এই চেহারাটা ঠোঁটে রঙ মাখার মতো ঠাট না সত্যি কিছু।

'একসেন্‌ট্রিক্ না হলে কি বাঁচতে পারতাম নির্মল! একসেন্‌ট্রিক্ না হলে কি এত বাধা পেরিয়ে তোমার কাছে এমনভাবে ছুটে আসতে পারতাম! পাগল না হলে চোদ্দ বছরে বাপ যেমন বলেছিলেন তেমনি আমার বিয়ে হয়ে যেত!…হয়তো ভালই হোত। দিদির মতো চার-পাঁচটা ছেলে মানুষ করতাম। কিংবা ফুলু হতাম, ফুলুর বর আমার চাচার ছেলে। এখন বন্‌-এ আমাদের এম্‌ব্যাসির ফার্স্ট সেক্রেটারি…তার বউয়ের মতো হতাম। ফুলু খুব ভাল মেয়ে। ফুলুকে সবাই ভালবাসে। আর শুনেছি বিলেতে

ডিপ্লোম্যাটিক সার্ভিসে তার স্বামীর খুব সাহায্যে এসেছে। কিন্তু ফুলু যখন আসে দেশে আর ঢাকায় আমাদের বাড়ির দোতলা ঘরে আমরা বসি আর কথা বলি তখন মনে হয় ওরকম সাজানো বাগানের চেয়ে আমার নেড়া মাঠই ভাল।'

ধীরে ধীরে তার চোখের চাহনি পাল্টে তার দৃষ্টির বুদ্ধিদীপ্ত চাহনি ফিরে আসে।

'আর শাড়ীর গল্প কোরো না। আমাদের হাতে মাত্র কয়েক ঘণ্টা।'

'কোথাও যাবে নির্মল? কলকাতায় আসা অবধি বমি করেছি ঘেন্নায় অসোয়াস্তিতে। এই নোংরা হোটেলের সিঁড়িতে জমাদার দাঁড়িয়ে থাকে ঝাঁটা হাতে, তারপর এই থানায় হাজিরা।...তুমি কখনো গিয়েছ পাকিস্তানে...যেও না। এত হিউমিলিয়েটিং, মাত্র পঞ্চাশ টাকা দেয় হাতে। আজ সারাদিন টাকার ধান্দায় আমি আর দিদি ঘুরেছি...এর মাঝখানে নির্মল তোমাকে কল্পনা করি নি।...এখন গঙ্গার ধারে যাওয়া যায় না?'

নির্মল স্থির দৃষ্টিতে তাকে দেখতে থাকে। আর তার চিঠির এক-একটা লাইন ভেসে আসে তার মনে।...'অতীতের অনেক আগাছা আছে জড়িয়ে আমার সারা গায়ে। পারবে তো সহ্য করতে?'

'গঙ্গার ধার?...না না, কোথায় যাবে?'

নির্মল আসলে বলতে চাইছিল কোথায় পালাবে? সারা দেশটাই পাল্টে গেছে। গঙ্গার ধারও পাল্টে গেছে। কিন্তু এ কথাগুলো তার মুখে এল না। নির্মলের আগে কখনো এরকম মনে হয় নি যে দেশ ও কাল এমন দীর্ঘ হাত বাড়িয়ে তাদের সম্পর্কের মাঝখানে এসে দাঁড়াতে পারে। দেশ ও কালের ব্যাপারটা যেন সুব্রত কিংবা গৌতমদের ব্যাপার, রাজনীতি কিংবা সমাজনীতিতেই তা প্রযোজ্য। চিঠিতে অন্তত তাই মনে হত। চিঠিতে বার বার নির্মল রাজুকে বলেছে শক্ত হতে। তার নিজের অনুরোধ নিজের কাছে ঠিক ব্যঙ্গ না হলেও কিছুটা অর্থহীনভাবে কানে বাজতে থাকে।—'আমরা যদি পরস্পর শক্ত হয়ে পাশাপাশি দাঁড়াতে পারি তাহলে কোনো বাধাই খুব বড়ো হয়ে উঠবে না।' তখন কি ভেবেছিল রাজুকে থানায় যেতে হবে, নোংরা হোটেলে উঠতে হবে, কয়েকটা টাকার জন্যে হন্যে হয়ে পুরনো বন্ধুদের হাতড়াতে হবে। ঢাকায় গেলে তো তার একই অবস্থা হত,

রাজুর ভাষায় একই হিউমিলিয়েশান। রাজু যখন আসবে লিখেছিল তখন নির্মল ভেবেছিল তাদের প্রেমের ভুবনে দুটো লোকই থাকবে আর সব খাটো হয়ে যাবে। কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে আর-সব লোক এত মাথা উঁচিয়ে আছে ও থাকবে সেটা খেয়াল করে নি। খেয়াল করলে— নির্মল এখন ভাবে— মেয়েটাকে বোধহয় এই কষ্ট আর অসোয়াস্তির হাত থেকে রেহাই দিতে পারত।

রাজু দু-হাতে মুখ ঢেকে বসে থাকে। আর তার নীল শাড়ী-পরা হাল্কা শরীরটা দেখতে দেখতে নির্মলের এক প্রবল মমতা জাগে। কাল হোটেলে রাজুর দিদির উদ্‌বিগ্ন কথাগুলো তার মনে আসে, 'ও একেবারে আধ্‌পাগলা। আমাদের কারো মতো হয় নি। সব ব্যাপারে এমন বেপরোয়া। আমরা তো হিন্দু বাড়িতেও মিশেছি কত। ও কোনো বাড়ির মতোই না। একেবারে নিজের মতো চলবে। আমার কি ভয় জানেন, হয়তো ওর মাথাটাই একদম খারাপ হয়ে যাবে।'

নির্মলের বুক দমে গিয়েছিল। তার নিশ্চয় একটা ব্যক্তিগত স্বপ্ন ছিল রাজুকে অবলম্বন করে। সে স্বপ্ন চোট খেয়েছে বলে আহত হয়েছে। কিন্তু এখন এ কথাটা স্পষ্ট হতে থাকে, রাজুর আধ্‌পাগলা হওয়া ছাড়া উপায় নেই। চারপাশে দেয়ালের মধ্যে থেকে কেউ যদি চেঁচায় তার কণ্ঠস্বর দেয়ালেব ওপাশে পৌঁছে দেবার জন্যে তবে তা অস্বস্তিকর ঠেকতে পারে কিন্তু তা অস্বাভাবিক কেমন করে বলবে।

'আর দুটো ঘণ্টা কাটিয়ে দাও নির্মল। গানটান করো কিংবা বাজে কথা বলো। কাল সকালে ট্রেন।'

নির্মল চেয়ে থাকে প্রবল কৌতূহলে। সে যে প্রেমে ভীষণ অভিভূত হয়ে পড়েছে, এখনই খপ্‌ করে রাজুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে তার, কিংবা তার মাথাটা বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে এখনি বলবে, 'তুমি আমার, তুমি আমার'···এরকম কিন্তু ঠিক নির্মলের মনে হচ্ছিল না। অথচ এরকম ঘটার প্রতিবেশ খুবই অনুকূল। রাজুর দিদি অন্তত ঘণ্টা-দুয়েক কাঞ্জীভরমের সঙ্গে ব্লাউস্ পিস্ ঠিক ম্যাচ করল কিনা দেখবেন, তারপর পার্কসার্কাসে তাদের এক আত্মীয়ের বাড়ি নেমন্তন্ন রক্ষা করতে যাবেন। যাকে বলে একটা সঘন পরিবেশ, তার সমস্ত মালমশলা হাজির। কিন্তু নির্মলের মনে হচ্ছিল

যে এই সময়টা তার কাছে খুব দামী তার কারণ সে এই মেয়েটি সম্পর্কে তার বোধ খানিকটা যাচাই করার সুযোগ পাচ্ছে।

নির্মল চার দিক চেয়ে ছাখে। নাঃ, গঙ্গার ধার নয়, এই নোংরা হোটেল, এই নোনাধরা দেয়াল, দেয়ালে অর্ধউলঙ্গ মেয়েমানুষের ছবি, নড়বড়ে চেয়ার আর তক্তাপোষ, একপাশে পড়ে থাকা সন্ধের এঁটো চায়ের পেয়ালা পিরিচ, নীচে ধুলোয় ভরা সতরঞ্চি— এই তার প্রেমের পীঠস্থান। এইভাবে যে তারা দাঁড়িয়েছে এইটাই খুব বড়ো সত্য। চিঠির সত্যের চেয়ে তা হয়তো কর্কশ। কিন্তু এ সত্যের সৌন্দর্য তাকে স্পর্শ করুক।

প্রেমের পীঠস্থান? কথাটা নিজের কানেই খট্ করে লাগে নির্মলের। সে কি কথাটা বসিয়ে দিচ্ছে না জোর করে তার মানসিক আলস্যে? গত তিন বছর তাদের পত্রালাপের মাঝে মাঝেই সে নিজেকে প্রশ্ন করেছে— এটা কি একেবারে ছেলেমানুষী না সীরিয়াস্ কিছু? সেই প্রশ্নের সমাধানে অসমর্থ হয়ে সে প্রেম কথাটাকে আঁকড়ে ধরছে না?

প্রেম হোক আর নাই হোক— পিতপিতে আলোর নীচে একহারা নীল শাড়ীপরা মেয়েটার তেলহীন খোলা চুলের দিকে চেয়ে চেয়ে নির্মল বুঝতে পারে ব্যাপারটা তাকে প্রত্যক্ষ এক সত্যের মতো আকর্ষণ করছে। অনেক ব্যাপারই ঠিক এরকম প্রত্যক্ষ সত্য হয়ে ওঠে নি তার জীবনে।

'তোমার চিঠিতে…' নির্মল চিঠির প্রসঙ্গ তুলতে চায়। অধোয়া কাঁচের ডিশগুলো আর তেলচিটে সতরঞ্চির দিকে চেয়ে চেয়ে সে স্বর্গ-নরকের মাঝখানে সেতু বাঁধতে চায়!

'ও কথা থাক। চিঠি যখন লিখেছি তখন অনেক কথা ভাবি নি। হয়তো অনেক কথা ভাবি নি বলেই অত জোরের সঙ্গে— অত জোরের সঙ্গে তোমার কাছে আসবার সাহস পেয়েছি। তখন নিশ্চয় ভাবি নি একগুচ্ছের সময় থানায় কাটাতে হবে একটা নড়বড়ে কাঠের টুলের ওপর বসে। আর বর্ডার চেক্ পোস্টে মানুষের কি নাজেহাল!'

রাজু একরাশ তেলহীন চুলের নীচে তার মস্ত বড়ো চোখ দুটো আর তীক্ষ্ণ চিবুক তুলে নির্মলের দিকে চেয়ে থাকে খানিকক্ষণ। 'আরো কত কি দেখলাম। তোমার কাছে আসতে গিয়ে আমার প্রাণের ভেতরটা যে এমন ভাবে শুকিয়ে যাবে ভাবি নি। আগে ভেবেছিলাম আমার খুব জোর।

কিন্তু এখন সব জোর আলগা হয়ে গেছে।...তুমি তো বেশ সেজেগুজে আসছ আমার সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু তুমি ভাবতে পারবে না কি পাহাড়প্রমাণ বাধা ঠেলে আমি তোমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁফাচ্ছি। ভাবছি ফিরে যাই।'

'আমিও তোমার এই গ্লানি ভাগ করে নেব।'

'প্লিজ্! গল্পের মতো কথা বোলো না। এ কথাগুলো শুনতে বেশ ভাল লাগে। কিন্তু কি জানো— গত কয়েকদিন খালি শুনেছি তোমাদের কথা আর বাজে বকেছি— খালি মনে হচ্ছিল আমি তোমার চেয়ে আরো বুড়িয়ে গেছি। ...তুমি হাসছো। কিন্তু গত কয়েক বছরে চারপাশে এত দেখেছি, যে-সব জিনিস ভাবতাম সবচেয়ে দামী তা হঠাৎ খেলা হয়ে গেছে। এই কলকাতাটা ছাখো— ছেলেবেলার স্বপ্ন। এখানে এসে কলেজে পড়ব। তারপর এক ঝাপটে দেশভাগ। আমরা খড়কুটোর মতো কে কোথায় ছড়িয়ে পড়লাম।...দর্শনা চেক্ পোস্টে আমাদের এক সহযাত্রী এক হিন্দু ভদ্রলোকের পাসপোর্ট-ভিসা নিয়ে কি নাজেহাল! এক প্যাকেট সিগারেট, পান, তারপর পাঁচ টাকার বায়না ধরলে, আমি খুব বকুনি দিলাম। তাতে কাস্টম্‌সের সেই লোকটা থতমত খেয়ে পাসপোর্ট দেখতে চাইলে। আমার পাকিস্তানী কাগজপত্তর দেখে লোকটার কপালে চোখ উঠল। বোধহয় এরকম প্রতিবাদ বেশী সে ছাখে নি। দিদি খুব বকলেন আমায়।'

নির্মল তার হাতটা মুঠি করে বললে, 'এইটাই তো আমাদের কাছে চ্যালেঞ্জ রাজু। আমরা এই চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড়াতে পারব না?'

রাজু হেসে উঠল। মুহূর্তের জন্যে তার চোখে সেই পাগলাটে আলো খেলে যায়। 'রাগ কোরো না। একটা কথা বলব...ছেলেবেলায় আমাদের পাড়ায় একটা প্লে হত, ললিতাদিত্য। ভারী জমকালো পার্ট। আমার যে কি ভাল লাগত! তাতে যুদ্ধক্ষেত্রে ললিতাদিত্যের সঙ্গে রাণীর সাক্ষাৎটা আমার মনে আসছে। বলব?'

সেই সকৌতুক মুখখানার দিকে চেয়ে নির্মল একটু দমে যায়। হাসবার চেষ্টা করে বলে, 'বলো।'

রাজু তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে। তারপর দু-হাত বাড়িয়ে আবৃত্তি করে, 'অস্ত্রের ঝনৎকারে মিলনের মঙ্গলবাদ্য বেজে উঠুক, মৃতের আর্তনাদে মিলন-

শঙ্খ ধ্বনিত হোক। আর আমরা এ দুজনা এ শবের স্তূপের মাঝে আমাদের সাধের বাসর রচনা করি।' সাধের বাসর রচনার কথাটায় এমন টান দেয় রাজু যে দু-জনেই হেসে ওঠে সশব্দে। হাসতে হাসতে রাজু বললে, 'তোমার কথা নির্মল আমার সেই ছেলেবেলার ভালবাসার ললিতাদিত্যের মতো লাগছে।'

নির্মল গম্ভীরভাবে বললে, 'মেলোড্রামাতে আমার আপত্তি নেই রাজু যদি সেই মেলোড্রামা সত্যি হয়।...আমি অনেক চালাক লোক দেখেছি। চালাক লোক হলে তুমি যে তোমার দু-হাত বাড়িয়েছিলে আমার দিকে, সেদিকে তাকাতাম না। বলতাম, সেন্টিমেন্টাল কিংবা আরো জুৎসুইভাবে বলতাম, নিউরোটিক। কিন্তু আমি তোমাকে সত্যিই তারিফ করছি মনে মনে, এই বেড়া ডিঙ্গানোর জন্যে।'

তারপর নির্মল উচ্ছ্বসিত হয়ে বলতে থাকে, 'তোমার সঙ্গে কথা বলতে আজ বড্ড ভাল লাগছে রাজু।·· অনেকদিন পর মনে হচ্ছে আমি কথা দিয়ে সত্যিই কোনো প্রয়োজনীয় বস্তুকে ধরতে চাইছি। বেশীর ভাগ কথাই তো হরলিক্সের বিজ্ঞাপন। তোমার রাজু মনে হয় না, তোমাব বাবা-কিংবা ধরো আমার জ্যাঠা— মানে যারা সাক্‌সেস্‌ফুল লোক— যাদের নামডাক হয়েছে, যাদের কথা রোজ কাগজে ফলাও কবে বেবোয় তারা সবাই আসলে কথার মানে মেরে ফেলছে। যেমন ধবো জ্যাঠামণিব মন্ত্র আমাদেব স্ট্যাণ্ডার্ড অফ লিভিং বাড়াতে হবে।...

'কিংবা বাবাব ইসলামী গণতন্ত্র,' বাজু উৎসাহে যোগ দেয়।

'এইসব কথার জালে তারা সুন্দবভাবে নিজেদের সাজায় আব অন্যদেব ভোলায়। তোমার মনে হয় না এই হিন্দুস্থান পাকিস্তানে শুধু কতগুলো প্রাণহীন স্লোগান দিয়ে মানুষগুলোকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হযেছে? আব হিন্দুস্থান পকিস্তান কেন অনেক জায়গাতেই...'

'আর কথা নয়।' রাজু সজল চোখে তাকায় নির্মলেব দিকে। 'আমার পাশে বোসো।'

আর নির্মল এই আহ্বানের অপেক্ষায় ছিল। নির্মল আর রাজু পাশাপাশি বসে থাকে চিত্রার্পিতভাবে। তাদের চোখ দু-জনের দিকে নেই, বরঞ্চ নিজেদেরকেই যেন দেখতে থাকে পাশাপাশি বসে। কিংবা পাশে

বসা লোকটির চোখ দিয়ে নিজেকে দেখতে থাকে। এভাবে কটা মুহূর্ত কেটে যায়। আর নির্মল অনেক পরেও ভেবেছিল এই উজ্জ্বল মুহূর্তগুলোর কথা যেন তারা সারা জীবনের চিত্রকল্প হয়ে থেকে যাবে।

একবারও তার মনে হয় নি যে গভীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়, বরং ভেবেছিল এইভাবে পরস্পরের গভীর সান্নিধ্যে থেকেও পরস্পরের ভাবনার স্বাতন্ত্র্য রাখা, নিজেকে অবলুপ্ত না করেও নিজেকে দান— এই অভিজ্ঞতা কি অনেক দামী নয়?

কতক্ষণ তারা এভাবে বসেছিল খেয়াল নেই হঠাৎ পাতলা পার্টিশানের ওপাশ থেকে নারীকণ্ঠের তীক্ষ্ণ সহাস্য চীৎকারে তারা প্রায় ঘুম থেকে জেগে উঠল। 'না-না-না-না-না, অমন করে না, অমন করে না।' সেই চপল নারীকণ্ঠের ইঙ্গিৎ তাদের কানে পৌঁছয় না। তারপর পার্টিশানের ওপার থেকে দুটি নরনারীর সংগমবাসনা চরিতার্থতার জন্যে যে-সব অনুযোগ-আদর-ভর্ৎসনার স্বর ভেসে আসে তাদের কোনোটাই তাদের কানে যায় না। তারা দু-জন ঠিক মন্দিরের গাত্রে খোদিত দুই পাশাপাশি কিন্নর-কিন্নরীর মতোই চিত্রার্পিত। চিত্রার্পিত নিজেদের অন্তরের সৌন্দর্যে। চারপাশের দুরপনেয় অসৌন্দর্যের চাপ থেকে নিজেদের সরিয়ে তারা এখন প্রবেশ করেছে এমন এক জায়গায় যেখান থেকে কেউ তাদের নড়াতে পারবে না।

পনেরো পাওয়ারের হলুদ আলোয় সেই নীল শাড়ী আর হলুদ পাঞ্জাবী-পরা দুই মূর্তি সেই মুহূর্তে সমগ্র ভারতবর্ষ পাকিস্তান উপমহাদেশের পাপের প্রায়শ্চিত্ত। এই চারপাশের অবিশ্বাস সন্দেহ আর আগ্নেয় ঘৃণার মধ্যে এক রাতজাগা যাত্রার জমজমাট পরিবেশে তারা এক বহুপুরনো নাটকের নতুন নায়ক-নায়িকা। পাশেই চোখ ফিরলে বুঝি দেখা যাবে অসংখ্য শবের স্তূপ, লক্ষ লক্ষ দগ্ধ গৃহের ছাই উড়ছে হাওয়ায়।

অনেকক্ষণ পর নির্মল আস্তে আস্তে বলে, 'ব্লেকের কবিতা সেদিন গলা ফাটিয়ে ক্লাসে বোঝাবার চেষ্টা করছিলাম। এখন কবিতাটার মানে আরো পরিষ্কার।'

তারপর সে কবিতার প্রথম লাইন, 'O Rose, thou art sick…' আবৃত্তি করতেই রাজু চেঁচিয়ে উঠল, 'চুপ করো, চুপ করো। কবিতা আবৃত্তি কোরো না। গান কোরো না। আমাকে বুঝতে দাও, কবিতার

ব্যাখ্যা দিয়ে কি সব সত্যকে ধরা যায়? মানুষ নিজেই নিজের ব্যাখ্যা।... তাছাড়া আমি সিক্ নই, সিক্ ছিলাম। খানিকটা সত্যি খানিকটা মিথ্যে শত্রু চারপাশে ঠাউরে নিজেকে সব সময় ক্ষতবিক্ষত করেছি মানসিক দ্বন্দ্বে।...ব্লেকের কবিতা আমি পড়ি নি। কিন্তু এটা আমি বুঝতে পারছি প্রেমের রোগের কথা বলছ তুমি। আমার অবস্থাটা ঠিক উল্টো। এই প্রথম মনে হচ্ছে সুস্থ হয়ে উঠছি।'

পার্টিশানের ওদিকে বাথরুম থেকে চেন্ টানাব শব্দ আর হুড়মুড় করে জলের আওয়াজ আসে। তোয়ালে দিয়ে বোধহয় কোনো পুরুষমানুষের গা-হাত-পা মোছার সঙ্গে সঙ্গে 'আঃ আঃ' শব্দ। অকস্মাৎ নৈঃশব্দ্য, তারপর নিম্নস্বরে কথোপকথন, পুরুষালী গলায় ধমক। হঠাৎ মেয়েটির আদুরী গলা বেজে ওঠে, 'চ্যাটার্জীকে আমার কথা বোলো গো।' কিন্তু পার্টিশানের এদিকে রাজু কিংবা নির্মলের কানে সেই জঘনচপলার কণ্ঠ পৌঁছয় না। নির্মল ভাবছিল একেবারে একটা বায়বীয় ব্যাপার যার কোনো ভিত্তি নেই, যা কেবল বর্ডার চেকপোস্ট, অসংখ্য সন্দেহ, অপরিসীম দ্বিধা ডিঙ্গিয়ে ডিঙ্গিয়ে আসার পক্ষে একেবারেই অপারগ তা এখন শক্তিমান হয়ে সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এ প্রায় কবিতার মতো অযৌক্তিক। গৌতম সেনের ভাষায় বোধহয় সেন্টিমেণ্টাল নন্‌সেন্স্। এর লক্ষ্য কি সে জানে না। নির্মলের মনে মনে চিঠি আদান-প্রদানের ভেতরে ভেতরে সম্প্রতি রাজুকে অবলম্বন করে যে আটপৌরে স্বপ্ন গড়ে উঠেছে সে স্বপ্নের বোধহয় কোনো ভিত নেই। এ স্বপ্নের কথা বলতে গেলে রাজু হাসবে, ললিতাদিত্য বলে ঠাট্টা করবে। কিন্তু এইভাবে বেড়া ডিঙ্গিয়ে ডিঙ্গিয়ে রাজু যদি আসে এবং তার মনে এইরকম উত্তাপ সৃষ্টি করে তাহলে সেটাই কি কম লাভ?

নির্মল ঠিক বুঝতে পারে না এইটাই তার মনের কথা কিনা। পরে ভেবে দেখেছিল, এটা তার মনের কথা নয়। বরং তার মানসিক আবেগের সে একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্ন বা নক্‌শা চায়। সে জানতে চায় সে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে। সেই কথাটাই তার মুখ দিয়ে ফস্ করে বেরিয়ে পড়ে, 'আমি জানতে চাই আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি,' গলা খাঁকারি দিয়ে নির্মল বলে।

রাজু হঠাৎ ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসে। নিজের অজান্তেই চোখ

রগড়ায়। এতক্ষণ যে নৌকোয় সে বিস্তৃত নীল জলে পাল তুলে বেড়াচ্ছিল তা হঠাৎ চড়ায় আটকে গেল। তার চোখের সেই সজল দীঘল দৃষ্টি হারিয়ে গিয়ে আবার সেখানে পাগ্‌লাটে তীক্ষ্ণ আলো খেলতে থাকে। তার ছোটো সুগঠিত মাথার সঙ্গে তার মুখের হাঁখানা একটু বিসদৃশভাবে বড়ো মনে হয়।

'তুমি জানতে চাও? আমি চাই না,' রাজু বললে।

নির্মল বুঝতে পারে তার চালে ভুল হয়েছে। কিন্তু সে তো কথা সাজিয়ে এখানে আলাপ করতে আসে নি। সে যে এতক্ষণ মাঠের হাওয়ার মধ্যে বসে আছে তার তো একমাত্র কারণ তারা কথা সাজিয়ে পরস্পরকে ভোলায় নি। এতে যদি তাদের পরিবেশের মন্ত্র কেটে যায় তবু নির্মল এ-কথা বলবে। সে পারবে না বছরের পর বছর এই বায়বীয় উপস্থিতির চাপ বুকে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে। আর তাছাড়া তাদের মধ্যে বাধাটা কিসের? ধর্মীয়? সে তো তারা দুজনেই বিশ্বাস করে না। দুজনেই তো বিশ্বাস করে, যে প্রাথমিক বোধে তাদের আস্থা তার জানালা সমস্ত দেশকালে উন্মুক্ত।

নির্মল অধীর হয়ে বললে, 'সত্যি আমি জানতে চাই আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি। এটা কি আমাদের মানসিক বিলাস না আরো কিছু। শক্ত স্থায়ী কোনো দৃঢ় ভিত্তিতে একে দাঁড় করানো যায় না?'

রাজু তার পাগলাটে দৃষ্টি দিয়ে নির্মলের দিকে তাকায়। বলে, 'তুমি নাকি কথার বাহারে বড্ড ভয় পাও? আমাদের আত্মীয় বন্ধুবান্ধব, রাজনৈতিক দলের লোকেরা কেমন কথার সাজানো বাগান তৈরী করছে একটু আগে বললে না। আর তুমিই বলছ, শক্ত স্থায়ী দৃঢ় ভিত্তি...এগুলো সাজানো বাগান নয়? না না নির্মল, কোনো কথা বোলো না। আর সামান্য সময় আছে। দিদিদের নিশ্চয় পার্ক সার্কাসে খানাপিনা শেষ। এখনই খোকাবাবু আসবে। এখনই চিংড়ি মাছের মালাইকারী, কাঞ্জীভরম শুরু হবে। প্লিজ নির্মল, এসো আমরা যেমন বসেছিলাম তেমনি বসে থাকি।'

রাজু এবার আলগোছে নির্মলের গায়ে হেলান দেয়। তারপর আস্তে আস্তে বলে, 'দৃঢ়শক্ত ভিত—আমি যদি তোমার মতো দৃঢ়শক্ত হতাম তাহলে নিশ্চয় বলতাম, আর পাকিস্তানেই ফিরে যাব না। কিন্তু আমি তা বলছি

না। আমার পক্ষে সেটা বলা আর-একটা সাজানো বাগান নির্মল, তাই না? তাছাড়া, আমি ঠিক জানি না, তোমার শক্তি কতখানি। আমার সম্পূর্ণ ভার তোমার ঘাড়ে তুলে দিতে আমার আত্মসম্মানে লাগবে। অত তাড়া কেন নির্মল? আমাদের জীবন তো সামনে পড়ে আছে!'

আবার তারা চুপ করে বসে। আর সেই নোংরা সতরঞ্চি বেছানো মেঝের ওপর গায়ে-ফোটা নড়বড়ে তক্তপোষে তাদের সেই চুপ করে পাশাপাশি নিজের মনে বসে থাকা দেখায় গভীর তাৎপর্যপূর্ণ— তারা সত্যি এক আশ্চর্য সজীব মোলোড্রামা, সেই ছেলেবেলার ভাল-লাগা ললিতাদিত্য নাটক। অথবা বলা যেতে পারে তারা বাংলা দেশের পাপের প্রায়শ্চিত্ত। সেই তদ্গত পরিবেশে তারা দুজনেই তাদের দেশ ও কালের প্রকাণ্ড বৈপরীত্য মুহূর্তের জন্যেও বিস্মৃত হয় নি। অথচ তারা ঘুরে বেড়িয়েছে সেই কালহীন নীলাভ চিদাম্বরে যেখানে সমস্ত অনৈক্য সুসংহত। গঙ্গার ধারে এমনটি ঠিক হত না। গঙ্গার ধারে তারা হত কেবল প্রেমিক যুগল। কিন্তু তাদের এই পরস্পর তদ্গত অথচ সম্পূর্ণ পৃথক স্বতন্ত্র ভঙ্গীতে বসার ভেতরে তারা যেন এই দ্বিখণ্ডিত বাংলা দেশের অস্তিত্বই ঘোষণা করছে মৌনে। একবারও তারা দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয় নি কিংবা চুম্বনে অধীর হয় নি। কারণ আলিঙ্গন এক্ষেত্রে অবাস্তব, চুম্বন অধৈর্যের স্বাক্ষর। তারা যেন এই-ভাবে চারপাশের নোংরা পরিবেশের মাঝখানে যুগের পর যুগ অপেক্ষা করবে তাদের মিলনলগ্নের অপেক্ষায়। তার আগে সবই কথা সাজানো প্রতিশ্রুতি। এ বুঝি সমস্ত বাংলাদেশেরই প্রতীক্ষা। বছরের পর বছর দেশের দুভাগে খুনোখুনি হবে। সংখ্যালঘু মানুষদের ঘড় অন্ধকারে শূন্যে চীৎকার করে দৌড়বে, তাদের বাড়ির ছাই উড়বে হাওয়ায় আর এরই মাঝখানে এই দুই বাংলাদেশ তাদের 'সাধের বাসর' রচনা করবার স্বপ্ন দেখবে পাশাপাশি বসে।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। 'বুঝতে পারছ নির্মল আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি?' রাজু নির্মলের হাতখানা ধরে জিজ্ঞাসা করে।

'বুঝতে পারছি।' নির্মল রাজুর হাতে মৃদু চাপ দেয়।

পার্ক স্ট্রীট

সুবোধ ডাক্তার নিতছেন। বাগজোলা ক্যাম্প থেকে ফেরার পর প্রায় পাঁচ মাস শেষ হতে চলেছে। বাইর থেকে যে খুব বেশী পরিবর্তন হয়েছে তা ঠাওর করা যায় না। নির্মল তো অনেক সময় বুঝতেই পারে না। কোনো কোনো দিন ভাবেও যে আরো চার-পাঁচটা বছর তার বাবা সকালে থলি হাতে বাজারে বেরোবেন, বিকেলে ডিস্‌পেন্সারীতে বসবেন। কিন্তু একটু লক্ষ করলেই তাঁর চোখের দুপাশে গভীর কালো ছাপ, কর্কশ শুকনো মুখ, আর তার মাঝখানে বড়ো বড়ো চোখে থেকে থেকে স্থির দৃষ্টি নজর এড়ায় না।

আর এই কয়েকমাসে বাপ ছেলের মধ্যে বন্ধনটা যেন আগের চেয়ে দৃঢ় হয়েছে। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে যেমন বিদায়ী অতিথির সঙ্গে আলাপ আরো জমে তেমনি হার্টের রুগী হবার পর নির্মলের সঙ্গে তার বাপের যোগাযোগ বেড়েছে। নির্মল অবশ্য তার বাপের ক্ষোভ এবং হতাশা প্রশ্রয় দেয় না। দেশ ভাগ নিয়ে কথা উঠলে নির্মল বারবার বলে, তা যখন দুটো দেশ হয়েই গেছে তখন তা নিয়ে মাথা চাপড়ে কি লাভ? আগে যেমন হত সেরকম নিজে আর উত্তেজিত হয় না।

কলেজ করে আড্ডা দিয়ে সন্ধের পর ফিরলে সুবোধ ডাক্তার ছেলেকে জিজ্ঞেস করেন তাঁর ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে, 'কি রে, কি ভাবছিস?'

'ভাবছি এই পয়সার টানাটানি', নির্মল লাইব্রেরি থেকে আনা ফিল্মের ওপর একখানা বইয়ের পাতা উল্টাতে উল্টাতে বলে। সম্প্রতি শহরের সংস্কৃতিসেবীদের মধ্যে বইখানা মার মার করে পড়া হচ্ছে।

'টুইশানি করবি? কোচিং ক্লাস? প্রণব বোসের সঙ্গে স্কুলে পড়তাম। টিউটোরিয়াল হোম খুলেছে। একেবারে গ্যারান্টি। যা পরীক্ষায় আসবে তার তিন ভাগ কোয়েশ্চান ছেলেদের মুখস্থ করিয়ে দেবে।'

'ওর মধ্যে আর যাচ্ছি না বাবা,' নির্মল হেসে বললে।

সুবোধ ডাক্তার উদ্‌বিগ্নভাবে বললেন, 'তোর জ্যাঠামণি তোকে কিছু আবার বলে নি তো?'

'না না, জ্যাঠামণি কিছু বলে নি। আর বললেই দোষ কি! আমার তো তোমার মতো কোনো আদর্শ নেই। পলিটিক্সও বুঝি না। আমি সাধারণ লোক।'

'মানে ওপরচুনিস্ট।'

'ঐ সব শব্দগুলোর মানে আমি বুঝি না। ওগুলো সুব্রতকে বোলো, বুঝবে।'

'কারণ সুব্রতর প্রিন্সিপ্‌ল আছে তোর নেই।'

'হয়তো তাই।' নির্মল অন্যমনস্ক ভাবে বলে।

এরপর তর্ক চলে না। সুবোধ ডাক্তার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, 'যাক, এরকম কিছু ছেলে এখনো আছে। দেশটা একেবারে মরে নি।' তারপর তাঁর ভাইপোর সম্পর্কে কৌতূহল প্রকাশ করেন, 'সুব্রত কি কোথায় গ্রামে গিয়েছিল?'

'হ্যাঁ, বাঁকুড়ায়। বেশ ছিল কয়েকদিন। গ্রাম থেকে ফিরে আবার সেই। তক্কাতক্কি—অপচুর্নিস্ট, রিভিশানিস্ট, বিফরমিস্ট।'

'তর্ক তো হবেই। তাব মানে সে চিন্তা করছে।'

'জানি না, আমার মনে হয় আমরা সবাই কথার জালে জড়িয়ে পড়ছি। তুমি, জ্যাঠামণি, সুব্রত, আমাদের কলেজেব পাণ্ডা গৌতম, সবাই।'

'শুধু তুই এব থেকে আলাদা, না? তুই বেশ এদের থেকে আলাদা হয়ে মোড়লি করছিস!'

'হয়তো তাই,' নির্মল ম্লানভাবে হাসে। তারপর হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলতে থাকে, 'কথা কথা কথা। এই বিপ্লব, ভালবাসা, দেশ, কাল, কমিউনিজম, যা বলো, সব কথার তোড়ে ভেসে চলেছে।'

সুবোধ ডাক্তার ছেলেব উত্তেজনায় হেসে ফেলেন। এই উত্তেজনাটা মন্দ লাগে না তাঁর। মাথা নেড়ে বলেন, 'আমি যা শুনেছি, সবটা কথা নয় রে!'

'তা হবে'।···নির্মলের হঠাৎ চোখ পড়ে তার বাবার রাতজাগা চোখ দুটোর ওপর। বলে, 'তোমার খিদেটা এ বেলা একটু হয়েছে? এক কাপ হরলিক্স খাবে?'

'না না, ওসব খাওয়া থাক। কথা বল, কথা বল। কথা হল এক-একটা হাতিয়ার।'

'সুব্রত, গৌতমও তাই বলে।' তারপর একটু হেসে বললে, 'কিন্তু এত রকম কথার হাতিয়ার বেরিয়েছে যে যুদ্ধে কেউ কারো সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছে না। কাটাকাটি হয়ে যায় শূন্যে। শেষপর্যন্ত সবাই হেরে যায়।'

॥ দুই ॥

যতই দিন যাচ্ছে ততই নির্মলের মনে হচ্ছে, আর যা-সব তা ফাঁকা আওয়াজ, সত্য কেবল জ্যাঠামণির প্রস্তাব। সর্ব ধর্ম পরিত্যাগ করে সেই এক লক্ষ্যে শরণ নেবার জন্যে তার চারপাশের ঘটনা তৈরী হচ্ছে আর সে যেন ভেতরে ভেতরে জানে এই প্রস্তাবে রাজী হয়ে যাবে, কেবল নিজের দাম বাড়াবার জন্যে একটু দেরী করছে।

বাস্তবিক কলেজে ইংরেজী সাহিত্য মন দিয়ে পড়ানো ক্রমশই কেবল এক রূপকথার রাজত্বে ঘোরাফেরার মতো ঠেকছে। এ রূপকথার ফাঁকি কোনো রকমে ঢাকা পড়ছে তাঁদের কাছে যাঁরা সাহিত্যচর্চার নামে একবার বিলেত আমেরিকা ঘুরে আসছেন। এক ফিরিঙ্গি আবহাওয়ায় একাত্মতা বোধ করছেন, কিংবা আর-একটু নিচু স্তরে থিসিস হাঁকিয়ে বা কোচিং ক্লাস খুলে ইংরেজী সাহিত্য একটা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছেন। কিন্তু সাহিত্য যে কথা বলে, ধ্যান করে, রোজকার ভাতডাল খেয়ে বোঝা এবং বোঝানোর ব্যাপার এই বোধের তাগিদ প্রায় অনুপস্থিত থাকায় সংঘবদ্ধ সাহিত্যপাঠ কিংবা চর্চা আসলে সাহিত্য থেকে মানুষের মন অনেক দূরে সরিয়ে দেওয়ার নামান্তর। এলিয়ট রীচার্ডস ইত্যাদি পড়ে কিংবা পড়িয়ে মস্তিষ্কের স্নায়ু-গুলো শক্তিশালী করার চেষ্টা মন্দ না, কিন্তু তারপর? একটা শক্তিশালী যন্ত্র হাতে তুলে দিয়ে কি লাভ যদি তা কুলুপ-আঁটা থাকে?

নির্মল অনেকবার ভেবেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চর্চা করলে সাহিত্য পাঠ ও চর্চার এই সৌখীন দিকটা কাটানো যায় কি না। কিন্তু এ বিষয়ে সে মন-স্থির করে উঠতে পারে নি। প্রথমত রবীন্দ্রনাথকে ঋষি-ফিষি বলে এমন এক কেচ্ছার অবস্থা যে তাঁকে আপনার ভাবতে অসুবিধা হয় পাঠকের। তা ছাড়া দেশ স্বাধীন হবার কিছুকাল আগে থেকে আজ পর্যন্ত দেশের চেহারাটা এমন পাল্টে গেছে যে নির্মলের মনে হয় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য

কিংবা মেজাজের ছায়াপথ বাংলাদেশের সাহিত্যে কিংবা মেজাজে আর প্রতিভাত নয়। তিনি যেন বিদ্যাসাগরের মতো এক কিংবা একলাই একটা উপাখ্যান। তাঁকে নিয়ে সভা করা যায় কিন্তু ক্লান্তি কিংবা নৈরাশ্যের অন্ধকার থেকে মুখ ফেরাতে তিনি আর সাহায্য করেন না। কয়েকটা গান মন্দ লাগে না এই পর্যন্ত। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের লেখা যেন তার জ্যাঠামণির অ্যাসেমব্লী ভাষণের মতো, গৌতমের সামাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মতো, অথবা তার বাবার হতাশা আর উদ্দীপনার তাড়নায় বক্তৃতার মতো শব্দের সম্ভার। আর শব্দগুলোর পেছনে মেরুদণ্ডটা কোথায় হারিয়ে গেছে তাই বিরাট শব্দের চেহারাটা প্রকাণ্ড একতাল মাংসের মতো থলথলে কাদা, তাকে চাপড়ে চাপড়ে যেরকম অবয়ব দেবে সেই অবয়বে ঢালা যায়। এই শব্দের অত্যাচার থেকে বিশুদ্ধ সত্তার গর্বে দূরে দাঁড়িয়ে না থেকে সকলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এই বিরাট মাংসের তাল চাপড়ালে কিরকম হয়? তখন তো আর শব্দকে পুনরুজ্জীবিত করার ব্রত মনের পেছনে থাকবে না, কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা এই পুরনো প্রশ্নের চাপ থাকবে না। এই নঞর্থক দ্রষ্টার বদলে গৌতমের ভাষায় সেও জীবনের শরিক হবে। সেও ভিড়ে যাবে সকলের সঙ্গে প্রাণপণে এই মেরুদণ্ডহীন শব্দের দুনিয়াজোড়া দেহখানা চাপড়ে চাপড়ে আরো ফাঁপানো ফোলানোর জন্যে।

নির্মল গত পাঁচ-ছ' মাসে কলেজে বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে শুরু করেছে। সাহিত্য বোঝাব এই ধরনের ডন কুইক্সোটি বাসনা ত্যাগ করায় আজকাল তর তর করে সে পড়িয়ে যায়। এমনকি গৌতমেরও সে প্রিয়পাত্র হয়ে পড়েছে, প্রিন্সিপাল একটু বেশী স্নেহ করছেন, ছাত্রেরা কেউ কেউ বাড়িতে আসতে স্থরু করেছে, এবং তার মধ্যে আবার কেউ খপ করে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে ফেলছে। ডক্টরেট হয়ে সদ্য প্রতিষ্ঠিত কোনো একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'রীডার' হওয়া যায় কি না এ ধরণের ইচ্ছাও তার মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারছে।

আর রীডারই যদি লক্ষ্য তাহলে জ্যাঠামণির প্রস্তবমশো পাবলিসিটি ফার্মে নয় কেন? দ্বিতীয়টাতে আরো অনেক বেশী পয়সা। এ ব্যাপারে নির্মলের মস্তিষ্ক কাজ করে স্বাধীনতাপরবর্তী মুনাফাস্ফীত ভারতীয় ব্যবসায়ীর মস্তিষ্কের মতো— কোনটাতে টাকা ঢালব— খবরের কাগজ না সিমেণ্ট কারখানা?

॥ তিন ॥

ঢাকা

নির্মল,

কারো মনের ওপর হাত দেওয়া যায় না— এখন এ কথা লিখছ কেন? একটু বুঝিয়ে দিও।

তোমাকে আমার দেখতে ইচ্ছে করে কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা হোক তা আমি চাইনে কারণ দেখে মন ভরে এমন কিছুই আর আমার মধ্যে নেই। আমাকে একটুও বুঝতে পারলে না। দেখ না যে আমার নিজের কোনো ঢং নেই, কোনো ভঙ্গী নেই। আমি ইমোশানের দাস, এহেন অবস্থায় আমাকে ভাল লাগে না এটা তো সব সময় খুব স্পষ্ট ছিল তোমার চিঠিতে, কথায়। আমিই বরং নিজেকে এই বলে ঠকিয়েছি যে তুমি বিদ্রূপ করতে ভালবাসো।

আশ্চর্য, প্রিয়জনের সঙ্গে কথা বললে আমার ক্ষেত্রে ইংরেজী এসে পড়বেই। বলতে পারো এটা breeding-এর দোষ। আমি কিন্তু নাচার। এদেশে থেকে ইংরেজীর কোনো উন্নতি না হোক বাংলাটা দিন দিন গোল্লায় যাচ্ছে। একেবারে পুরোদস্তুর hybrid হয়ে গেলাম। কলকাতায় গিয়ে 'জল' বলতে আপত্তি করি, এখানে 'আল্লা' বলতে মুখে বাধে। আর দেশভাগের পরে দেশহারা ভাবটা আরো তীব্র হয়। ভেতরটা কেবল খচ্‌খচায় where do I belong? কোথায়? আজও তার মীমাংসা হল না।

একটা জলজলে sentence এতক্ষণ চোখেই পড়ে নি। তুমি জানতে চাও কোথায় দাঁড়িয়ে আছ। দূর থেকে নিজের মনোভাবের কথা বলেছি, কাছে থেকে দেখলে, তারপরও লিখলাম— এখন একটা বারোয়ারী sentence-এ আমি এই স্পষ্ট প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর দেব কি করে। বেশ বুঝতে পারছি আমার

কাণ্ড থেকে তোমার বিদ্রূপের প্রতি আকর্ষণ আরো বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু তোমার বিদ্রূপ বাড়ানো ছাড়া উপায়ান্তর দেখছিনে।

হয়তো তোমার মনে হচ্ছে আমার তোমাকে এ ধরনের ছাড়া ছাড়া চিঠি লেখার কোনো মানে হয় না। তবে শুধু বিশেষ ধরনের ভালবাসার ভিত্তিতে আমাদের চিঠি লেখা সুরু হয় নি। আমার দিক থেকে যদি সেই বিশেষ ধরনের ভালবাসার ধারা আরো শুকিয়ে আসে তাতে চিঠি লেখা বন্ধ করবার দরকার হয়েছে বলে আমি ভাবি নি।

আশ্চর্য, গত এক বছরে যা কিছু হয়েছে কেন যেন মনে হয় সব আমার একার লাভ, আমার একার ক্ষতি। তুমি যে-কদিনের জন্যে আমাকে জীবনের শিখরে তুলে এনেছিলে তাও, তারপর আমার প্রাণমন যে শুকিয়ে গেল তাও। মনে হয় সব আমার একার। তুমি সব সময় এমন একটা নৈর্ব্যক্তিক সুর বজায় রেখেছিলে, কিংবা আমি crude যে তোমার প্রকাশের ক্ষীণ ধারাকে সবসময় চোখে চোখে রাখতে পারি নি। নিজের আবেগে নিজেকে সেঁকেছি, পুড়িয়েছি।

আগেও তো কম খেয়েছি, সাত-আট রাত অন্তর ঘুমিয়েছি। কিন্তু এমন হয় নি। হয়তো এবার পুরোপুরি পাগলামি আমাকে পেয়ে বসবে, নির্মল, তুমি তখন সকলকে বোলো, আমি সব সময় এমন ছিলাম না। কিন্তু তুমি কি পারবে বলতে? তুমি তো আমাকে স্বাভাবিক ভাবে হাসতে দেখো নি। তুমি যখন আমার সাহচর্য চেয়েছিলে তখন মনে হযেছিল মাটিতে আমার একটা স্থান হল। সেটা হারিয়ে গেল কেন এমন করে? কেমন উৎসাহে ভরে গিয়েছিল মনপ্রাণ। নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দে তোমার শক্তমুঠির দৃঢ়তার আভাস পেতাম। আসলে ভুল হয়েছিল। আমি essentially পূর্ববঙ্গীয় emotion-এর দাস, তুমি composure-এর। এই ব্যাখ্যার যদি কিছুর নিষ্পত্তি হত! আর আমি নিষ্পত্তি চাইওনে। দরকার হলে তুমি তার ব্যবস্থা কোরো, আমাকে সহযোগিতা করতে হবে।

আমি তোমাকে disgust-এর drug খাওয়াচ্ছি একটু একটু করে, এতে আমার উল্লাস নেই। I can't help my nature, অথচ আমি খুব ভাল করে জানি তোমার চিঠিতে তোমার চারপাশের লোকজন সম্পর্কে যেরকম বিদ্রূপ করে লেখো, আমাকেও মনে মনে তেমনি একটা টাইপ চরিত্রে দাঁড় করাচ্ছ, হাসছ, করুণা করছ ভগবানের মতো। And to be sure, I hate God for this veiy reason.

॥ চার ॥

রোজ শেষ রাত্তিরে ঘাম দিয়ে ঘুম ভাঙে সুবোধ ডাক্তারের। শেষ রাত্তির মানে তিনটে। কোনোদিন তিনটে, কোনোদিন তিনটে-দশ—একেবারে ঠিক বাঁধা নিয়ম। মাথার ওপরে সবচেয়ে উঁচু কাঠিতে ফ্যান্ ঘুরছে আর নীচে তিনি কুলকুল করে ঘামছেন। টেম্পারেচার নামছে, বোধহয় ছিয়ানব্বই। রাস্তার আলোয় ঘরের ভেতওটা ফর্সা লাগে, পাশে শোয়া প্রমদার চুলের গুছি ওড়ে ফ্যানের হাওয়ায়। এই কি তাঁর পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার পরিবেশ? সুবোধ ডাক্তার এ প্রশ্নটা নিজের মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করেন।

ঠিক আর একটু পরেই গঙ্গা থেকে জাহাজ ভেঁা দেয় আর কতগুলো চকিত কাক একসঙ্গে কা-কা করে হঠাৎ চুপ করে যায়। নির্মল পাশের ঘরে ঘুমের মধ্যে বিড বিড করে ওঠে, প্রমদা অঘোরে ঘুমায়। আর সুবোধ ডাক্তারের ছেলেবেলায় পড়া যুধিষ্ঠিরের সেই বহু পুরনো প্রশ্নটা মনে আসে। সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনা কী?—সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনা—নিয়ত চারপাশে মৃত্যু দেখেও মানুষ যে মরণশীল এ কথার বিস্মরণ। এ সব চিন্তা তাঁর কোনোকালে আসে নি। পরপার নিয়ে কোনো দিন মাথা ঘামান নি।

সুবোধ ডাক্তার হঠাৎ বালিশের নীচে একটা হাত চালিয়ে হাতড়াতে থাকেন। তারপর কি একটা না পেয়ে অবসাদে হাঁফাতে থাকেন। মাথাটা বালিশে হেলিয়ে আবার কিছুক্ষণ বিশ্রাম করেন। কানের পাশে ঘাম জমেছে টের পান। দুবার মৃদু ঢেকুর তোলেন। গলার কাছে শ্লেষ্মার

মতো কি একটা জমে আছে সেটাকে নামাতে কয়েকবার চেষ্টা করেন কিন্তু তা যেন গলা বুক চেপে বসে। উঠে বসেন সুবোধ ডাক্তার। একবার ভাবেন স্ত্রীকে জাগাবেন কি না। কিন্তু সারাদিন হাঁড়ি হেঁসেল সামলিয়ে, পয়সার অপ্রতুলতার সঙ্গে সমস্তদিন প্রতিযোগিতায় ক্লান্ত প্রমদাকে আর জাগাতে ইচ্ছে করে না। হঠাৎ জানুর নীচে ছোটো আয়নাটা ঠেকে। আস্তে আস্তে আয়নাটা তুলে চোখের সামনে ধরেন। আলো নেভানো ঘরেও আশ্চর্য পরিষ্কার বোঝা যায় তাঁর মুখখানা। এ মুখের সঙ্গে মাত্র দশ বছর আগে দেয়ালে টাঙানো ফোটোর মুখখানার কোনো সাদৃশ্য নেই। নাঃ, এ আর নির্মলের সেই ছুঁচলো দাড়িওয়ালা রিমলেস চশমা-আঁটা কার্ডিয়াক স্পেশালিস্টের কম্ম নয়।

আশ্চর্য, শ্লেষ্মাটা নেমে গেছে! সুবোধ ডাক্তার আরামে চোখ বোঁজেন, বালিশে আলগোছে পিঠ হেলান। তাহলে শ্লেষ্মা সাইকোলজিকাল যেমন হাঁপানিটাও সাইকোলজিকাল, চামড়ার রোগ কেউ কেউ বলছেন আজকাল সাইকোলজিকাল। সুবোধ ডাক্তার পেটটা বাঁ হাতে টিপতে থাকেন। লীভারটা হাতে লাগে, এটাও কি সাইকোলজিকাল?

এই লীভার নিয়েই বেধেছে কার্ডিয়াক স্পেশালিস্টের সঙ্গে। লীভার পাঁচ ইঞ্চি বাড়লে ওষুধ দিয়ে সারে না, একথাটা ছুঁচলো দাড়িকে বলাতে সে তাঁকে মডার্ন সায়েন্সের কথা বোঝালে। সুবোধ ডাক্তার আগেকার মতো চেঁচাতে পারেন না, আহত জন্তুর মতো চোখ বড়ো বড়ো করে সেই বক্তৃতা শুনেছিলেন।

ভোঁ বাজছে। কাকগুলো ঠিক আগের মতো ডেকে উঠল। গত তিনমাস না ঘুমিয়ে সুবোধ ডাক্তারের এ পৃথিবীর গতানুগতিকতার প্রতি একটা প্রবল আকর্ষণ জেগে উঠেছে। সারা জীবন এই গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এসেছেন। যা রোজই ঘটে তা মনে হয়েছে ঘটনা নয়, যা সচরাচর ঘটে না সেইটাই মনে হয়েছে ঘটনা। এখন এইভাবে রাতের পর রাতের নৈঃশব্দ্য এবং শব্দের আদান-প্রদানে, অন্ধকার ও আলোর এই সহ-অবস্থানে যা রোজ ঘটে সেইটার জন্যে তিনি উৎসুক হয়ে থাকেন। বস্তুত এখন যদি গঙ্গা থেকে ভোঁ না বাজত, যদি সচকিত কাক ডেকে না উঠত, নির্মল ঘুমের মধ্যে বিড় বিড় না করত, কিংবা ফ্যানের হাওয়ায় প্রমদার চুলের ছোটো

ছোটো গুছি খাড়া হয়ে না উঠত তাহলে তিনি যেন বঞ্চিত হতেন। এইরকম ছোটো ছোটো নাটকহীন ঘটনা জুড়ে জুড়েই কি জীবন ?

সুব্রত কাল এসেছিল। তাঁকে দেখে সুবোধ ডাক্তারের একটু কষ্টই হয়েছে। আগে হয় নি। আগে সুব্রতর লক্ষ্য বেশ স্পষ্ট ছিল, এখন ঠিক লক্ষ্যভ্রষ্ট না হলেও নানারকম বাধাবিপত্তির কথাই সে বললে। তাদের পার্টির ভেতর মনান্তর কি বিশ্রী পর্যায়ে এসেছে। পার্টি হয়তো ভেঙে যেতে পারে এই ধরণের কথা। যতক্ষণ এসেছিল প্রায় সারাক্ষণই বলে গেল। বললে, 'আপনাদের সময় ইংরেজ ছিল, তাই ইংরেজ তাড়ানোই ছিল প্রধান লক্ষ্য। সেইটাই সবাইকে মেলাত।' সুবোধ ডাক্তার কিছু বলেন নি, স্পেশালিস্টের কথা, ভাইপোর কথা একভাবেই শুনে গেছেন। কি করে ভাইপোকে বোঝাবেন যে এই ধরনের আইডলজির নামে দল-উপদলের কোঁদল আজীবন দেখে এসেছেন চোখের সামনে, সেই সি. আর. দাশ, জে. এম. সেনগুপ্তের সময় থেকে। এখন হয়তো আন্তর্জাতিক কথাবার্তা অনেক এসে যাচ্ছে, কিন্তু কোঁদল মানেই কোঁদল তা স্বাদেশিকতার জন্যেই হোক বা সমাজতন্ত্রের জন্যেই হোক এ কথাটা মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে জলের মতো পরিষ্কার লাগছে তাঁর কাছে।

ঘুমের ঘোরে নির্মল পাশ ফেরে। ছেলের দিকে চেয়ে মৃদু হাসেন সুবোধ ডাক্তার। নির্মল যেন তার পিতার প্রতি আজীবন বীতরাগের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। স্পেশালিস্ট ডাকার কারণও তাই। এই বারে বারে তাঁকে খাবার জন্যে প্রায় উৎপীড়ন করার পেছনেও বোধহয় এবই মনোভাব। নির্মল মনে মনে তার জ্যাঠাকে তার বাবার চেয়ে বেশী শ্রদ্ধা করে এটা সুবোধ ডাক্তার টের পান আর সেইজন্যেই এত দেরীতে তাঁকে নিয়ে ছেলের এভাবে পড়াতে তিনি বিরক্ত হন। নির্মল তার কলেজ স্ট্রীটের সান্ধ্য আড্ডাটা ছেড়ে দিয়েছে। বাড়িতে এসেই ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে। টেম্পারেচার নাও, দই খাও, ডাব খাও, আর স্পেশালিস্টের ছুঁচলো দাড়ি আর কথাবার্তা তাকেও প্রভাবিত করেছে। সেও বিশ্বাস করছে পাঁচ ইঞ্চি লীভার বাড়লেও খিদে থাকবে, বমি হবে না, সমস্ত কিছু শারীরিক ক্রিয়া অক্ষুণ্ণ থাকবে আগের মতো। এটা হয় না, হয় না—সুবোধ ডাক্তার হাত আলগা করে আয়নাটা বিছানায় ফেলে দেন।

অনেকক্ষণ আওয়াজ করে মিত্তিরদের বাড়ির সামনে পেট্রোল পাম্প থেকে বাস বেরোয়, বড়ো রাস্তায় ট্রাম চলার শব্দ আসে। এবার প্রচণ্ড আওয়াজ করতে করতে সরকারি দুধের গাড়িটা চলে যায় পাড়া কাঁপিয়ে, কলতলায় ছর ছর করে জল পড়ার শব্দ আসে। একটু চা পেলে ভাল হত। প্রমদা ভোরের হাওয়ায় কুঁকড়ে মুকড়ে ঘুমোচ্ছে। আবার সুবোধ ডাক্তারের কপালের ওপর ঘাম জমে। চিন্তাশক্তিটা, তাঁর চোখের দৃষ্টির মতো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। ভোরের আলোয় বিছানার ওপর প্রায় উবু হয়ে বসে থাকা একটা মূর্তির মতো সুবোধ ডাক্তার বসে থাকেন। কানের পাশে লম্বা চুলের গুছিটা ফ্যানের হাওয়ায় একবার ওঠে একবার নামে।

কতক্ষণ পর পাশের বারান্দার দিকে যেতে গিয়ে নির্মল চমকে ওঠে বাপের দিকে চেয়ে। প্রমদা দেবী তখনো ঘুমোচ্ছেন। নির্মল দৌড়ে যায় বাপের কাছে। নিঃশ্বাস এখনো পড়ছে। বাবাকে শুইয়ে দিয়েই সে নীচে দৌড়য় ফোন করতে।

সাড়ে এগারোটায় স্পেশালিস্ট আসেন। হাতে অনেক জরুরি কেস, বললেন তা সত্ত্বেও এসেছেন। রুগীর তখন জ্ঞান ফিরেছে। একটা ইন্-জেকশান দেওয়া হল, তার আগে অবশ্য তীক্ষ্ন দৃষ্টি মেলে স্টেথিসকোপ দিয়ে অনেকক্ষণ পরীক্ষা করলেন স্পেশালিস্ট। অবসন্ন প্রমদা দেবীর দিকে চেয়ে বললেন, 'ভাববেন না, ভাল হয়ে যাবে। এঁর চেয়েও অনেক সীরিয়াস কেস আজকাল ভাল হচ্ছে। একবার মেডিকাল কলেজে ভর্তি করাতে পারলে ভাল হত।'

'যা হবার এখানেই হোক,' প্রমদা দেবী ভয়ে ভয়ে বললেন।

ছোকরা ডাক্তার মধুর হাসলেন, 'ডাক্তারের বাড়িতে এরকম সুপার-স্টিশান ঠিক না।' নির্মলের দিকে চেয়ে বললেন।

যখন সিঁড়িতে নামছেন তখন নির্মল কিঞ্চিৎ বিহ্বলভাবেই জিজ্ঞেস করলে, 'কোনো ওষুধ বাড়বে না ?'

স্পেশালিস্ট আবার হাসলেন। 'ওষুধ ?' একটু ভুরু কুঁচকালেন-যেন অনধিকার চর্চা হচ্ছে। তারপর নির্মল হয়তো ঠিক ধরতে পারল না কিন্তু শুনল অনেকটা এইরকম : 'আগে কি দিয়েছেন ?…পেনাসিরিন ?…আচ্ছা

এবারে ট্রাই করুন টেনাসিরিন। ওটা আগের প্রেসক্রিপশানেই আছে। একবার ট্রাই করুন।'

'ট্রাই করব?' নির্মল স্বগতোক্তি করলে।

'হ্যাঁ, ট্রাই-ট্রাই, ট্রাই এগেন!' ও'র নামবার আওয়াজের সঙ্গে উত্তর মিলিয়ে যায়।

॥ পাঁচ ॥

লক্ষ্মীপুর থেকে ফেরার পর সুব্রতর ক্রমশ মনে হতে থাকে বয়স বড্ড বেড়ে গেছে।

লক্ষ্মীপুরের অ্যাগ্রিকালচার অফিসারের 'টেরাস কালটিভেশান' কথার ব্যবহারে তার আপত্তি ছিল কিন্তু যে পার্টির কার্ডে সে তার কৈশোর যৌবন গচ্ছিত রেখেছে সে কার্ডখানা কি আরো অগুনতি বিবাহ-নববর্ষ বড়োদিনের কার্ডের সঙ্গে একাকার হয়ে যাচ্ছে না? তার পার্টিও কি অন্যান্য রাজনৈতিক পার্টির মতো শেষ পর্যন্ত কতগুলো ফাঁকা শব্দের সৃষ্টিতে সাহায্য করছে না?

এ ধরনের চিন্তা কিন্তু সুব্রতকে— তার ভাই নির্মলের মতো রাজনীতি-বিরোধী করে নি। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে রাজনীতির এই অসংখ্য প্রাণহীন বাক্যজাল থেকে তার পার্টি কোনোদিন বেরিয়ে আসবে কিনা সে সম্পর্কে সে সন্দিহান হয়ে পড়ছে। আর তা যদি না হয় তাহলে ভারতবর্ষের মতো দরিদ্র দেশে সে যে অনেকের মতো এক প্রগতিবাদী সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে আসছে সে স্বপ্ন দাঁড়াবে কোথায়? তখন বাঁচতে হবে নির্মলের মতো, কেবল দর্শক হয়ে, এবং শুধু দর্শক হয়ে থাকা যায় না এ দর্শনে বিশ্বাস সুব্রত আজও হারায় নি।

ছেলেরা খুনসুটি ক'রে এ ওর চুল ধরে ঝুলে পড়ে, এমনকি আঙুল কামড়িয়ে দেয়। কিন্তু পরে আবার ভাব হয়। আবার খেলা করে। গত পাঁচ-ছ মাসে সুব্রতর পার্টিতে অন্তর্দ্বন্দ্ব ছেলেদের চুলোচুলি কামড়াকামড়িতে পরিণত। ছেলেদের ঝগড়ার সঙ্গে এক জায়গায় পার্থক্য—বড়োদের এ ঝগড়া প্রকৃত সমাজতন্ত্রের নামে, মার্ক্স-এর নামে, কিংবা লেনিনের নামে

আত্মসমালোচনা। কিন্তু এই ধরনের অর্ডার দেওয়া আত্মসমালোচনায় কিছু হয় না, বিরোধ বাড়ে। যে দু-জন লোক কুড়ি বছর একসঙ্গে পাশাপাশি কাজ করে এসেছে, জেলে গিয়েছে, তারা দু-জনেই দু-জনকে ধিক্কার দেয় অসংখ্য নতুন নতুন কাল্পনিক তিরস্কারে। সে সব তিরস্কার বেশীর ভাগ ইংরেজীতে, এ সব কথা প্রথম প্রথম তীরের মতো গায়ে এসে বেঁধে, তারপর আখছার ব্যবহারে এগুলোর ফলা ভোঁতা হয়ে যায়। আর এই তীরের যে ক্ষত তাতে রক্ত ক্ষরণ হয় না, মন হয় ছিন্নবিচ্ছিন্ন।

মীর্জাপুরের মেসে সুব্রতর ডেরায় আজকাল কিছু বিহ্বল লোকজন যাতায়াত করছে। তারা সন্ধেবেলায় তক্তপোষে মুড়িপার্টি করে। তার মধ্যে একজন বর্ষীয়ান প্রেস ফোটোগ্রাফার, অধ্যাপক, ছাত্র, ট্রামের বহুদিনের ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী ভিড় করে। ফোটোগ্রাফারটি— যাঁর সম্পর্কে বলা হয় তিনি পার্টির টাকা মেরে দিয়েছেন, এবং যিনি বলেন পার্টি তাঁর সর্বনাশ করেছে— বলেন, 'আর কেন দাদা, দোকানপাট গুটাও। অনেককাল তো হল। এখনো বয়েস আছে। চাকরিবাকরি করে একটা সংসার পাততে পারবে। আমাদের বয়েস হয়ে গেছে। পড়ে থাকব। পার্টি জোড়া পায়ে লাথি মারবে। আমরা চৌকাঠ আঁকড়ে পড়ে থাকব। আমাদের তো অন্য গতি নেই। কিন্তু তোমরা কেন দাদা? একটা চাকরি করো। বিয়ে থা করে সংসার করো আর পাঁচজনের মতো। পাঁচ-দশটাকা নাহয় দিও যে ছেলেটা স্কুলে মাইনে দিতে পারে না তাকে। গরিব আত্মীয়দের বিয়েতে নাহয় একটু সাহায্য কোরো। সে সাহায্যের মানে আছে। তাতে একটা গরিব ছেলে অন্তত পড়তে পারবে। একটা গরিব মেয়ের বিয়েটিয়ে হবে। কিন্তু এখানে? কিসের জন্যে এই আত্মত্যাগ বলতে পারো? আমার ছেলেটা টি. বি. হয়ে হাঁসপাতালে পড়েছিল, কেউ দেখতে গিয়েছিল পার্টি থেকে? যেখানে যাবার সেখানে ঠিক দৌড়বে। পলিটিক্স সব এক দাদা— মিথ্যে কথাটা কেমন ভাবে চেপে যেতে পারো— এই তো পলিটিক্স?'

'তোমার কথাটা মানতে পারছি না অপূর্বদা', সুব্রত ম্লান হেসে বলে। 'পথে চললেই পায়ে ধুলো মাখতে হবে।'

'তুমিও এরকম মন ভাঁড়ানো কথা বলছ?' অপূর্ব প্রায় রুখে উঠল।

'দশ বছর আগে এসব কথা মনে হত না কেন? আজ কেন এগুলো মনে হচ্ছে?' সুব্রতর প্রশ্নে একটু হকচকিয়ে গিয়ে অপূর্ব বলে, 'দশ বছর আগে পার্টির মধ্যে এত বদমায়েসি ছিল না।'

'বদমাইস সৎ এইসব লোক নিয়েই মানুষ, এই নিয়েই পার্টি। পার্টির যখন জোর থাকে— যেরকম দশ বছর আগে ছিল— তখন এইসব ঠেলেঠুলে এগিয়ে যায়। আর জোর কমে এলে তখন বদমাইসি বেড়ে যায়। তখন তোমার মতো সবাই আমরা গ্রাম্‌বল করি, পলিটিক্স বাজে বলি।...কোনটা ভাল বলো তো দাদা? পরিবার প্রতিপালন, অন্যেকে সাধ্যমতো একটু সাহায্য করা— এতেই কি দেশ চলবে?'

'দেশের কথা জানি না। অত দায় আর সহ্য হচ্ছে না ভাই। আমার তোমার চলবে, তাহলেই হল।'

সুব্রত গরম হয়ে বললে, 'আমার চলবে না। পলিটিক্স ছাড়া আমার অস্তিত্ব নেই. আমি সে অস্তিত্বে বিশ্বেস করি না। পলিটিক্স আমাদের মেরুদণ্ড। সেইজন্যেই পৈতৃক বাসস্থান ত্যাগ করেছি। সেইজন্যেই তোমার সঙ্গে কথা বলছি দাদা। এখন কেঁচে গণ্ডূষ করব কেন? কী হয়েছে? পলিটিক্স মানে তো কতগুলো মানুষ নয়— ডাঙ্গে জ্যোতি বোস নাম্বুদ্রিপাদ নয়, স্টালিন ক্রুশ্চভ মাওসে তুং নয়। আমি যা পলিটিক্স বলে ভাবি তাছাড়া আমার দেশ আমার নিজের ভবিষ্যৎ ভাবতে পারি না।'

'মরো, মরো' অপূর্ব মুড়ি চিবোতে চিবোতে বলে।

ইংরেজ কবি স্টিফেন স্পেণ্ডার কয়েক বছর আগে ভারতবর্ষে এসে কলকাতার এক ছোটো সভায় বলেছিলেন যে সাম্প্রতিককালে ভারতবর্ষ যে আন্তর্জাতিক জগতে সুনাম কিনেছে তার জন্যে দায়ী তার পররাষ্ট্রনীতি নয়, এদেশের নেতাদের ইংরেজী ভাষার ওপর দখলই এ দেশের সাফল্যের কারণ। বোধহয় কলেজের মাস্টারদের জন্যেই বিশেষভাবে ডাকা কোনো সভায় অম্লানবদনে বলেছিলেন স্পেণ্ডার। শুনে নির্মলের গা জ্বলেছিল। কিন্তু পরে সে ভেবে দেখেছে বোধহয় কবির অন্তর্দৃষ্টি থেকেই এ কথা বলা। কারণ সাফল্য কিংবা অসাফল্য যাই হোক স্বাধীনতা-পরবর্তী এদেশের অগ্রগতির রথে ইংরেজী ভাষার বিজয়কেতন। একটি বিদেশী ভাষাকে

রপ্ত করার ব্যর্থ চেষ্টায় নিজেদের জীবনযৌবন দান করার আত্মগ্লানির কথা বাদ দিলেও দৈনন্দিন চিন্তার প্যাটার্নে ইংরেজী ভাষা যেন আধখানা অংশই জুড়ে রয়েছে। রাজনীতি কিংবা সমাজচিন্তা কেন, আমাদের রোজকার ওঠা-বসায় ইংরেজী কথার কতকগুলো ফরমুল্যার জাল আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে নেই? রাজুর চিঠিতে 'গত এক বছরে যা কিছু হয়েছে যেন মনে হয় সব আমার একার লাভ, আমার একার ক্ষতি' এ লাইনটা পডতে পড়তেই নির্মলের গায়ে ইংরেজী কথার একটা আরশোলা ফর ফর করে বসতে থাকে, আউট অফ সাইট আউট অফ মাইণ্ড।

নির্মলের চিন্তা এভাবে অগ্রসর হয়। 'মেয়েটি যদি তার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াটা কলকাতায় বসে করতে পারত, যদি চিঠির নিরবয়ব আদানপ্রদানের চেয়েও সেই শেয়ালদার নোংরা হোটেলের আশ্চর্য সন্ধেটার মতো আরো কতগুলো সন্ধে তাদের জীবনে আসত তাহলে হয়তো সে যা প্রস্তাব করে এসেছে সে প্রস্তাবে রাজু রাজী হত। তাতে কী হত সে জানে না। মাঝে মাঝে মনে হয় বরং এই ভাল, এইভাবে স্মরণ ফিকে হয়ে যেতে যেতে শেয়ালদার জলজ্বলে সন্ধেটা ধুয়ে মুছে যাবে। আর তার সেই আত্মবিশ্বাস, 'সারাজীবন তো সামনে পড়ে আছে' নির্মলের নেই। নির্মল বুঝতে পারছে (আবার একটা ইংরেজী ভাষার আরশোলা ফর ফর করে) একটা ক্রস্‌বোর্ডে এসে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে স্থির করতে হবে সে কোন্ দিকে যাবে, সারাজীবন তার সামনে পড়ে নেই। কয়েকটা বছরও নেই, বোধহয় কয়েকটা মাস, কিংবা তাও নেই। তাকে স্থির করতে হবে সে কোন্ পথ নেবে?—রাজুর জন্যে অনিশ্চিত অপেক্ষা, কলেজের দেয়ালে ছারপোকার দাগ, কলেজ স্ট্রীটের আড্ডায় হাইচাপা আলাপ, কে কাকে ভজিয়ে আমেরিকা কি বিলেত গেল সে কথায় সাময়িক বিমর্ষতা, বাড়ি ফিরে সারাদিন পরিশ্রমে ধোঁকা হাড়গিলে মায়ের ঝাঁঝ, এরই মাঝে মাঝে ডনকুইক্সোটি উচ্ছ্বাসে সাহিত্য বোঝানোর চেষ্টায় ছেলেদের টেবিল মচ্‌মচ্‌, জুতো খস্ খস্, মাঝে মাঝে বালিগঞ্জ প্লেসে জ্যাঠামণির চাপা ভর্ৎসনা আর আছে দিশী বিদেশী বিদগ্ধ সিনেমায় সময় কাটানো (নির্মল এরকম একটা সিনেমা ক্লাবের সভ্য), প্রায় ছেলেবেলা থেকে চটকানো আইজেনস্টাইন পুডভকিন, ইত্যাদি সিনেমা পণ্ডিতদের প্রাণহীন পুজো, অথবা বিদেশী সংবাদপত্র জার্নালে কোনো বইকে

'মার কেলাস, দে চাবি' বলায় হুকমুক করে সেই বইখানা জোগাড করে পড়ার আত্মতৃপ্তি— এই বিরাট বৃত্তের মাঝখানে রাজু কতটুকু বিন্দু ?

আর জীবন একটা বাস নয় যে যেখানে খেয়ালখুশি সেই স্টপে নেমে পড়লাম— নির্মল এ কথাটা ক্রমশ বুঝতে পারছে। যেমন রবীন্দ্রনাথের কোনো গান বিশ বছর আগে যেরকম লেগেছে তিরিশেও তেমনি লাগবে তার কোনো মানে নেই, তা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই লাগে না। দুটি নবনারীর প্রবল আত্মমগ্নতায় পাশাপাশি বসে থাকা আর দু বছর পরে নাও ঘটতে পারে। তার এই জগৎখানাকে রাজ্ আঁকড়ে ধরে থাকলেও সে আঁকড়ে থাকতে পারবে না, তাকে এ জগৎ ছেড়ে যেতে হবে। আর বিদায়ের মুহূর্তে মন যেমন ব্যথায় ভরে ওঠে, নির্মলেরও তেমনি তার অতীত থেকে সরে আসতে আসতে বিহ্বলতায় চিত্ত আচ্ছন্ন হয়। মাঝ রাত্রে ঘুম ভেঙে গেলে পাশের ঘরে অন্ধকারে খাটের ওপর সোজা বসে থাকতে দেখে বাবাকে। বাবা যেমন রোজ অন্ধকারে এ পৃথিবীর কাছ থেকে ধীরে ধীরে বিদায় নিচ্ছেন সেও তেমনি একটু একটু করে বিদায় নিচ্ছে তার বর্তমানের কাছ থেকে।

নির্মল রাজুকে চিঠি লেখে :

> তুমি হয়তো বিরক্ত হবে। কিন্তু আমি আরেক বার জানতে চাই আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি। তোমার পরীক্ষার পাসের খবর আগের একখানা চিঠিতে লিখেছিলে। এরপর কী করবে ? লিখেছ, বিদেশ যাবার ইচ্ছে আছে তোমার, আমার সেরকম ইচ্ছে আছে কি না। আমার আগে ছিল না, এখন হচ্ছে। কিন্তু এই অনিশ্চিত ভাবে আমরা কতদিন থাকব ?
>
> তুমি একটু মাথা ঠাণ্ডা করে উত্তর দিও। আমাকে সেইমতো প্ল্যান করতে হবে। আমি টপ্ করে কিছু করতে পারি না। আমাকে প্ল্যান করতে হয়। কলকাতা কিংবা ঢাকায় যদি আমরা মিলতে না পারি, তাহলে বিলেতের আকাশের নীচে কি আমরা মিলতে পারব ? তোমার শেষ চিঠির হতাশা আমার ভাল লাগে নি। আমাদের মিলনের (বিয়ে কথাটা লিখতে নির্মলের বিশ্রী লাগল) পথে কী বাধা আর কীভাবে তা দূর করা যায় সেই

সম্পর্কে তুমি ঠিক ভাবো নি। তোমাকে আমি তা ভাবতে অনুরোধ করছি।

নির্মল এ চিঠির উত্তর পায় নি। ভেবেছিল বোধহয় রাজুর কাছে চিঠিটা পৌঁছয় নি। কারণ চিঠি ছাড়ার দিন দুয়েক পরেই নির্মল কাগজে পড়ল রাজুর বিখ্যাত বাবার বাড়িতে খানাতল্লাসী হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানে সদ্য প্রতিষ্ঠিত মিলিটারি রাজ তাদের অস্তিত্বের কৈফিয়ত হিসেবে এন্তার ধর-পাকড় আরম্ভ করেছে। তবে আইনের ইস্পাতের মাঝখানে বে-আইনের কিছুকিছু ফোকরও থেকে যায়। অনেক কাগজপত্তর পুলিশের হাতে পড়লেও কোন ফাঁকে নির্মলের চিঠি রাজুর কাছে ঠিক সময় গিয়েই পড়েছিল। আর চিঠি পড়তে পড়তে রাজুর চোখে সেই বেয়াড়া আলো খেলেছিল। প্ল্যান করার কথায় সে প্রায় সশব্দে হেসে উঠে থমকে যায়। তারপর টপাটপ দুটো স্যারিডন গিলে সটান দৌড় দিল তার বন্ধু ফুলুর বাড়ি। সেখানে যে-ধরনের কথায় ফুলু অভ্যস্ত অর্থাৎ পুরুষমাত্রই স্বার্থপর এইরকম আলোচনায় মেতে উঠল। কয়েকদিন ধরে তার ডাক্তার জামাইবাবুর বাড়িতে থেকে দিদির পাঁচ-ছটা ছেলেমেয়ের চ্যাভ্যা চেঁচামেচির মাঝখানে নিজেকে ডুবিয়ে দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু বিশেষ সুবিধে হল না। তারপর প্রায় মাস দেড়েক লাল ডগডগে লিপস্টিক ঠোঁটে লেবড়ে রেডিও পাকিস্তানে রাজুর চাকরি। সেখানে তাকে নিয়ে এক রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইয়ে ছোকরা আর 'প্রোগ্রাম অ্যাসিস্টেন্ট'-এর মধ্যে মারামারি বাধবার উপক্রম হবার আগেই সে কাট মারলে। দেশভাগের পর থেকে দেশটা তার কাছে ছোটো লাগছে, এখন মিলিটারি শাসন চালু হবার পর থেকে তা যেন এতটুকু হয়ে গেছে। ছেলে-বেলা থেকে রক্তের মধ্যে মিশে যাওয়া— এই পূর্ব বাংলার মায়াটে শ্যামলা পরিবেশ তাকে আর ধরে রাখতে পারে না। আর তাছাড়া নির্মলের সঙ্গে পত্রালাপের মতোই তার চারপাশের পাকিস্তানী যুবসমাজের গণতন্ত্রের জন্যে মাথাকোটা আন্দোলন তার শক্তিসামর্থ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে বলে মনে হয়। তাদের সঙ্গে মানসিক একাত্মতা বোধ করলেও বছরের পর বছর এই অনির্দিষ্ট আন্দোলন, এই মিছিল আর জেল (যে অবস্থার মারফত তার পরিচিত অনেকেই চলেছে) তার কাছে কষ্টকর এবং প্রায় অসহনীয় ঠেকে। রাজুও নির্মলের মতো বিদায় নিতে চায় তার অতীত থেকে। অতীতের জন্যে

এত দায় তার পোষাচ্ছে না? রাজু তাই তার পরিচিত কিছু কিছু লোক-জনের মতো চায় সমস্যার পাশ কাটিয়ে যেতে। যাতে সম্ভব হয় এই বুকচাপা পরিবেশ ছেড়ে আরো কোন মুক্ত পরিবেশে সহজ ভাবে লোকের সঙ্গে মেলামেশা।

॥ সাত ॥

সেদিন সকালে আট-দশজনের বেশী প্রার্থী আসেন নি প্রবোধ সেনের বৈঠকখানায়। প্রবোধবাবু খুব আগ্রহের সঙ্গে তাঁদের কথাবার্তা শুনলেন, ইংরেজীতে যাকে সচরাচর বলা হয় সিম্প্যাথেটিকালি কন্সিডার করা। গত কয়েক বছরে এই দেশের কাজের মাঝখানে তিনি বুঝতে পারছেন যে ভগবানের কাছে যেমন ভক্ত, পাবলিক ম্যান-এর কাছে তেমনি প্রার্থী। মাঝে মাঝে বৈঠকখানায় লোক কম এলে হাঁফ ছাড়ার বদলে তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তাঁর শঙ্কা বাড়ে হয়তো তিনি বাড়তি মানুষদের দলে পড়ে যাচ্ছেন।

সেদিন প্রবোধ সেনের এককালীন সহকর্মী কেষ্টনগরের ভবনাথ যখন তাঁকে হিউমার করবার চেষ্টায় নেহরুর ডিস্কভারি অফ ইণ্ডিয়া বইখানির পুরো একখানা পাতা মুখস্থ বলে যাচ্ছিল তখন ফস্ করে প্রবোধবাবু বলে উঠলেন, 'তোমার মেয়ের মেডিকেলের সীট-টা হয়ে যাবে ভব!' লাল চকচকে টাক্, সিল্কের চাদর, বিদ্যাসাগরের চটি— ভবনাথ সেন মুহূর্তে নেহরু ভুলে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'বেঁচে থাকো।' তারপর 'তোমার আর সময় নষ্ট করব না' বলে বেরিয়ে গেলেন।

চাপা হাসি খেলে যায় প্রবোধ সেনের মুখে। বলেন. 'ভবটা সেই একই রকম থেকে গেল।' তারপর তার এক বন্ধুপুত্র যে নাকি খুব ব্রিলিয়াণ্ট এবং যে তার সরকারি কলেজের চাকরিতে ঝাড়গ্রাম কলেজে বদলির কথা শুনে কাঁদোকাঁদো হয়ে ছুটে এসেছে তার দিকে সস্নেহ দৃষ্টি মেলে বললেন, 'আমরা আর কি করতে পারি বলো। আমাদের কথা কেউ রাখল, কেউ রাখল না। সবই তো চেষ্টা।'

বলে একটা চুরুট ধরিয়ে চুরুটের কৌটো সামনে সরিয়ে দিলেন। ছোকরা

সলজ্জভাবে জিভ কাটল। প্রবোধ সেন বললেন, 'সর্বত্র একই ব্যাপার। এসেনশিয়ালি সেই ডিমাণ্ড আর সাপ্লাইয়ের কনসেপ্ট। মাছের বাজার, চালের বাজার ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তারিতে ঢুকবার বাজার সব জায়গায় এক ছবি। ইংল্যাণ্ডেও তাই। আরে কি বলব। ভন্তুকে বেন্টিওল কলেজে ঢোকাবার জন্যে একেবারে হিমশিম খেয়ে গেলাম। শেষ পর্যন্ত আই হ্যাড টু অ্যাপ্রোচ ইন্দিরা।'

ছোকরার পাশের ভদ্রলোক একজন অনাহারী উকিল। দেশ ভাগের অনেক আগেই পূর্ব বাংলা থেকে চলে এসেছেন সপরিবারে। এখন রেফিউজি সুবাদে ছেলের নামে একটা ট্যাক্সির পারমিটের জন্যে এসেছেন। নিজের কেস সম্পর্কে তাঁর যেন যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস নেই। কেমন গোরুচোরের মতো ভয়ে ভয়ে সামনে তাকিয়ে আছেন। সেদিকে অপাঙ্গে চেয়ে প্রবোধ-বাবু ভবেন গাঙ্গুলীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বাইরে কজন?' আজ একবার নির্মলদের বাড়ি···

ভবেন বললে, 'পাঁচ-সাতজন আছে। একটা টি. বি., দুটো হাউস বিল্ডিং লোন, রতনবাবুর সেই এক্সটেনশান, আর সিং এসেছে।'

প্রবোধবাবু ভুরু কুচকালেন, 'সিং এখানে কেন, অফিসে যেতে বলে দাও। ওসব ঘুষ টুস আমার এখানে হবে না।' তারপর কি মনে করে বললেন, 'আসুক হিম্ টু কাম্।'

লম্বা ছ'ফিট চার ইঞ্চি, ঘিয়ে স্যুট, লাল টকটকে টাই, পাগড়ী, মুখে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও বিনয়— সিং ঢুকেই বললে, 'মিস্টার সেন যদি আগামী মঙ্গলবার রোটারী ক্লাবের লাঞ্চমিটিং-এ ইণ্ডিয়াজ প্ল্যাণ্ড ডেভালাপমেণ্ট সম্পর্কে কিছু বলেন।' তার কথাটাকে যেন গুরুত্ব দেবার জন্যে বললে, 'এস্টরও আসছেন।'

এস্টর মানে আমেরিকান কন্সাল জেনারেল, একথাটা প্রবোধ সেনের মনে চকিতে খেলে গেলেও তিনি যেন এক মুহূর্তের জন্যে মোহাচ্ছন্নভাবে বসে থাকেন। ইংরেজীতে যাকে বলে ব্রাস্ সেই হঠকারিতা কতদূর পর্যন্ত যেতে পারে প্রবোধবাবু তার এইমাত্র প্রমাণ পেলেন। সিং পার্ক স্ট্রীটে একটা শাঁসাল রেস্তোরাঁর মালিক। একটা বার লাইসেন্স পাবার জন্যে সে প্রাণপণ চেষ্টা করছে গত এক বছর। শেষ পর্যন্ত সরকার তাকে লাইসেন্সও

দেবে, এ কথা প্রবোধবাবু স্বতঃসিদ্ধ বলেই জানেন। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো একটা কমিটি ভারতবর্ষে মদ্যপান সম্পর্কে খুব রগচটা রিপোর্ট দিয়েছে আর কাগজে কাগজে তা নিয়ে হৈ হৈ চলছে কাজেই প্রাদেশিক সরকার একটু ঝুলিয়ে রাখছেন ব্যাপারটা।

'তুমি আবার কবে থেকে রোটারী ক্লাবে ঢুকলে?'

সিং যেন এ প্রশ্নের জন্যে তৈরী হয়েই ছিল। বললে, 'নাইনটিন ফর্টি সিক্স থেকে স্যার। সেন্টজেভীয়ার্সে ডিবেট করতাম। তারপর বিজনেসে এলাম। কিন্তু সাম সর্ট অফ কোওপারেটিভ লাইফ অলওয়েজ অ্যাট্রাক্টেড মি।' চোখা হাসি, একমুখ ঘন কালো দাড়ির ভেতর থেকে তার ভেজাভেজা চোখ, সে দুটো বড় বড় করে মেলে সিং বললে, 'আমরা তো আপনাদের মতো স্যার দশের জন্যে সাবস্ট্যানশিয়াল কিছু করতে পারব না। তবে, 'দে অলসো সার্ভ হু স্ট্যাণ্ড অ্যাণ্ড ওয়েট।' সিং একটু মিলটন দিলে।

পাশের ছোকরাটি হঠাৎ ঘুমের মধ্যে যেন বিড় বিড় করে উঠলে, 'আমার কেসটা স্যার।' তার মুখ চোখ দেখে বোধ হল ঝাড়গ্রামের ঝাড় তার দিকে তেড়ে আসছে।

প্রবোধ সেন সেদিকে না চেয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে সিং-এর দিকে চেয়ে থাকেন। তার মনে হতে থাকে যেন সিংই নবীন ভারতবর্ষের পুরুষকার যে পুরুষকারে সমস্ত বাধা অগ্রাহ্য করে মানুষ সিদ্ধির পথ মুক্ত করে। সিং-এর পাশে পাশে তাঁর ভাইপো, তাঁর ছেলের অস্তিত্ব প্রবোধ সেনের ভীষণ অবাস্তব ঠেকে। সমস্ত পৃথিবী তোমার পায়ের নীচে, শুধ সিংহের মতো বলিষ্ঠ পা বাড়াতে হবে (বিবেকানন্দের কয়েকটা লাইন অস্পষ্টভাবে ভেসে ওঠে মনে)। তাঁর গত কয়েক বছরের অর্থনীতি ও বাণিজ্য দপ্তরের অভিজ্ঞতায় তিনি এ বিষয়ে একেবারে স্থিরমত যে তাঁদের ছেলেরা এই জগতে মিস্‌ফিট্। তিনিও গান্ধী-নেহরুর ভক্ত কিন্তু এ ভক্তি দিয়ে সারা পৃথিবীর অর্থনীতি-জগতের যে ধারা তাকে তো বানচাল করা যাবে না। আর এই অর্থনীতিতে লাইসেন্স বের করবার জন্যে ক্লাবের পাণ্ডা হতে হবে, মেয়েমানুষ সংগ্রহ করতে হবে। দিল্লীতে কলকাতায় এরকম ঘটনা হামেশাই ঘটছে। তাঁদের ছেলেরা ভাবে এ ঘটনাগুলো ব্যতিক্রম, আর সিংরা জীবনযুদ্ধে নেমেই ধরে নেয়, এগুলোই নিয়ম। বস্তুত মদ, মেয়েমানুষ, পাবলিক রিলেশান্‌স, সিনেমা,

খবরের কাগজ এই তো ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সাইকোলজি। ভারতবর্ষ যখন একবার স্থির করেছে তাকে ইংল্যাণ্ড-আমেরিকার মতো হতে হবে তখন এগুলোও আসবে। নাচতে নেমে ঘোমটা দেওয়া কেন?

প্রবোধ সেন চুরুট ধরালেন, তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'সিং, তোমার লাইসেন্সটা কেন একটু আটকাচ্ছে বুঝতে পারছ। ইউ আর ইন্টেলিজেন্ট এনাফ।'

সিং হাসে প্রচ্ছন্ন অন্তরঙ্গতায়। 'আমিও নিয়ে আসিনি স্যার। আপনার সাউণ্ড জাজমেণ্ট, প্রাকৃটিকাল সেন্স-এর ওপর আমাদের সকলের আস্থা আছে।···আপনি লাঞ্চমিটিংয়ে একটু বলবেন। আপনাদের ট্যাক্সেশান নিয়ে আমাদের কেউ হয়তো বলবে। ইউ কেন ইগনোর দ্যাট্। উই আণ্ডারস্টাণ্ড ইচ্ আদার।'

সিং চলে যাবার পর পাশের ছোকরাটির কাঁদো-কাঁদো মুখখানার দিকে চেয়ে প্রবোধ সেন সান্ত্বনা দেন, 'আমি তো বললাম আমি একটা ফোন করে দেব।···আর দুবছর ঝাড়গ্রামে নাহয় ঘুরেই এলে। পেটের গণ্ডগোল সেবে যাবে। ক্ষিদে হবে।'

ভবেন এসে বললে, 'আপনার স্যার আজকে একসঙ্গে আমেরিকা আব রাশিয়া···

'সে কি!' প্রবোধবাবুর গলায় কপট আতঙ্ক!

'একটা ইণ্ডো-আমেরিকান সোসাইটি— সন্ধে ছটা। আর সন্ধে সাতটায় সোভিয়েট ইউথ্ ডেলিগেশন, স্টুডেন্টস্ হল।'

'দমদমে কিছু নেই তো কাল?' ক্লান্তভাবে বললেন প্রবোধবাবু।

'হ্যাঁ স্যার, সকাল সাড়ে আটটায় যুগোশ্লাভিয়ার ভাইস প্রিমিয়ার।'

'আবার সকালে!' মুখ বেজার করেন প্রবোধবাবু। অত সকাল সকাল কোষ্ঠ পরিষ্কার করার সমস্যায় তাঁকে এখনই বিচলিত দেখায়। বাগবাজারে কখন যাব?' একটু কর্কশভাবে জিজ্ঞেস করেন ভবেনকে।

'আজকে আর···'

'না আজই যেতে হবে। ডিউটি ফার্স্ট।' তারপর হবু রিফিউজি ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে বললেন, 'ট্যাক্সি করবেন? আপনার ছেলে ট্যাক্সি চালাবে?'

'হ্যাঁ স্যর, চালাবে।' ভদ্রলোক গোরুচোরের মতো তাকায়।

'আমি রেকমেণ্ড করছি। দেখবেন, দুমাস পরে যেন অন্য লোক নিয়ে আসবেন না।' তারপর সই করতে করতেই বললেন, 'সেই সেম্ ওল্ড স্টোরি। এ.ট্যাক্সি যাবে সিংদের কাছে। বাঙালী জাতটা শুধু মাছিমারা কেরানী হতে শিখেছে।' ভদ্রলোক সইকরা দরখাস্তখানা দুহাত দিয়ে আঁকড়ে ধরেন। আর দু-তিন জন যাঁরা আছেন তাঁদের সম্পর্কে ভবেনকে দু-চার কথা বলে দিয়ে প্রবোধ সেন রাইটার্স বিল্ডিং যাবার জন্যে তৈরী হন।

সেদিন সন্ধেবেলা প্যান্টের ওপর প্রিন্সকোট চাপিয়ে প্রবোধ সেন রুশ ও আমেরিকানদের সভায় গেলেন। তিনি দু-দেশের ছেলেমেয়েদেরই বললেন: আপনাদের মহান দেশ, আমাদেরও মহান দেশ। আমাদের এই দুই সংস্কৃতির মাঝখানে সেতু স্থাপনের প্রচেষ্টা আরো দৃঢ় করা প্রয়োজন। তার পর বিশ্বের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা যে শান্তি ও প্রগতি, এবং গান্ধী-নেহরুর নেতৃত্বে ভারতবর্ষের এইপথে দৃঢ় পদক্ষেপ— এই ধরনের ইংরেজী কথার আলোচনা রোজ খবরের কাগজে যে রকম ফর-ফর করে ওড়ে সেই রকম আর-শোলাগুলো ছেড়ে দিলেন। আমেরিকানরা তাও কিছুটা-পরিচিত ইংরেজী আওয়াজ শুনছিলেন কিন্তু যে-সব রুশ নর্তক-নর্তকী শিল্পী মাত্র দু-তিন দিনের জন্যে কলকাতায় এসেছেন 'ভারতবর্ষের সঙ্গে তাঁদের দেশের সাংস্কৃতিক বন্ধন আরো দৃঢ় করার জন্য' তাঁরা সুন্দর অর্থহীন হাসিমুখে চেয়ে থাকেন। আর প্রবোধ সেন যখন তাঁর কালো-কোটে-আঁটা শরীরটা একবার এদিকে আর-একবার ওদিকে হেলিয়ে, 'ইওর গ্রেট কান্ট্রি, ইওর গ্রেট কান্ট্রি' বলে চলেন তখন সেই স্তব্ধ জনতার সামনে আবেগে দোদুল্যমান বক্তাকে ছবির মতো দেখায়, যে ছবি রোজ কাগজে বেরোয় এবং যে ছবির আসলে কোনো মানে নেই।

॥ আট ॥

শব্দের খোলস থেকে অর্থকে টেনে বার করবার সমস্যা দুজনের কাছে আসে দুভাবে। অন্তত নির্মলের কাছে এখন আর এ সমস্যা নেই। রাজুর কয়েক বছরে লেখা চিঠি নাড়াচাড়া করতে করতে কখনো কখনো তার কোনো কোনো অংশের সত্যতায় চমকিত হলেও সে ভাবতে থাকে যে আসলে এগুলো তাদের দুজনের যৌবনের উদ্বৃত্ত সময়ের ওগ্‌লানি। রাজু তাকে যেভাবে লিখেছে— কোনো এক বিশেষ ধরনের ভালবাসার ভিত্তিতে তাদের চিঠিলেখা সুরু হয়নি, একথাটার মানে কেবল একরকমই হতে পারে অর্থাৎ কম বয়সের খেয়ালী হাওয়ায় কথার ঘুড়ি ওড়ানো, তারা দুজনেই এই ঘুড়ি উড়িয়েছে। অবশ্য শেয়ালদার সন্ধেটা সে এভাবে ভাবতে পারে না, ভাবতে এখনো কষ্ট হয়। কিন্তু সেই কতগুলো মুহূর্তের শুদ্ধতা যা ব্লেকের কবিতার মতো তাঁর জীবনে এসেছিল, অনুভূতির হীরে শব্দের বালির ভেতর থেকে ঝিকিয়ে উঠেছিল, সেই ক্ষণস্থায়ী মুহূর্তকে কি রাখা যায় চারপাশের দীর্ঘস্থায়ী বিবক্তির সামনে? সেই শব্দহীন অনুভূতির ঝলমলে মরীচিকার পেছনে ধাওয়া করে কি লাভ?

আবার সেই ইংরেজী শব্দের আবশোলা তার অনুভূতির তীব্রতা অশুদ্ধ করে দেয়। টু গুড ফর হিউম্যান নেচার্স ডেলি ফুড বেশ লাগসইভাবে তার মনে আসে। সে আর ভাবতে চায় না মানুষের রোজকার খাদ্য কি? অথবা অনুভূতির শুদ্ধতা কি মানুষের রোজকার খাদ্য নয়?

অনুভূতির শুদ্ধতা মানুষকে কতদূর নিয়ে যেতে পারে? নির্মলের প্রশ্ন এদিকে যায়। অনুভূতির শুদ্ধতা নিয়ে তার বাপ সারা জীবন কাটিয়েছে। এখন তাকে একটা বাগাফট বুড়ো ভাবা যেতে পারে কিন্তু তাঁর অত্যন্ত রাজনীতি-ঘেষা-জীবনে তিনি যা ভেবেছেন তাই করবার চেষ্টা করেছেন। তিনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ লোক কিন্তু নিজের কাছে তাঁর কোনো ফাঁকি নেই, নির্মলের একথাটা খোলাচোখে ধরা পড়ে। কিন্তু তারপরেই সে নিজেকে বলে,

তাতে কি হল ? একদিকে ব্যর্থ নিঃসঙ্গ আদর্শবাদ আর অন্যদিকে সাংগঠনিক শয়তানি— এছাড়া কি রাস্তা নেই ?

সে যেভাবে নিজেকে তৈরী করছে তাতে একদম বেকায়দায় পড়ে যাবে যদি রাজু হঠাৎ মত পরিবর্তন করে। যদি সে হঠাৎ কলকাতায় চলে আসে এবং নির্মলের দিকে 'বিশেষ ভালবাসার ভিত্তিতে' হাত বাড়ায়। তাহলে কি হবে ? তবে এ ধরনের ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনা যেন ক্রমশ কমে আসছে। নির্মল আর রাজুর দূরত্ব বেড়ে যাবার সঙ্গে তাল রেখে যেন সম্প্রতি দুই বাংলার মধ্যে বিরোধ আরো বেড়ে যাচ্ছে। আবার কিছু খুচরো দাঙ্গা, প্রাণহানি, বর্ডারে সংঘর্ষ, কাগজে চেঁচামেচি দু-জায়গার অধিবাসীদের তিক্ততা আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে। এর মাঝখানে রাজুর সেই আশ্চর্য চিঠির লাইনগুলো কোথায় তলিয়ে যায়। নির্মল তাদের ভোলে না।

আর সুব্রত হাড়ে-হাড়ে টের পায় শব্দ কেমনভাবে আবৃত করে সত্যের অর্থপূর্ণতা। তার ভয় হয় তার কলেজজীবনে সযত্নে পড়া অর্থনৈতিক 'টার্মস্'গুলোও আসলে অর্থহীন, বড়োজোর কতগুলো আন্দাজ। আর অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে এ শব্দগুলোর যতটুকু সত্যতা আছে, রাজনীতির জগতে তারা তো প্রায় ফোঁপড়া। গৌতমের সঙ্গে তার তো এইখানেই ফারাক। গৌতম মনে করছে সমাজবাদ সম্পর্কে যে-সব কথা বলা হয়ে থাকে তার সবটুকু সত্যি। প্রয়োগ ক্ষেত্রে যে প্রচণ্ড ফারাক বাড়ছে তা না মানতে সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

কয়েক দিন আগে কলকাতার রাস্তায় বিপ্লব হয়ে গেছে। আশীটা লোক মরে গেছে পুলিশের লাঠি গুলিতে। সন্ধের পর রাস্তায় রাস্তায় আলো নেই, বোমার আওয়াজ, রাইফেলের শব্দ। খাদ্য-আন্দোলন নামে অভিহিত এই রোদনভরা প্রহসনে সুব্রতর মনটা একেবারে মুষড়িয়ে দিল। আন্দোলনের প্রথম দিকে কলেজে টিচার্স রুমের কাছে এগোতেই গৌতমের গদ-গদ গলায় সে থমকে দাঁড়ায় কাঠের পার্টিশানের গায়ে। গৌতম আবৃত্তি করে :

> Today you already know, Russia, the solitude and the cold.
>
> While thousands of shells shatter your heart,
> while scorpions with crime and poison

approach to gnaw your entrails, Stalingrad,
New York dances, London thinks, and I say to you bite,
for my heart cannot beat it and our hearts
cannot bear it, cannot beart it
in a world which lets its heroes die alone.

নির্মল ছাড়া ঘরে কেউ নেই। কিন্তু গৌতমের সেদিকে দৃষ্টি নেই, চশমার ভেতর যে উদ্দীপ্ত চোখ তার সামনে জনারণ্য। সুব্রতকে বোধহয় আশা করে নি গৌতম। একটু থতমত খেয়ে থামে। তারপর তার অপ্রস্তুত ভাবখানা চাপা দেবার জন্যে আরো চেঁচিয়ে বলে, 'পাবলো নেরুদা, চমৎকার না? ছাত্রদের মিটিং-এ বলব।'

'যাতে আরো আশীটা লোক মরে।' সুব্রত বসতে বসতে ক্লান্ত গলায় বলে।

'ইউ আর এ রিভিশানিস্ট, কাওয়ার্ড! আমি তোমার ওপিনিয়ন চাই না,' গৌতম হঠাৎ ঘেউ-ঘেউ করে উঠল।

সুব্রত অসহিষ্ণুভাবে বললে, 'ওড টু স্টালিনগ্রাড জোরাল কবিতা। কিন্তু এই ছাত্রসভায় কেন? কদিন তোমাদের এই বেঁড়েমি করে কাটবে?'

নির্মলও চমকে তাকায় সুব্রতর দিকে। এরকম ভাষা সাধারণত গৌতমকেই মানায়। সুব্রত ঝাঁঝিয়ে বলে, 'এটা কী আন্দোলন যার কোনো লক্ষ্য নেই, যেখানে পোকার মতো ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ মরে?'

'এর লক্ষ্য তুমি কি করে বুঝবে? ইউ আর এ কাওয়াড।' তারপর চাপা রাগে গৌতম বললে, 'তুমি এখন পার্টি ছাড়তে চাইছ যে-কোনো ছুতো করে। ডেমোক্র্যাটিক রাইটস্-এর জন্যে মানুষ প্রাণ দিচ্ছে, দরকার হলে আরো দেবে। এই সাধারণ কথাটা তোমরা ভুলে যাচ্ছ।' তারপর নির্মলের দিকে চেয়ে বললে, 'আমরা এক একটা প্রতিক্রিয়ার দুর্গ ভেঙে ফেলছি।'

'তুমি কি নজরুল আওড়াচ্ছ? আমরা ছাত্র নই। কেন এ-সব নাটক করছ?' সুব্রত বললে।

'সাট আপ কাওয়াড, অপরচুনিস্ট,' গৌতম ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে ওঠে।

'এ-সব কী হচ্ছে ছেলেমানুষী তোমাদের?' নির্মল এবার চেঁচিয়ে উঠল।

গৌতম সুব্রতর দিকে চেয়ে গর্জে ওঠে, 'তোমায় পার্টি-কার্ড কিরকম থাকে আমি দেখব।'

হঠাৎ চুপ করে যায় সুব্রত। ক্লান্তভাবে বলে, 'ঐটাই তো একমাত্র পারো।'

নির্মল অনেকক্ষণ বুঝতে চেষ্টা করছিল এ দুটো লোকের বিরোধটা কোথায়? সুব্রতর রাজনীতি চর্চা সে বোঝে না কিন্তু সুব্রত যে গর্তে-ফেরা শঙ্কিত শশক নয় সে ব্যাপারে সে নিশ্চিন্ত। একটু উদ্‌বিগ্নভাবেই গৌতমকে জিজ্ঞেস করে, 'তোমরা কি সুব্রতকে সত্যি তাড়াবে পার্টি থেকে? কি বলে তাডাবে?'

'এজেন্ট বলে,' গৌতমেব গলায় এতক্ষণ পর তার স্বাভাবিক আত্ম-বিশ্বাস।

'এজেন্ট মানে?'

'এজেন্ট মানে বোঝ না? যেমন মনে করো অন্য পার্টির লোক, এমনকি পুলিশের লোক আমাদের পার্টিতে কাজ কবে, যারা আমাদের শক্তিকে দুর্বল করবার চেষ্টা করে।'

একটা প্রবল বেদনায় আবিষ্ট হয়ে অথর্বের মত বসে থাকে সুব্রত।

আর সেদিকে চেয়ে আরো উৎসাহিত হয়ে গৌতম বলে, 'যারা আমাদের রেভল্যুশনারী পার্টি রিফর্মিস্ট বানাতে চায়, যারা আসলে অ্যাংলো-আমেরিকান ইম্পিরিয়ালিজমকে আরো শক্তিশালী করতে চায়, যারা…'

গৌতম দম নেবার জন্যে থামে।

নির্মলের কাছে ব্যাপারটা আরো পরিষ্কার হয়ে যেতে থাকে। বলে, 'কোনো প্রমাণ আছে সুব্রতর সম্পর্কে?'

'ডক্যুমেণ্ট?'

সুব্রতর মুখে একটা ফাঁকা হাসি ফুটে ওঠে। গৌতম বলে, 'এ-সব আমাদের ইনার পার্টির ব্যাপাব, বাইরে বলা ঠিক না। তবে তুমি ওর ভাই, তোমার জানা দরকার। গাঁয়ে গেলেই, আর পিপ্‌ল পিপ্‌ল করলেই তো বিপ্লবী হওয়া যায় না!'

'বিপ্লবী হতে গেলে কি করতে হয়?' নির্মল জিজ্ঞেস করে।

'বিপ্লবী হতে গেলে স্ট্যামিনার দরকার।'

'স্ট্যামিনা তোমাদের দুজনেরই আছে।'

'তুমি এ-সব বুঝবে না। তুমি আসলে খারাপ নও, তবে নন-পলিটিকাল টাইপ।' তারপর যেন করুণাবশেই বললে, 'আচ্ছা, তোমরা দু ভাই আলাপ-সালাপ করো। আমি মিটিংয়ে যাই।'

নির্মল বললে, 'তোমরা সরাসরি ব্যাপারটা কথা বলে মিটিয়ে ফেল না। এমনি রোজ রাস্তায় রাস্তায় মিছিল, আর গুলি, লাঠি, কদ্দিন চলবে?'

'কার সঙ্গে কথা বলব? তোমার জ্যাঠামণির সঙ্গে! আমার আর তার মাঝখানে আশীটা লাশের ব্যবধান।'

'তোমায় আজ কবিতায় পেয়েছে গৌতম, তুমি মিটিংয়ে যাও।' সুব্রতর গলায় অবসাদ স্পষ্ট।

গৌতম চলে যাবার পর একেবারে চুপচাপ। দুভাই যেন হঠাৎ খুব কাছে এসে গেছে বলে বোধ হয়। যেন গত কয়েক বছরে তাদের দুটো জগৎ ঘুরতে ঘুরতে এসে ঠিক এই মুহূর্তে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে।

কিছুক্ষণ পর নির্মল বললে, 'এবার বাড়ি ফিরবে?'

'না।'

'কোথায় যাবে?'

'আসানসোলে। আমাদের কয়লাখনির ইউনিয়নে।'

'সেখানেও...'

'হ্যাঁ, সেখানেও গৌতমরা আছে। তবে বোধহয় এখন যা করছি, তার থেকে কিছু কাজ করা যাবে।'

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। পুরনো দেয়াল ঘড়ির টকটক বাসের ঘর্ঘরে মাঝে মাঝে চাপা পড়ে, আবার জেগে ওঠে। বেয়ারা ফাটা পেয়ালায় চা দিয়ে যায়। চা খেতে খেতে সুব্রত নির্মলের দিকে তাকায়, 'আর তুমি... এখানেই?'

'নাঃ। একটা বিলিতি পাবলিসিটি ফার্মে যাচ্ছি। এই এপ্রিলে জয়েন করব।'

॥ নয় ॥

দিন সাতেক পর বিকেলবেলা নির্মল নিস্পৃহভাবে তার বাপের বিগত দিনের কাহিনী শুনছিল। সেই একই কথা— সেই বাংলাদেশ, সেই আদর্শ —সেই জগৎ যা নির্মলের কাছে প্রায় রূপকথা। আর তার যান্ত্রিক সম্মতিসূচক বারংবার ঘাডনাড়া সুবোধ ডাক্তাবের ভাঙা গলায় চেঁচানোর সঙ্গে তাল দিয়ে কতক্ষণ চলত বলা যায় না, হঠাৎ তাদের সন্ধের আড্ডার কথা নির্মলের মনে পডে যায়। কলেজে চাকরি ইস্তফা দেবার পর সে সম্প্রতি সেদিকে যাতায়াত কবছে। স্নান করে চকোলেট টেরেলিনেব প্যাণ্টেব ওপর ঘিয়ে সিল্কের বুশশার্ট চাপিয়ে হাল্কাহাতে সিগারেট ধবিয়ে সে যখন তরতব করে সিঁডি দিয়ে নামে তখন তাকে বেশ উৎফুল্ল দেখায়। সিঁডিব নীচেই চিঠির বাক্স। সেদিকে চেয়ে হঠাৎ থমকে দাঁডায়। একটা বিলিতি এয়ার লেটারে চেনা হাতে লেখা তার নামটা প্যাটপ্যাট করে তার দিকে চেয়ে আছে কাচের ভেতর থাকে। সেই পুরনো উষ্ণতায় চিঠির ডালা খোলে। পেছন দিকে ঠিকানা— মিস্ আর. খান, ৭৫ পেন্স লেন, সাটন, কোল্ডফিল্ড ওয়াবউইকশ্যায়াব, ইংল্যাণ্ড।

আস্তে আস্তে চিঠিটা ছিঁডে নির্মল পডতে থাকে :

> বাসে যেতে যেতে সেদিন একটা বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল— Three Nuns Tobacco! তুমি খেতে না ওই তামাক? সেই যে লিখেছিলে?
>
> এখানে যে অজুহাত নিয়ে এসেছি তা ইংরেজীতে এম. এ. পডার। ডক্টরেটের ফ্যাকডায় গেলে থিসিস আঁকডে পডে থাকতে হত বলে এই সহজ পথটা বেছেছিলাম। গ্রাষ্মে একটা পরীক্ষা দেব। তারপর কিছুদিন থেকে বোধহয় 'দেশে' ফিরতে হবে। যে বিরাট হিন্দু-মুসলমান-উত্তীর্ণ ভারতবর্ষ আমার দেশ

ছিল তা যাবার পর থেকে কতগুলো সমস্যা আরো জটিল হয়েছে।

ড্রাইডেনের All for love-এর অ্যাণ্টনির একটা কথা মনে পড়ে : My whole life has been a golden dream of love and friendship. শুধু হাল্কা হবার জন্যে নয়, জীবনকে ঐশ্বর্যে ভরে তুলবার জন্যেও পৃথিবীর অনেক কোণ থেকে নারী এবং পুরুষ দুরকম বন্ধুই পেয়েছি। কাউকে একান্ত করে পেতে চাইলে পাওয়া যায়— অনেক ল্যাঠাও চুকে যায় হয়তো, কিন্তু নিজের জীবনকে তৈরী করবার সুযোগ যখন পেয়েছি তখন সহজেই দমে যেতে নারাজ।

চোদ্দ বছর বয়সে বাবা বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন— তাবপর থেকে আজ পর্যন্ত বহু লোভনীয় পাত্র আমার বেয়াড়াপনার জন্যে ফসকে গেল। ত্রিপলী, লণ্ডন, ঢাকা করাচী ও ওযাশিংটনে আমার জন্যে দিন গোনা শেষ করে যাব যার তার তাব মতো সবাই নীড় তৈরী করেছে। এখন বাড়ি থেকেও চাপ নেই। তাই অবাধ মুক্তি।

সবচেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে, মানুষেব সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিজেব দৈন্যে লজ্জা পেয়ে আমি এইটুকু শিখেছি যে অটুট স্বাস্থ্য আর স্নায়ুর শক্তি ছাড়াই নিস্পৃহতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। চারদিক থেকে ক্লান্তি ছুটে এল আব কথা বললাম না, মুখ তুললাম না— এই করে আর দৈন্যের বোঝা বাড়াব না। ক্লান্তি আর নিস্পৃহতায় কতটুকু আর খুইয়েছি— তার ভেতর থেকেও তো আমাকে খুঁজে নিয়েছে অনেকে। তবে প্রত্যেকটা মুহূর্তকে বড়ো করে চাইলে তার একটা দৈন্যও বারবার কাঁটার মতো বেঁধে। তেমনি একটা কাঁটা আমার বুকে আছে— ওই একটা জায়গায় নিজের কাছে কেমন ছোটো হয়ে থাকি। আসলে হয়তো সমস্তটাই ছিল শব্দের খাঁচা— তুমি আমি কেউই যে শেষ পর্যন্ত তাতে ঢুকি নি সেটা পরম সৌভাগ্য। কিন্তু মমতা আছে সমস্ত কিছু ছাপিয়ে সব গ্লানি ধুয়ে নিতে। আজ বড়ো শীত। ভাল থেকো—

শব্দের খাঁচা, মনে মনে কয়েকবার আওড়ায় নির্মল। আর এই খাঁচাব শিকের বাইরে একখানা কৌতূহলী সতেজ মুখ তার মনের মধ্যে জেগে উঠবার আগেই পার্ক স্ট্রীটের রেস্তোরাঁর দিকে সে পা বাড়ায়।

সেদিন পাশের মজলিশ্। রুশ-চীন বিরোধ দিয়ে কোণের দুটো টেবিলে একেবারে ফাটাফাটি। নির্মলকে দেখেই তার এক সাংবাদিক বন্ধু চীৎকার করে গান ধরলে :

[illegible]সে গেছে বিপিন সুধা,
[illegible]াজে ওষুধ আর খেও না।